সামনে সাগর

অনিল ঘড়াই

সাহিত্য প্রকাশ
৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯

প্রকাশক : প্রবীর মিত্র : ৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট : কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

মুদ্রাকর : কুশধ্বজ মান্না : মান্না প্রিণ্টার্স
৬৭/এ, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী স্ট্রীট : কলিকাতা-৬

মেদিনীপুর জেলা সাহিত্য আকাদেমির সম্পাদক,
সাহিত্যিক বন্ধু শ্রী ভবেশ বসু
প্রীতিভাজনেষু

লেখকের অন্যান্য বই

পরীযান ও অন্যান্য গল্প
শ্রেষ্ঠ গল্প
পাতা ওড়ার দিন
নীল দুঃখের ছবি
বিপরীত যুদ্ধের মহড়া
জন্মদাগ
স্বপ্নের খরাপাখি
দৌড়বোগাড়ার উপাখ্যান
কলের পুতুল
মুকুলের গন্ধ
বক্ররেখা

কিছু কথা

'সামনে সাগর' উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় শ্রী মঙ্গলাপ্রসাদ রায় সম্পাদিত 'বিপ্লবী সংবাদ দর্পণ'-এর শারদ সংখ্যায়। লেখাটি প্রকাশিত হওয়ার পরেও কিছু পরিবর্তন, সংযোজন আবশ্যক হয়ে পড়ে। ফলে মূল লেখাটির অধিকাংশ বদলে যায় স্বাভাবিক কারণে। দীঘা এবং তৎসংলগ্ন কিছু অঞ্চল এই উপন্যাসে ঘুরে ফিরে এসেছে। এই উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীরা সম্পূর্ণরূপে কাল্পনিক ; কাউকে আঘাত বা দুঃখ দেওয়ার জন্য এই উপন্যাসের সৃষ্টি নয়, ফলে কোন কারণে যদি কেউ মিল খুঁজে পান, তা নিতান্তই কাকতালীয় বলে ধরে নিতে হবে। দে'জ পাবলিশিং-এর কর্ণধার শ্রী সুধাংশুশেখর দে মহাশয় নতুন লেখকদের সুহৃদ, আমি তাঁর কাছে সবিশেষ কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে জানাই—আমার অগ্রজ শ্রী প্রবীর কুমার ঘড়াই, কবি শ্রী সুনীল মাজি এবং ভাতৃপ্রতিম কবি শ্রী সত্যজিৎ ঘোষ এই উপন্যাস রচনায় আমাকে নানাভাবে উৎসাহ দিয়েছেন এবং তাঁদের সুচিন্তিত মতামত সবসময় আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে।

পাঠকের সুচিন্তিত মতামত এবং আশীর্বাদ আমার পাথেয়।

অনিল ঘড়াই

মাটি পুড়ে যাওয়ার গন্ধটা সহ্য করতে পারে না ভরত। এই চড়া রোদে শুধু গা-গতর নয় পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে গাছপালা। আকাশকে সে এর আগে এত নির্দয় হতে দেখেনি। এখন বেশিক্ষণ সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকা যায় না, জ্বালাপোড়া করে চোখ-মুখ, মুখ দিয়ে গরম হলকা বেরয় অনবরত। পুবপাড়া ছাড়িয়ে এসে মাইতিদের গহীরা জমিটার কাছে এসে দাঁড়াল ভরত। যত দূর চোখ যায় শুধু ফাঁকা মাঠ, গরম হাওয়ার নাচন আর ধুলো ঝড়ের অস্থির কেরামতি। এ দৃশ্য সুখ দেয় না চোখকে। মন উদাস হয়ে যায় হঠাৎ। সকালে ঘর ছাড়ার আগে যোগমায়া বলেছিল, পারলে আজ একটু তাড়াতাড়ি ঘর ধরো। রোজ সেই বেলা করে ফিরলে খাওয়া-দাওয়াটা সময় মতো হয় না। শুধু খাটলে হবে না, শরীরটাকে তো একটু দেখবে।

যোগমায়ার কথা এক কান দিয়ে শুনে আরেক কান দিয়ে বের করে দিয়েছিল ভরত, এটা তার আজকের নয় বহুদিনের স্বভাব। কোনো কথাকেই সে তেমন গুরুত্ব দিতে চায় না, সব ভার সহ্য হলেও কথার ভার তার সহ্য হয় না। পৃথিবীতে কথার কোনো অভাব নেই, কথা ঝুলে থাকে নিস্ফলা মেঘের মতো, শুধু কান ভারী করে তোলে, বুকের ভেতরে চিনেচিনে ব্যথার স্রোত তোলে। এই অভাবের সংসারে কথায় বুক ভরে না, মনও ভরে না, কেবল দায়িত্বের ভূতগুলো ঘাড়ে বসে দাপাতে থাকে তখন রীতিমতন হাঁপিয়ে ওঠে ভরত, গলা শুকিয়ে চ্যাটচেটে বেবুর আঠার মতো কণ্ঠনালীর অবস্থা হয়। এই দুঃখ কষ্টের কথা সে কাকে বলবে, কে শুনবে তার জ্বালা-যন্ত্রণার পাঁচালী। যাঁরা ছিল তারা এখন নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। কার এত সময় আছে যে অন্যের ঘ্যানর ঘ্যানর শুনে নিজের জীবন ছ্যাড়াবেড়া করবে? ভরত বেড়ার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল অনেকক্ষণ, রোজই দাঁড়ায় আর ভাবে কিছু ভুলে গেল না তো। ঘর থেকে একবার বেরিয়ে যাওয়ার অর্থ লাটাই ছাড়া ঘুড়ির মতো অবস্থা হয় তার, উঠোনের বাইরে পা দিলেই সে বেবাক ভুলে যায় ঘরের কথা। না ভুললে উপায় কি। ভরত ছন্নছাড়া চোখে এদিক-সেদিক তাকায়। পুকুরটা রুগ্ন শরীর নিয়ে শুয়ে আছে, এই খরানীকালে আকাশও মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে—কথা বলবে না—ভাবভালবাসা তো দূরে থাক। রুগ্ন মায়ের স্তন চোষার মত বাঁশের শেকড় হামলে পড়েছে পুকুরের ভেজা পাড়ে, তারাও বাঁচতে চায় এই তীব্র খরার দাবাদহ থেকে। সবাই মুখ ঘুরিয়ে নিলেও পুকুর পারে না শেকড় ফেরাতে। যতক্ষণ জান আছে ততক্ষণ বাঁচার আমরণ চেষ্টা। ভরতের মাঝ বয়েসী কালসিটে মারা শরীরটা ওই পুকুরের মত। সংসারের হা-মুখে তার গতর না চললে শুকিয়ে মরবে আরো তিনটে জীবন। একজন তো মরতেই বসেছে শুধু ডাক আসার অপেক্ষা। আজও ভরত গঁড়ার দিকে তাকাইনি।

তাকালেই ধক করে ওঠে বুকটা। কে যেন গুণসুচ ঢুকিয়ে দেয় বুকের ভেতর, রক্ত ঝরে, অব্যক্ত ব্যথায় টনটনিয়ে ওঠে পুরো শরীর তবু এই অক্ষমতার কথা সে কাউকে বড় মুখ করে বলতে পারে না। গঁড়া তার বাপ। সত্তর পেরনো নড়বড়ে শরীর, ক্ষয়া দাঁত। ঘোলাটে চোখ, গর্তে ঢুকে যাওয়া কুঁচকান পেট, হাড়ের উপর বয়স্ক চামড়া—কোঠরে ঢোকা মুখমণ্ডল হনু হাড় জাগান কণ্ঠা—তাকে খুঁটিয়ে দেখলে মনে হবে একটা জীবন্ত কঙ্কাল, কথা বলে চিঁ-চিঁ শব্দে, হাসি ফুরিয়ে খড়খড়ে ঠোঁটে সে একটা পাথর মানব। অথচ মাত্র দশ বছর আগেও সে ছিল জোয়ান বটগাছ, ছায়া দিত পুরো সংসারটাকে, তার ভরাট গলার স্বরে সম্ভ্রমে কেঁপে যেত ভরতের কলিজা, এক ছুটে চলে যেত বাপের কাছে, মাথা তুলে কথা বলার সাহস হোত না তার, মিনমিনে স্বরে বলত, কি বলবা? সময় সব খায়, শরীরকেও বাদ দেয় না, গলার স্বর বুজে আসে বয়সের পলিতে। এখন বাপ মানে ভরতের কাছে অচল পয়সা, খোলাম কুচি, তালা ফাটা অকেজো খোল। শুধু খেতে চায় ; কণ্ঠা কাঁপিয়ে বলে, দে না বাপ, এট্টা বিড়ি! কতদিন তপকা খাইনি রে, হুঁকাটার ছ্যাঁদা মনে হয় বুজে গেল!

হুঁকার এখন চল নেই, সে আছে অনাদরের গঁড়া বুড়ার মতন, মাটির দেওয়ালের এক কোণায় হেলান দেওয়া, কেউ তাকে দেখেও দেখে না—ছোঁয়া তো দূরের কথা। ভরতের মেজাজ ভাল থাকলে দেয় একটা বিড়ি বুড়োর দিকে ছুঁড়ে, বিরক্তি ভরে বলে, হাসপাতালের ডাক্তুর না তোমারে বিড়ি খেতে মানা করেচে। কেন খাও ছাইপাঁশ। অখন কিচু হয়ে গেলে আমি সামাল দিতে পারবো নি, আমার ট্যাঁক খালি, হাঁড়িই চড়ে না।

বুড়োটা সব শোনে, শুনে বোবা। বোবা নয়, আস্ত একটা গাছ, নড়ে না চড়ে না শুধু ফুঁস করে দম ছাড়ে, দাপনা চুলকে বলে, যমরাজ কেন যে আসে না বুঝিনে, কত করে তাকে ডাকি—আয়, আয়রে বেটা, আমাকে নিয়ে যা, কেনে ঘাটের কাছে এনে আছড়ে-পাছড়ে মারচিস, আমি আর পারচি নারে। লে-লে, আমাকে তুলে লে। পৃথিবী হাল্‌কা হয় তাহলে, সংসারটাও বাঁচে।

বয়স হলে কথা বলার ক্ষিদে বাড়ে, ভাত ফোটার মতো শব্দগুলো বিজবিজ করে ঠোঁটের উপর, ভেঙে দেয় বাঁধ, হাল্‌কা করে দেয় বুকের বোঝা। কিন্তু কে কার কথা শোনে, কথা তো গাছ কিংবা দেওয়ালকে শোনান যায় না, ফলে কথা চেপে বসে বুকের উপর, কথা খুনী সেজে শাসায় জীবন। হাঁপিয়ে ওঠে গঁড়াবুড়া। ভরতের বুকের উপর চেপে বসে সেই দীর্ঘশ্বাস, কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলে সে, অতীতকে খুঁজতে গিয়ে বর্তমানের গোলক ধাঁধায় পথ হারায়। গাঁ-ঘোরা ভরতের এখন নিত্যদিনের অভ্যাস, এই অভ্যাস মজ্জাগত, বংশগত-তীব্র নেশার রূপ নেয়। ভোর হওয়ার অনেক আগে থেকে যখন তরল অন্ধকারে পাখপাখালি ডেকে ওঠে দিনের প্রথম আলোয় চোখ সেঁকে নেবার জন্য—ঠিক সেই স্মরণীয় মুহূর্তে প্রতিদিনই ঘুম ভেঙে যায় ভরতের, একটা বিড়ি ধরিয়ে বাসি বিছানায় তার দিন শুরু হয় তখনও যোগমায়া ঘুমোয়, ওর অনাবৃত পায়ের গোছে, মসৃণ পেলব মাংসের উপর তখনও

কিছু বেয়াদপ মশা রক্ত চুষে খাবার জেদে অনড় বসে থাকে। ভরতের ঘেন্না হয়, সেই সঙ্গে কিঞ্চিত মায়া-মমতার জন্ম হয় তার অন্তঃকোণে, নিজের অক্ষমতায় জোরে জোরে বিড়িতে ফুঁক দেয়, চোয়াল নিরন্তর ওঠে-নামে, ক্ষোভের ফলাটা বুকের খাদানে আটকে গিয়ে সেই ভোর থেকে উথাল-পাথাল ঝড়ের সৃষ্টি হয়, একটা হেরো মানুষের মতো মুখ করে ভরত বিছানা ছাড়ে চরম অনীহায়, যেন এ জীবনটা বয়ে নিয়ে যাওয়া বড় কষ্টের, পরাজয়ের। ভোরের স্নিগ্ধতা সেই কষ্টবোধকে কিছুটা লাঘব করলেও মনের অভ্যন্তরে সেই তখন থেকে শুরু হয় খাদ্যের চিন্তা, সারা দিনটা যেন ভাল যায় এমন আকুলি-বিকুলি প্রার্থনা। জলকাজ সারতে ভরত প্রতিদিনই চলে যায় পুকুরয়াড়িতে যেখানে বুনো আগাছারা সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে পুরোমাত্রায়, বনতুলসী, আকন্দ কিংবা পোকাশিমা গাছ বিভেদ দ্বন্দ্ব ভুলে একান্নবর্তী সংসারের সদস্য হয়ে দিনের প্রথম আলোকে স্বাগত জানানোর জন্য প্রস্তুত। মরা পুকুরের মাঝখানে তখন অদ্ভুত ধোঁয়ার আস্তরণ, অলৌকিক মায়াময়-ছায়াময় অপার্থিব যাদুটোনায় সেই সামান্য জলের উপরিভাগে যে স্বর্গীয় নৈসর্গিক পরিমন্ডল তৈরি হয়, যা ভরতের চোখ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করে, সেই ছোটবেলার সেই সুখের দিনগুলোতে ফিরিয়ে দেয়, অদ্ভুত উষ্ণতায় বিগলিত হতে থাকে হৃদয়-মন ক্রমশ।

উঠোন ছড়িয়ে এলে কঞ্চির বেড়া ; বেড়ার উপর লতা-গুল্ম, মাকড়সার বসত-বাড়ি, ঘাস-ফড়িংয়ের আশ্রয়স্থল, বনিপাখির লাফ-ঝাঁপ দেওয়ার উপযুক্ত জায়গা, এই পুরনো বেড়াটায় আলাদাভাবে ঘিরে রেখেছে ভরতের বাসস্থান, মাটির ঘরখানা, কলাঝাড়, পুকুর, নিমগাছ, মনসাতলা, তুলসীচারা আরো কত কি! উঠোনের এক পাশের খড়ের গাদাটা দেখে লোক অনুমান করে নেবে এবছর ধান কতটা হয়েছিল, কতটা স্বচ্ছলতা এখন বিরাজ করছে এই পরিবারে, এরা দু-বেলা দু মুঠো খেতে পায় কিনা....ইত্যাদি। ভাতের কথা মনে পড়লে ভরতের সারা শরীর হু-হু যন্ত্রণায় নীল হয়ে ওঠে বেড়ার উপর লতিয়ে যাওয়া ওই অপরাজিতা ফুলগুলোর মতো, বড় অসহায় লাগে নিজেকে তখন, বেঁচে থাকতে সাধ যায় না তার, মনে হয় মরে গেলে এই জ্বালাযন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পেত অনায়াসে, আর কোনদিন যোগমায়া কাতর গলায় বলত না, চাল নেই গো, তুমি না ফেরা পর্যন্ত চুলা ধরাব না!

যোগমায়ার এই কথাগুলো সারা গ্রাম তাড়িয়ে বেড়ায় ভরতকে, এ-ও এক নেশা, হন্য জীবনযাপন, উনচ্ছবৃত্তি....নিত্যদিনের কর্ম। এত করেও তো অভাব ঘোচে না, হাহাকার বাড়তে থাকে শুধু, পথের ধুলো উঠে আসে হাঁটু পর্যন্ত, গলা শুকায়, রোদ এসে বেহায়ার মত ধর্ষন করে শরীরের ইজ্জোত ধরে রাখা ফাটাফুটো ত্বকের উপর। তখন চিড়বিড় করে গা-গতর, ঘেমে নেয়ে শরীরটা কাহিল হয়ে পড়ে, একমণি বস্তার মতো শরীরটাকে টেনে নিয়ে যেতে কষ্ট হয় তখন। কষ্ট হলেও কোন উপায় নেই, এ-যে কর্তব্য, যেতেই হয়, না গেলে যে মন মানে না। হাটখোলাটা ঝাঁটিয়ে দিলে হাটের দিন 'তোলা' পাওয়া যায়—লাউ কুমোড়ার ফালি, বেগুন-মুলো, আলু-পেঁয়াজ, শাক-সবজি আরো কত কি। হাটবারটা ভরতের কাছে তাই সুখের দিন, পরবের দিন।

ওই দিনটার জন্য মুখিয়ে থাকে ঘরের সবাই, এমন কী যোগমায়া পর্যন্ত, বারবার তাড়া দিয়ে সে বলবে, যাও না গো ঝড়াটা নিয়ে, তোলাটা তুলে আনো, সাঁঝ লাগার আগে আজ আমি চুলা ধরাব। সারাদিন যা ধকল যায়, আর পারিনে, আজ আমি খেয়ে-দেয়ে ঘুমোব, ঘুমিয়ে গেলে তুমি আমাকে ডাকবে না....।

ভরতের ঠোঁটের কোনে ঈষৎ হাসির রেখা কলিজা থেকে গড়িয়ে পড়ে, সুখের মুহূর্ত বলতে ওই রাতটুকু, যতক্ষণ যোগমায়া ঘুনসুটি করে ততক্ষণ। ছেলে-মেয়েরা বড় হয়েছে, এখন আর দেহ নিয়ে দীর্ঘসময় খেলা চলে না। আর শরীরও পারে না, হাঁপিয়ে ওঠে মনটা, সব কিছু চুকে বুকে গেলে সেই আদি অনন্ত খিদেটা আবার চাউড় দিয়ে ওঠে। গাঁ ঘুরতে যাওয়া নয়ত যেন যুদ্ধে যাওয়া, তার সাজপোষাক আলাদা, প্রস্তুতি ভিন্ন, মেজাজটাও টং হয়ে থাকে ছিলা টান টান উত্তেজনায়। কচার ডালে দাঁত মেজে পুকুরে মুখ ধুয়ে আটহাতি ধুতিটা পরে নেয় ভরত, সঙ্গে নেয় সেই দাদুর আমলের লাঠিটা, ভাগাড় সামলানোর চাকু-ক্ষুর-শিলপাথর, বিড়ির ডিবা, ম্যাচিস বাক্সো এরকম আরও কত কি। কোন একটা ভুলে গেলে দিনটাই মাটি, তখন কপাল চাপড়ালেও সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত হবে না, বরং কাজটা না হওয়ার জন্য দিনভর অস্থির হবে মনটা। খালি পা এই খরানীতে ফোসকা নেয় তাই ভরতের পায়ে এখন টায়ারের চপ্পল। কোমরে বাঁধা লাল গামছা, কিছু জড়িবুঁটি যা সে দিয়ে থাকে গ্রামের মানুষকে আপদে-বিপদে এবং বিনিময়ে তার কিছু নগদ প্রাপ্তি হয় যা সংসারের ফুটো সারতে মোক্ষম কাজ দেয়। বেঁটে-খাটো ভরতের শরীরটাই দেখার মত জিনিস বটে, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, তামাটে গায়ের রঙ, চোয়াল বসা মুখটা এখনও বলে দেয় একসময় এই শরীর ডাকাতের তাগত ধরে রাখত রক্তের ভেতর। এখন শুধু বিসর্জন দেওয়া অসুরের কাঠামোটা পড়ে আছে যার দাম নেই এক পয়সাও। তবু হারলে চলে না, মরে—হজে যাওয়া ওই পুকুরটার মতো বেঁচে থাকতে হয়, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে টেনে যেতে হয় অভাবের কাদায় বসে যাওয়া সংসার।

সরু গলিঘিঞ্জি গ্রামের পথ, এই সকালেও ধুলো ওড়ে, গোয়াল ছাড়া গোরুর পাল পিষে দিয়েছে পথের ঘুমন্ত শরীর। এসব দেখার জন্য ব্যস্ত একদল শালিক-চড়ুই। ভরত পথ চলতে চলতে ভাবে—পাখিদের বুঝি কোনদিন অভাববোধ হয় না, এই বিশাল বৈচিত্রময় ধরণীতে ওপরওয়ালা ওদের জন্য গচ্ছিত রেখেছে অপর্যাপ্ত আহার, ডানা মেলে ঘুরে বেড়ানোর জন্য বিশাল এক আকাশ, তাই নিশ্চিন্তে ওরা এই সকালে মুখরিত বাঁধনহারা আনন্দ-উল্লাসে ভাসছে। কচাগাছের সরু ডাল হেলে পড়েছে পথের ওপর, সেই ডালে জড়িয়ে আছে বুনো ঝুমকো লতার সংসার। কোথাও একফোঁটা বৈরিতা নেই, সব সাজানো-গোছানো পরম মিত্রতায় সহবস্থান, দেখলে চোখ জুড়োয়, ভাবনার পাখিগুলো ডানা মেলে দেয় শূন্যে, ছুঁতে চায় অসীমের ঠিকানা। ভরতের জড়তামাখা ক্লান্তি কোথায় যেন উবে গেছে ক' পা হাঁটার পর, সেই ঘুম ঘুম আমেজটা এখন আর নেই। আসলে সকালের রশ্মিচ্ছটায় সারাদিনের রসদ লুকিয়ে থাকে, যা গায়ে মেখে নিলে ক্লান্তি-অবসাদ উবে যাবেই যাবে। ভরতের বাপ বলে,

দিনের প্রথম আলো মন ভাল করে, ছিলা পিছলান তীরের মতো শরীরটাকে দৌড়ে নিয়ে বেড়ায়। শীতের দিনে চাদর মুড়ি দিয়ে উঁচু ডাঙাটায় বসত ভরত, গাছের ডালপালা পাতাগুল্ম ভেদ করে শিরা ছেঁড়া রক্তের মতো আছড়ে পড়ত রোদ্দুর, কিছু পরে গায়ে আর চাদর রাখা যেত না, বুকের কাছটা কেমন ঘেমে উঠত, স্ফূর্তিতে ভরে উঠত মন। মা মুড়ির জামবাটিটা দিয়ে গেলে খেজুরের টাটকা রস ঢেলে তা খেতে খেতে মনে হোত অমৃত! সে সব দিন এখন ধুলোয় মিশে গুড়িয়ে গিয়েছে কোথায়। হাজার খুঁজলেও ফিরে পাওয়া যাবে না।

পিচ রাস্তা দু'-ভাগ করে চলে গিয়েছে দীঘার দিকে, দু-পাশে পড়ে আছে মাঠ ঘরবাড়ি আবাদ জনপদ। মাটির পথ ছেড়ে পাকা রাস্তায় উঠে এল ভরত। খিরিষগাছটার নীচে দাঁড়িয়ে সে ভাবল আজ কোনদিকে যাওয়া যায়, কোনখানে গেলে দুটো পয়সার সন্ধান সে পেতে পারে। চকিতে ভেবে নিল সে, আজ সবার আগে সে দাস দুয়ারে যাবে, ওদের বাড়ির ছোট খোকাটার জ্বর, ছাড়ছে না—একটু ঝাড়ফুঁক জলপোড়া দিতে হবে। দাসবুড়ো এসেছিল ঘরে সাঁঝের বেলায়, বিড়ি খেল, যাওয়ার সময় অনুনয়-বিনয় করে বলে গেল, যেও গো, বড় বিপদে আছি। লাতিটার জ্বর ছাড়চে না, মনে হয় কারোর লজর লেগেচে। ইংরেজি ওষুধ আর দিব না, এবার তুমিই ভরসা, দেখি এবার কি করে মা শীতলাবুড়ি—

দাসের ঘরে গেলে নির্ঘাৎ দুটো টাকা বাঁধা, ভাগ্যসুপ্রসন্ন হলে গামছা বাঁধা মুড়িও জুটে যেতে পারে, সেই সঙ্গে হলুদ-জলে ছোপান খেসারি বা ছোলা ভাজা। দাসঘরের আগড় সরিয়ে ভরত হাঁক পাড়ে, ঘরে আছো নাকি গো দাসের পো! এই আমি এলাম। তপকা সাজো। ছেলেটারে বের করে আনো খলাবাহিরে। গায়ে রোদ লাগতে দাও। কিছু হবে না, আমি এসে গেছি—সব ঠিক করে দেব। অবাতাস কুবাতাস পালাবার পথ পাবে না। ভরত কথাগুলো বলে এত জোরে, যা ওর আত্মবিশ্বাসকে দ্বিগুণ মাত্রায় জাহির করে, বাড়ির লোকদের আকৃষ্ট করে তোলে তার প্রতি।

দাসের পো'র নির্দেশে উঠোনে ছেলেটাকে নিয়ে আসে তার স্ত্রী, চোখে-মুখে রাত্রি জাগরণের ধকল। কিছুটা হাঁপিয়ে উঠেছিল দাসের বউ, তবু পরপুরুষ দেখে ঘোমটা টানতে ভোলে না। তার অস্থির ক্লান্তিতে ভরা চোখ দুটোয় ছেলের আরোগ্য'র জন্য নীরব প্রার্থনা। ভরত এসব চাহনির অর্থ বোঝে, এদের একটু রগড়ালে কিংবা ঘাবড়ে দিলে দু-চার টাকা তার বেশি উপার্জন হবে—এই ভেবে সে নিকোন উঠোনে পাছা থেবড়ে বসল, তারপর পুঁটলি নামিয়ে একে একে বের করে আনল শেকড়বাকড়, আরো কত কি। দাসের পো'কে উদ্দেশ্য করে বলল, যাও গো, পুকুরঘাটের হদি সরিয়ে এক ঘটি জল এনে দাও। তোমার ছেলেটাকে জলপোড়া খাওয়াতে হবে, নাহলে ওর রোগ যে সারবে না।

পেতলের ঘটি নিয়ে দাসের পো ছুটে গেল পুকুরের দিকে। এখন মরা পুকুর, তবু জল আছে দাসেদের পুকুরে। শ্যাওলা সরিয়ে ঠাকুরের নাম স্মরণ করে ঘটি ভর্তি জল নিয়ে পাড়ে উঠল দাসের পো, সে আর পিছন ফিরে তাকাল না, ধড়ফড়ে

বুকে সোজা হেঁটে এল ভরতের কাছে, তার পায়ে কাদা, ধুতির শেষাংশ ভিজে গিয়েছে অসাবধানে। ভরত দেখল, খুশি হল মনে মনে। এই ধূর্ত মানুষটিকে সে কোনদিনও বাগে পায়নি, আজ তার নত হওয়া মাথার দিকে তাকিয়ে মনে মনে গর্ববোধ হল তার, এই সুযোগে সে বেশ কিছু কামিয়ে নিতে পারবে— সেই হিসাব কষতে গিয়ে কিছু সময় অন্যমনস্ক দেখাল তাকে। দাসের পো'র ডাকে তার হুঁশ ফিরল, কিছুটা চমকে ওঠা গলায় সে বলল, রোদের ঝাঁঝ আছে, ইখানে বেশিক্ষণ বসা যাবে না। এই খরা যে কবে কমবে কে জানে বাবা!

শুরু হল ভরতের মন্ত্রপড়া। পেতলের ঘটিতে তার দীর্ঘ ফুঃ গিয়ে পড়ে, আর সেই ফুঃয়ের ধাক্কায় ছোট ছোট ঢেউরেখায় ঘটির জল কেঁপে ওঠে, চলকে পড়ে জলবিন্দু। প্রায় মিনিট দশেকের ফুঃ আর মন্ত্রোচ্চারণে হাঁপিয়ে ওঠা ভরত রুগ্ন ছেলেটার মুখের দিকে তাকায়, বিড়বিড় শব্দে মন্ত্র আউড়ে ফুঁঃ ছুঁড়ে দেয় অসুস্থ ছেলেটার দিকে। তখন ভরতের চোখ-মুখের দিকে তাকাতে পারে না দাসের পো, প্রতিদিনের চেনা ভরতকে মনে হয় অন্য কেউ, মনে হয় সাক্ষাৎ কোন মন্ত্রসিদ্ধ মানুষ যে তার ছেলেকে পরিপূর্ণভাবে সারিয়ে তুলবে ভগবানের দোহাই দিয়ে। মন্ত্রপড়া শেষ হলে ভরত ভাবগম্ভীর স্বরে বলে, আর কুনো চিন্তা নেই, এবার তোমাদের ছোটখোকা ভাল হয়ে যাবে। ওর যা দোষ লেগেছিল সব আমি ভাগিয়ে দিলাম। আর কোন পাপ হাওয়া, কুবাতাস ওর ধারে কাছে ঘেষতে সাহস পাবে না। এবার একটা কাজ করো দাসের পো। ঘটির জল তোমার ছেলেটাকে টুকে খাইয়ে দাও। বাকি জলটুকু দিয়ে ওর গা, হাত মুছিয়ে দাও। যা খেতে চাইবে খেতে দিও। আর ভয়ের কোন কারণ নেই। জ্বরজ্বালা আর আসবে না। যদি আসে তাহলে আমাকে খবর দিও। আমি ফের কোনদিন এসে ঝাড়ফুঁক করে দিয়ে যাবো।

পুঁটলি গুছিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি হল ভরত, একবার সূর্যের দিকে তাকাল শুধু। খাইখাই করছে আকাশের সূর্য, এই সকালবেলায় সে যেন আগুন খেয়ে উগরে দিতে চায় ঘেন্নায়। ভরতের চোখ কুঁকড়ে গেল আলোয়, ধাঁধিয়ে গেল চোখ। সে ভাবল— এ বছরের মতো খরা আর কোন বছরও হয়নি, রোদের এত তাত বাড়লে তার মতো ছা-পোষা মানুষ বাঁচবে কিভাবে। কলাগাছের পাতাও পোড়ে পুকুরপাড়ে, সজনে পাতাগুলোর হলুদদশা, যেন তারাও গভীর কঠিন কোন রোগে আক্রান্ত। পুড়ে যাওয়া ঘাসের গন্ধে ঝালাপালা করে নাক, সেই সঙ্গে গবগবিয়ে ওঠে মাটি পোড়া কদর্য বাসনা, যেন মাটি নয়—পুড়ে যাচ্ছে ভরতের গায়ের চামড়া। আকাশকে সে বলে, একটু বৃষ্টি-বাদলা দাও হে, আর পারি নে! কার পাপে এমন রুষ্ট হলে গো ধরণী।

দাসের পো দুটো টাকা দিয়ে গেলে 'হায়-হায়' করে ওঠে ভরত, ঘাড় নাড়িয়ে বলে, দু' টাকায় কী হয় আজকাল, আর কিছু ধরে দিলে ভাল হয়—নিদেনপক্ষে সের খানিক চাল-হলে ভাল হয়।

এক সের চাল আর দুটো টাকায় সন্তুষ্ট হয়ে পথে এসে দাঁড়াল ভরত, রোদ এসে ছুঁয়ে গেল তার শরীর, হাঁপিয়ে, ওঠা চোখ করে সে আকাশের দিকে তাকাল।

মাসের উপর হতে চলল ফাঁকা যাচ্ছে আকাশ, উড়ন্ত সুখচিত্র শকুনের দল কোথায় মুখ লুকিয়েছে কে জানে। পাখিও কি হারিয়ে যায় মানুষের মত?—ভাবল ভরত। অমনি বিষাদে ভরে গেল তার মনটা। ভাগাড় ঠেকানো নিয়ে জ্ঞাতিভাইদের সাথে দীর্ঘ কাজিয়ার অবসান হল বছর তিনেক আগে। পশ্চিম গাঁ-গুলোর দখল ছেড়ে দিতে হল তাকে, এই প্রস্তাব বুড়ো বাপ মেনে নিল সহজভাবে। ঝগড়া-কাজিয়ার যুগ আর নেই, এখন বদলে যাচ্ছে সময় আর মানুষ। মিলে মিশে না থাকতে পারলে বুকে ব্যথা নিয়ে বাঁচতে হবে দীর্ঘদিন—যা অসহনীয়, মানুষের আয়ু ক্ষয় করে দেয় গোপনে, নীরবে। ভরত ঝামেলার পথে হাঁটতে চায় না। ছেলে-মেয়েকে নিয়ে তার সমস্যার শেষ নেই, সে তো সমস্যার গভীরে তলিয়ে গিয়ে থৈ পায় না ; হাবুডুবু খাওয়া মানুষের মত চেহারা হয় তার তখন। সুদাম কোনদিন সংসার জীবনে ঢুকল না, সারাদিন উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়ায়, কে খেল কি মরল এসব খোঁজে তার কোন উৎসাহ নেই। রোগা-প্যাটকা ছেলেটার বাকি জীবনটা কিভাবে কাটাবে—এ নিয়ে দুঃশ্চিন্তায় আছে ভরত। একমাত্র মেয়ে মীরাকে নিয়ে সে নিজেই বুঝি পাগল হয়ে যাবে, কেননা মেয়েটার জ্ঞানপড়ার পর থেকে মাথার কোন ঠিক নেই, বিশেষ করে এই চৈত্র-বৈশাখের দিনে সে বদ্ধ-উন্মাদ হয়ে ঘোরে, তার লাজ-লজ্জার কোন বালাই থাকে না, মুখ দিয়ে লালা-ঝরে, চুল আঁচড়ায় না, উচ্চস্বরে আবোল-তাবোল কথা বলে, কারণে—অকারণে হা-হা করে হেসে ওঠে, সে কখনও এক জায়গায় স্থিতু হতে জানে না। অথচ শীত এলেই সে আবার স্বাভাবিক হয়ে ওঠে, কাঁটাঝোপ থেকে সে যেন নিজেকে বদলে নেয় ফুলবাগানে। ভরত কত চেষ্টা করেছে মেয়েটাকে সুস্থ করে তুলবে বলে—কিন্তু পারেনি, তার শেকড়বাকড় জলপোড়া মাদুলি-তাবিজ, ঠাকুর-দেবতার কাছে মানসিক করা—সব বৃথা হয়েছে। মীরাকে নিয়ে ভরত আর যোগমায়া দু'জনেই ব্যতিব্যস্ত, প্রায়ই মেয়েকে নিয়ে ওদের ঘরে অশান্তি লেগে থাকে, আর এই অশান্তিটা অনেকটা তুষের আগুনের মতো, প্রথমে ধিকিধিকি জ্বলতে জ্বলতে এক সময় উষ্ণকথার হাওয়ায় তা ভয়াবহ আগুনে রূপ নেয়। এসব ভুলে থাকলেও ভরতের মাথার উপর শকুনের মতো বসে আছে তার বৃদ্ধ বাবা গঁড়া। কবে যে উপরে যাবে—একথা কেউ আগাম বলতে পারবে না, কেননা মানুষের জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ নিয়ে কারোরই ভবিষ্যৎবাণী কোনদিনও খাটেনি। গঁড়া রাতদিন শুয়ে থাকে ছোট তক্তাপোষটার উপর, ভরতের গলার আওয়াজ পেলে সে নড়েচড়ে বসে, গলা খেঁকারি দেয়, চিঁ-চিঁ শব্দে প্রশ্ন তোলে কণ্ঠায়, এই বুঝি এলিরে বাপ! এট্টু ছায়ায় বোস, অত ঘুরলে তোর ব্রহ্মতালু তেতে ঘিলু যে সব বেরিয়ে যাবে। দিনে দিনে তুই যে আমার মতন হয়ে যাবি। যা করিস এট্টু নিজের শরীরের দিকে খেয়াল রাখিস।

বাপের কথায় ভরতের ঠোঁটের কোনে হালকা একটা হাসির রেখা খেলে যায়, সে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে রুগ্ন গঁড়ার চোয়াল বসা মুখের দিকে। কথা হারিয়ে যায় তার, হাড়-চামড়ায় মেশামেশি মানুষটার দিকে সে অপলক তাকিয়ে থাকে, ভাবতে থাকে—এই বাপ একদিন পুরো চোরপালিয়া দাপিয়ে বেড়াত, ভিন-গাঁ থেকে লোক আসত এই মানুষটার কাছে ঢাক-ঢোলের 'বোল' শিক্ষা নেবার জন্য। গঁড়ার ঢাক বাজানোর

হাতখানা ছিল খাসা, ঢাকে কাঠি মারলে শব্দ হোত মনমাতানো, লোক হাঁ-করে শুনত তার ঢাকের বাদ্যি, আর উৎসাহিত গঁড়া ঢাকের বোল আউড়ে নাচত মনের আনন্দে, তাক লাগিয়ে দিত পুজো-অনুষ্ঠান বারোয়ারী- তলা। সেই সুরেলা ঢাকের শব্দ এখন যেন কানে বাজে ভরতের, এখন তার আর কোন আনন্দ বা গর্ববোধ হয় না, শুধু আক্ষেপ হয়—নিজে ওই বিদ্যেটা ভালভাবে রপ্ত করতে পারে নি বলে। তবে যারা ঢাক বাজানোর বিদ্যে শিখেছে—তাদের এখন আর পেটের ভাতের যোগাড় হয় না, তারাও সংসারের ঘানি টানতে গিয়ে হাঁপিয়ে পড়ছে দিনে দিনে, তারাও ঝুঁকছে অন্য পেশার দিকে যাতে জীবন বাঁচে। জীবন বাঁচানো এখন বড় কঠিন। ভরত আকাশের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। কালো কালো বিন্দু বিন্দু ফোঁটাগুলো আর নজরে পড়ল না তার, হতাশায় মন ভরে যেতেই সে এগিয়ে গেল পিচরাস্তার দিকে, আর তখনই তার সাথে দেখা হল মহিমের সাথে। মহিম তাদের পাড়ায় থাকে, বড় ধূর্ত ছেলে, স্বার্থছাড়া সে কারোর সাথে কথা বলা, সম্পর্ক রাখা পছন্দ করে না। এছাড়াও আছে তার চুরিকরার অভ্যাস, একটু সুযোগ পেলেই সে ঘটিবাটি এমন কী মাদুরটা পর্যন্ত চুরি করে নিয়ে পালায়। আবার ধরাও পড়ে, গণধোলাই খায় তবুও তার চরিত্রের এক ফোঁটা পরিবর্তন আসেনি, গাঁ ঘোরে নিজের মতলবে নিজস্ব ধান্দায়।

মহিমকে দেখে খুশি হল না ভরত, তবু চোখে চোখ পড়তেই থামতে হল তাকে। মহিম মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, ভরতদা, আমি তোমাকে খুঁজছিলাম। যাক দেখা হয়ে ভাল হল। তোমার সাথে দরকারী কথা আছে। তার আগে একটা বিড়ি দাও তো, জুঁত পরে টানি—

অগত্যা মহিমকে একটা বিড়ি দিল ভরত, ম্যাচিসটা এগিয়ে দিয়ে বলল, যা বলার তাড়াতাড়ি বল, আমার মেলা কাজ পড়ে আছে।

বিড়ি টান দিয়ে মহিম হাসল, কাজের কথা বলব বলেই তো তোমাকে খুঁজছি। জানো তো—জানাদের বুড়া হালিয়াটা ছের রোগে মরেছে গত রাতে। ওরা ভাগাড়ে দেয়নি গোরুটা, গোয়ালেই পড়ে আছে।

কেনে? মহিমের মুখের উপর ঝুঁকে পড়ল আগ্রহী ভরত, তাহলে উপায়? মরা গোরু গোয়ালের বাইরে আনবে কে?

কেন, তুমি, আমি! পারবা না? মহিম দাঁত ফাঁক করে হাসল, জানা-রা চিপসের হাড়। লোক দিয়ে ওরা গোরুর ভাগাড়ে নিয়ে যাবে না। তোমার যদি দরকার হয় তাহলে গোয়াল থেকে নিয়ে যাও। আমাকে তো তাই বলল। সেই থেকে আমি তোমাকে খুঁজছি।

এবার ভ্রূ কুঁচকে গেল ভরতের, জানাদের গোরু মরেছে তাতে মহিমের এত উৎসাহের কারণটা কি সে বোঝায় চেষ্টা করল। শেষে একটা সিদ্ধান্তে পৌছাল এখান থেকে মহিম কিছু কামিয়ে নিতে চায়, বিনে পয়সার সে কেন ভাগাড় অব্দি গোরু বয়ে নিয়ে যাবে। অথচ মহিম ছাড়া এ কাজে উদ্ধার পাবে না ভরত। অত বড় গোরুটা ভাগাড় পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া মুখের কথা নয়, দুটো মানুষের পক্ষেও তা সম্ভব নয়, কম্ম করে আরো দু'জন লোক দরকার।

জানা ঘরে গিয়ে কথাটা পাড়ল ভরত, তার কথা শুনে জানার বড় ছেলে বলল, ঠিক আছে, আমি আরো দু-জন লোকের ব্যবস্থা করে দেব। তবে নগদ কিছু দিতে

পারব না, গোরুটা মরে গেল— সময় বড় খারাপ গো! ভরত দরকষাকষিতে নামল, খালি হাতে কি কোন কাজ হয়? গো-দায় মহাদায়। এর থেকেও মানুষকে উদ্ধার পেতে হয়, নাহলে বিপদ! ছেলে-মেয়ে নিয়ে ঘর করা তো মুখের কথা নয়।

জানা বাড়ির বড় ছেলে ঘাবড়ে যায় কিছুটা, কপালের ঘাম মুছে সে বলল, ঠিক আছে, কিছু একটা করা যাবে, এখন গোরুটাকে তো নিয়ে যাও। কোচড় ভর্তি মুড়ি আর আখের গুড়ে রফা হয় গোরুকে ভাগাড়ে নিয়ে যাবার, আর তাতেই খুশি হয় মহিম এবং ভরত। মেঘ না চাইতে জল—এটাই বা কম কি।

ছাল ছাড়িয়ে ফিরতে বেলা গড়াল ভরতের, মাথার উপর সূর্য দাপাদাপি করে উল্লাসে। কাক-শকুন ছুটে এসেছে মরা গোরুর গন্ধ পেয়ে। ভাগাড়ের পাশের নিমগাছটা ওদের চিৎকার চেঁচামেচিতে হাটকেও যেন হারিয়ে দেবে। পোঁটলায় চাম বেঁধে নিয়ে ভরত গেল মাঠপুকুরে হাত ধুতে, তার পেছন পেছন গেল মহিম, নীচু স্বরে বলল, ভরতদা, এট্টা কথা বলি—। হাঁটু জলে ঘাড় ঘুরিয়ে ডাঙার দিকে তাকাল বিরক্ত ভরত, সে বুঝতে পেরেছে মহিম তার কাছে এখন কি চায়। রাগ চেপে সে বলল, যা বলার বলে ফেল।

আমার কথাটা এট্টু ভাববে না?

ভরপেট জলখাবার খেলি—আবার কি?

ব্যস, এতেই শেষ? মহিম ক্ষুণ্ণ গলায় বলল, আমি না থাকলে চামটা তোমার হাতছাড়া হয়ে যেত।

সে ঠিক। কী বলতে চাস স্পষ্ট করে বল?

যদি কিছু দিতে উপকার হোত। আমিও তো গরীব মানুষ। চেয়ে-চিন্তে বেঁচে আছি।

ঠিক আছে, সে দেখা যাবে। আগে চামটা বিকি— তারপর।

এখন কিছু হবে না? মহিম ভিখারি চোখে তাকাল, ঘরে চাল নেই। আঁখা জ্বলেনি। তোমার বউমা রাগারাগি করছিল।

ভরত হাতে মাটি ঘষে উঠে এল পাড়ে। বটের ছায়া ঘন হয়ে পড়েছে ঘাসের উপর, হলুদ বটপাতা এক একটা সমুদ্রের মাছের মত, এত নরম ছায়ায় মনটা নরম হয়ে এল ভরতের, ডিবা খুলে একটা বিড়ি মহিমের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, নে ধরা। এক সের চাল তোরে আমি দেব। আমি কাউকে ঠকাব না। ঘর চল। তোর কোন চিন্তা নেই। একবার যখন মুখ ফুটিয়ে বলেছি চাল তুই পাবি।

পাশাপাশি হাঁটছিল ভরত আর মহিম, মেঠো পথের ধুলো উড়ছে হাওয়ায়। ঠা-ঠা রোদ, এখন কোথাও কোন ছায়া নেই। মাথার উপর উড়ছে শুধু ক্ষুধার্ত চিল, তার সচল ছায়ায় পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে ক্ষুধার গল্প। চাম চুয়ানে-রক্ত জলে ভিজে গেছে ভরতের কাঁধের চামড়া, সেই বদরক্ত পৃচ্ছিল নেমে এসে কৌনিকভাবে ছুঁয়েছে পেটের চামড়া। মাছি ভনভনিয়ে উড়ে আসে, কামড়ায়; কুটকুটায়, তবু ভরতের কিছু করার নেই, দাঁতে দাঁত টিপে সে হাঁটতে থাকে ঘরের দিকে। আল টপকে মহিম

বলল, ভরতদা, এট্টা কথা বলি। রাগ করো না। তোমার ঘরের মীরাটার দিকে এট্টু নজর রেখো। গাঁ-ঘরের হালচাল ভাল নয়। পাগলি মেয়েটার কেউ কিছু করে দিলে সে লজ্জা শুধু তোমার একার নয়, পুরো পাড়ার।

ভরতের হাত ফসকে পড়ে গেল চাম পুঁটলিটা পথের ধুলোয়। পেছনে আসা কুকুরটা ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইল চামের উপর। বেগতিক দেখে ভরত বুক দিয়ে আঁকড়ে ধরল চাম-পুঁটলি। গলার রগ ফুলিয়ে বলল, যা, দূর হাট। এ চাম আমার। এর ভাগ আমি আর কাউকে দেব না।

॥ দুই ॥

দুপুর ঝিমিয়ে এলে গাছেরা ঝিমোয়, ফাটা মাটির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে ভাষা—সেই ভাষায় জ্বালা পোড়া করে ভরতের গা-গতর, চিনচিন করে কপালের দু'পাশ, লাফিয়ে ওঠে শিরার জল কেঁচো, তাকে অতিষ্ঠ করে ছাড়ে। আপসে শ্বাস বেরিয়ে আসে নাকের ছিদ্র দিয়ে, হাঁপসে উঠে সে শুধু মহিমকে দেখতে থাকে অপলক। মহিম যেন কিছু জানে না, শান্ত-নির্বোধ এমন ঢঙে হাঁটে। তার কথাগুলো মোক্ষম লেগেছে ভরতের, এটা বুঝতে পেরে সে-ও কিছুটা শান্ত ভেতরে-ভেতরে। মানুষের আঁতে ঘা দিলে সে অনেক সময় জাতে ওঠার চেষ্টা করে, নিজের ভুলচুক শুধরে নেবার আপ্রাণ চেষ্টা করে। ভরতের বেলায় তেমন কোন লক্ষণ দেখতে পায় না মহিম, ফলে সে নিজেই এখন মনের দিক থেকে কোনঠাসা।

গাঁয়ের টিকি দেখা যায় দূর থেকে, পিচ-রাস্তায় উঠলে পুরো গাঁখানা ঝলসে পুড়ে যাওয়া রুটির মতো কদাকার। সবুজ বলতে শুধু বাঁশঝাড় আর অর্জুনগাছ। খুচরো-খাচরা গাছগুলো এখন ঝিমোয়, যেন সাপে কেটেছে ওদের, বিষজ্বালায় অস্থির তাতা দেহ। এই চামড়া পোড়া গরমে ভরতের পা চলে খরখর, সে যেন খরগোসের মতো ছুটছে, বেলা টিকলিতে চড়ে গেলে ঘরে ফিরে কোন কাজের কাজ হবে না, শুধু ঝকমারী হবে যোগমায়া—উগলে দেবে বিরক্তি। ভরত জানে কাঁচা চামড়ায় কাজ অনেক। নুন মাখিয়ে পুকুরয়াড়িতে শুকোতে দেবে চাম, কাক-চিল-কুকুরে যাতে না খুঁবলায় তার জন্য খিলকাটি পুঁতে দেবে—কাঁচা চামড়ার কোনায়-কোনায়। তারপর নুন ছিটিয়ে এঁটেল মাটিতে হাত রগড়ে ধুয়ে নিলেই হল। চামড়া ছাড়ানোর সময় মাংস লেগে থাকে হড়বড়িতে, সেগুলো সাফ-সুতরো না করলে রক্ষে নেই, মাংস পচে দুর্গন্ধ ছড়াবে বাতাস। পাড়া-পড়শী গাল দেবে তখন। আর যোগমায়াও ভ্রূ কুঁচকে ঠোঁট উল্টে তাচ্ছিল্য ভরে বলবে, তোমার জন্যি আমার মুখ দেখানো দায় হল। তাগান কাটার কাজ আর করো না বাপু। ছাল না ছাড়ালেও এ পোড়ার সংসার ধুঁকতে ধুঁকতে ঠিক চলে যাবে।

এসব কথায় কান দেয় না ভরত, সব কথার সে জবাব দেয় না এটা তার ধর্ম। যোগমায়া পুকুরয়াড়িতে এসে ঘ্যানরঘ্যানর করলে নিজেকে পাঁকমাটির চেয়েও ঠাণ্ডা

রাখে ভরত, সে জানে—গরম তেলে জল পড়লে আরও চড়বড়াবে, বেগতি হলে পুড়ে ফোসকা নেবার ভয়। ঘাড় ছাপিয়ে রসকাটা জলের ঢল নামছে, গা বেয়ে একেবারে পায়ের গোড়ায়। নিত্য ব্যবহারের গামছাটা রক্তকষে ভিজে একেবারে ম্যাদামারা, হাওয়ার সাথে দুর্গন্ধ ভাসায়, যা ভরতের নাক সওয়া। মহিম চোরাদৃষ্টিতে দেখতে থাকে ভরতকে, ভয় পায় সে। একটাও কথা ফোটে না মুখে। এই মানুষটার রাগ তার অনেক আগেই জানা হয়ে গেছে, কাজের সময় ফটরফটর করলে মুখের মাপে জবাব দিয়ে ছেড়ে দেবে—মেজাজ বিগড়ালে বাপ-মা তুলে গাল দিতে সে পিছপা হবে না। এমনিতে মহিমের বাজার খারাপ, গাঁয়ে তার নামে বদনাম, কেউ তাকে ভাল চোখে দেখে না, পেছনে সবাই তাকে 'চোর' 'ডাকাকালিয়া' বলে ডাকে যা তার বৌ যমুনার একেবারে না-পছন্দ। এসময় মুখে কুলুপ এঁটে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। ভাবল সে। ভরত এসে আগড় সরাল বাঁ-হাতে, খলাবাহিরে পা না দিয়ে সে ডাকল, বৌ, ও বৌ!

হলুদ জল কাপড়ে মুছে হেঁসেল ঘর থেকে বেরিয়ে এল যোগমায়া, ভরতের কাহিল চেহারা দেখে মনে মনে সে ব্যথিত হল, এত যে দেরি হল কোথায় গেছিলে গো তুমি?

ঘরে বসে থাকলে কি পেট চলবে? আগুন উগরান চোখে তাকাল ভরত, তারপরই ছুঁড়ে দিল প্রশ্ন, মীরা কোথায়? তারে একবার ডাকো। আমি পুকুর-য়াড়িতে যাচ্ছি চামড়া সাইজ করতে। ওকে বলো যেন একটা লাঠি নিয়ে আসে।

লাঠি না হলে চামড়া ছাড়ানোর কাজ হয় না ভাগাড়েও। চামড়া ছাড়াতে গেলে কাক শকুন কুকুরের উৎপাত লেগেই থাকে, ওদের জ্বালায় মন দিয়ে কাজ করা যায় না, একটু অন্যমনস্ক হলেই দলে দলে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়বে মরা গোরুর উপর, তখন ভয়-ডর ওদের কলিজা থেকে উবে যেতে বাধ্য। ক্ষিদের জ্বালা মহাজ্বালা। এ জ্বালায় জীবজগত মত্ত। তখন কে কার শত্রু বোঝা দায়। আগে ভাগাড়ে গেলে তার সঙ্গে থাকত সুদাম, লাঠি হাতে ভাগাড়ের মাঝখানে সুদাম যেন পাকা চৌকিদার। ভাগাড় খেগো কুকুরগুলোর ঝাঁঝ-রাগ মাত্রারিক্ত, ওরা লাঠি ছাড়া আর কিছুকে ডরায় না। শকুনগুলোও নাছোড়বান্দা, তারাও অগ্রাহ্য করতে চায় মানুষের উপস্থিতিকে। কুকুর শকুন কাক সবাই কিন্তু ভয় পায় ঐ পাকা বাঁশের লাঠিটাকে। লাঠি না থাকলে ওরা বুঝি কোনদিন খুবলে খেয়ে নিত ভরতকে। প্রায় রাতেই ভরত স্বপ্ন দেখে ভাগাড়ের, স্বপ্নের মধ্যে সে ছাল ছাড়ায়, কাক তাড়ায়, গ্যাংটা-পাথর ছুঁড়ে দেয় শকুনের দিকে, লাঠি হাতে ধেয়ে যায় ক্ষুধার্ত কুকুরের দিকে। যোগমায়া তার ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে বলে, কী হল অমন করচো কেন? বিছানাটাও দেখছি তোমার কাছে ভাগাড় হয়ে গেল। মুখের লালা মুছে ভরত তখন অন্য মানুষ, যোগমায়াকে বুকের কাছে জাপড়ে ধরে বিড়বিড় করে বলে, তুমি আমার ভাগাড়ের লক্ষ্মী গো। চোখ বুঁজো, আমি তোমারে ছাড়াই। শুরু হয় দেহের খেলা, বিছানা ভিজে যায় গায়ের ঘামে, বুকের উপর বুক, নাঙ্গা শরীরে চকমকি পাথরের ঘর্ষণ এবং উত্তাপ। যোগমায়া রোদে ফাটা মাটির মতো চুপচাপ পড়ে থাকে, গরম ভাপা বেরয় ভরতের নাক-মুখ দিয়ে, ঘন ঘন শ্বাস ছেড়ে

আক্ষেপের সুর ভাসায় আঁধার ঘরে, কেন মরতে খাসি হতে গেছিলাম গো, হাসপাতালের কটা টাকায় আর কী হল বলো। মান গেল, সব গেল। খাসি না হলে আর এট্টা সন্তান হোত আমাদের। সেটা লেসচয়ই মীরা আর সুদামের মতন হোত না। যোগমায়ার দীর্ঘশ্বাসে বুক কেঁপে ওঠে ভরতের, বিড়বিড়িয়ে ওঠে তার গলা, অভাব সব খায়, রক্ত ঘাম শখ আহ্লাদ সব খায়। সুদামের মা, আমার বড় কষ্ট গো! ঐ মরা পুকুরটার মতো আমিও শুকিয়ে গেছি। পারলে তুমি আমারে এট্টা সন্তান দাও, আমি কুনো পাপ ধরব না। এরকম তো গাঁয়ে ঘরে কত হয়।

যোগমায়া শাড়ির আঁচল দাঁতে চেপে ফুঁপিয়ে ওঠে, তার কলাগাছের মত নগ্ন মসৃণ থাইয়ের উপর পাগলের মত মুখ ঘষতে থাকে ভরত। নিষ্ফল আক্রমণে এই মাঝ বয়সে পীড়িত হয় যোগমায়া, সেও আঁকশি লতা হয়ে জড়িয়ে ধরে ভরতের ফণা তোলা কালকেউটে দেহ। বিষ নয় যেন পেট দেখানো পুকুরের ঘোলা জল ঢেলে দেয় ভরত। তারপর এক সময় আক্রোশে চুলের মুঠি চেপে ফুঁপিয়ে ওঠে ভরত।

পুকুরয়াড়িতে রোদের ছায়া পড়েছে, কলাগাছের শিরা ছুঁয়ে পিছলে নামছে রোদ। এ জায়গাটায় রোদের দাঁত ভোঁতা ; খিরিষের পাতায় জিভ ঘষে গেছে রোদের। চাপ চাপ ছায়ার ভেতর চামড়ায় লেগে থাকা চাপ চাপ মাংস চাকু দিয়ে কাটতে থাকে ভরত। যোগমায়া কিছু দূরে নাকে আঁচল চেপে দাঁড়িয়ে আছে, বাড়ির কুকুরটার চোখ জ্বলজ্বল করছে লোভে। মীরা লাঠি বাগিয়ে ডাকাত রানীর মতো দাঁড়িয়ে আছে পুকুরপাড়ের এক ধারে, সরু পথ দিয়ে কুকুর কেন একটা ডাঁশ-পিঁপড়ে গলতে দেবে না এই প্রতিজ্ঞা। তার ফর্সা গালে রোদের লালচে আভা, চকচক করছে টানটান কিশোরী বয়সের চামড়া। এ কাজে তার খুব আনন্দ, নিজেকে দায়িত্ববান বলে মনে হয়। একমাত্র ভরত ছাড়া তাকে আর কেউ কোন কাজ দেয় না, এ সংসারে সে একটা খোলামকুচি ছাড়া আর কিছু নয়।

মহিম হাঁ-করে দেখছিল মীরার শরীর, যোগমায়ার তীক্ষ্ণ চোখ তাকে কেমন আড়ষ্টতায় গিলে নিল, সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে মহিম এখন যেন অন্যমানুষ, জোর করে ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে বলল, বৌদি, পিয়াস লাগে, এক গেলাস জল দাও না।

যোগমায়া ঠোঁট কামড়ে তাকাল, পুকুর দেখিয়ে বলল, জল খেতে মন চায় তো পুকুরে গিয়ে খেয়ে নাও। আমার সময় নেই যে তোমাকে জল এনে দেব। হেঁসেল ঘরে চুলায় মাছের টক বসিয়ে এসেছি, এবার আমি যাই।

সে চলে গেল কিন্তু মহিমের কথা ভুলল না। শুধু মহিম কেন এ গাঁয়ের অনেকেরই মীরার দিকে লক্ষ্য, মেয়েটা পাগলি বলে সবাই ভাবে ছাড়া গোরু, গোয়ালে ঢোকাতে ব্যস্ত সবাই। মীরা যখন যোগমায়ার ময়লা শাড়ি পরে বাইরে বেরয় তখন তার রূপ যেন ফেটে বেরয়, দুর্বাঘাস থেকে এক লহমায় তার শরীরটা যেন হয়ে যায় বর্ষার মানকচু গাছ। যোগমায়া নিজেই দৃষ্টি ফেরাতে পারে না, ভয়ে মরে, চোখের পাতা থিরথিরে সুষনি শাকের পাতার মতো কাঁপে, বুকের ভেতর কে যেন ভয়ের ঢাকটা এলোমেলো বাজিয়ে দেয়, সেই শব্দ যে বিসর্জনের শব্দ এটা বুঝতে পেরে মনে মনে তরাস খায় সে নিজেও। মুখপুড়ী মেয়েটার শরীরের বাড় বর্ষার নদীর মতো, হাসলে

শরতের কাশফুল দেখায় মুখখানা। মাথায় তেল জোটে না সময়মত তবু কি চুলের বাহার, ভয় পেয়ে তার দুগ্গাঠাকুর চুলগুলো একবিঘোত কেটে দিয়েছে যোগমায়া, যা দেখে সুদাম কত চোটপাট করল তার উপর। যোগমায়া তাকে বুঝিয়ে বলেছিল, অত রাগিস নে বাপ। এই চুলই একদিন ক্ষেপির কাল হবে তাই আমি কেটে দিলাম। শুধু চোটপাট করলে হয় না, বোনের জন্য এট্টা শাড়ি কিনে আনার ক্ষমতা রাখা চাই। তোর বাপ তো গাঁ আর ভাগাড় ঘুরে সন্সার চালায়, তার পাশে তোর এখন দাঁড়ানো দরকার। যদি পারিস তাহলে বুঝব তোর বুকের পাটা আছে।

সেদিন চুপ করে গিয়েছিল সুদাম, মুখ দিয়ে কোন কথা সরে নি ; শুধু চোখের দু-কোণ ভেজা। চুলার বেয়াড়া কাঠের ধুঁয়ায় চোখ ভরে জল এল যোগমায়ার, এ জল মীরার জন্য না সুদামের জন্য সে সঠিক ভেবে পেল না। তবে তার মনে পড়ে গেল মীরার বড় হওয়ার কথা। পুকুরে নাইতে গিয়ে হঠাৎ রক্তের ছোপ জলের ভেতর, মীরা ভেজা শরীরে কাঁপতে কাঁপতে উঠে এসেছিল পুকুরপাড়ে। জীবনের প্রথম কৃষ্ণচূড়া-লজ্জায় কুঁকড়ে গিয়েছিল সে, কিছু বুঝে ওঠার আগে সে চিৎকার করে ছুটে এসেছিল যোগমায়ার কাছে ; হাঁপাতে হাঁপাতে ভয়ার্ত গলায় বলেছিল, মাগো, অক্ত! মোর ইখানে জলঢোঁড়া সাপে কেটেছে। তারপর মৃত্যুভয়ে তার সেকি কান্না! যোগমায়া কত কি বোঝাল, তার একটা কথাও মনে রাখেনি মীরা, শুধু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল সে বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে। যোগমায়া তার গায়ে-পিঠে হাত বুলিয়ে দিল স্নেহের, গালে চুমু খেয়ে আদর করে বলল, মারে, অমনধারা কাঁদতে নেই, কাঁদবি কেনে—আজ থেকে তুই বড় হয়ে গেলি!

সত্যি অনেক বড় হয়ে গেছে মীরা, ভাগাড়ের শকুনগুলোও এখন তাকে লোভী চোখে দেখে। এই দামাল-ক্ষ্যাপা মেয়েকে নিয়ে কোথায় যাবে যোগমায়া, একে ছেড়ে সে যে বাইরে গিয়েও শান্তি পায় না। তার মাথার উপর তিন-তিনটে শত্রু—মীরা, সুদাম আর বুড়া গঁড়া। এদের ফেলে সে কোথায় যাবে? এরা যে তার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস।

চামড়ার চারদিকে খিলকাঠি গুঁজে পুকুরের এঁটেল মাটিতে রগড়ে হাত ধুয়ে নিল ভরত, ঘাড় ঘুরিয়ে বেলা আন্দাজ করে চমকে উঠল সে। বেলা চলে গেছে টেঁরের দিকে, এখন তেল মেখে চানটা সেরে নিতে পারলে রক্ষে। অবেলায় চান-খাওয়া করলে তার বুকের ব্যথাটা বাড়ে প্রায়-সময়। মহিম ঘাটের কাছে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে তখন, সের খানিক চাল না নিয়ে সে নড়বে না, তার এখন ধান্দা খারাপ—যমুনার গাল শুনতে চায় না। মাঝে মাঝে তার মনে হয় বউটাকে গলা টিপে মেরে ফেলতে, কিন্তু কী কারণে সে তা আর পেরে ওঠে না, যমুনার কাছে এলে সে মানুষ থেকে আস্ত একটা ভেড়া হয়ে যায়। যমুনা তাকে কত বোঝায়, সারাদিন ঘোরাঘুরি না করে সবাই যা করছে তুমিও তাই করো। দুটো পেট ঠিক চলে যাবে। কিন্তু যমুনার কথা শোনার পাত্র নয় মহিম, তার লক্ষ্য চটপট বড় লোক হওয়া, এ পাড়ায় মোক্ষম একটা মাটির ঘর তোলা। ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখতে সে ভালবাসে। তার নজর উপর দিকে ফেরান, সে যেন এ পৃথিবীর মানুষ নয়, আকাশ থেকে ঠিকরে পড়া দেবদূত। হাতে সিঁদকাটি থাকলে সে রাজাধিরাজ, তখন কারোর দোরে মজুর

খাটতে তার মন করে না, তখন আপনা হাত জগন্নাথ— মারি তো গণ্ডার, লুটি তো ভাণ্ডার! এই মানুষকে নিয়ে যমুনার যত জ্বালা। তার রূপ আছে, শরীরে শক্তি আছে—তবু মহিম তাকে কারোর দোরে খাটতে দেবে না। তার প্রেম জোয়ারের টানের চেয়েও তীব্র, নাহলে কথার ফাঁদে আটকে গিয়ে সে কেন এক ডাকে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল রাধার মতো। মহিম তাকে ফুঁসলিয়ে বলেছিল, বিয়ে না করে আমি কোন মেয়ের গায়ে হাত দিইনে। আমাকে যদি তোমার মনে ধরে তাহলে পালিয়ে চল। আমার ঘরবাড়ি পুকুরজমি—জিরেত সব আছে, শুধু নেই মা-বাপ, আর আমাকে আগলে রাখার মানুষ। তুমি যদি স্বেচ্ছায় আমার আগোলদার হতে চাও, আমি তোমাকে ফিরিয়ে দেব না, বুকে করে রাখব।

কথার ফাঁদে সেই যে আটকে গেছে যমুনা, বন-ডাহুকীর মতো সে আর ফাঁস কেটে বেরতে পারেনি। কাঁথি শহর থেকে এ গাঁয়ে এসে সে দেখল ঘর না ছাই, শুধু ভিটে মাটিটা পড়ে আছে বানবন্যায় ধুয়ে, ভাঙা কাঁথ দেওয়ালে ছাগলছানা লাফায় গায়ে রোদ লাগিয়ে, কুকুর ঠ্যাং-তুলে হালকা করে রেচন দ্রবণ। ঘাস আর নেকাসিমা গাছে ভরে আছে উঠোন, কাঁটা বেগুনের ফুলে কালো ভ্রমর এসে বসেছে, জাড়াগাছের পাতার ছায়ায় মহিমের ভাঙা দেওয়াল খতগাদি। চোখ ভাসিয়ে কাঁদলে লোক হাসবে তাই যমুনা সেদিন কাঁদেনি নিজের মন্দ কপালকে গালমন্দ করেছে, আর আঙুল কামড়ে নখের কোণের চামড়া উঠিয়ে ফেলেছে রাগের ঘোরে, শুলোনী বাড়তে হুঁস ফিরেছে তার, চোখের জল নতুন শাড়িতে মুছে নিয়ে সে শুনেছে যোগমায়ার কথাগুলো, ও লোতুন বউ, কেন এলে গো এখানে? যার হাত ধরে এখানে এলে সে হাত যে পলকা আতার ডাল। মহিম ঠাকুরপোকে না জেনে- বুঝে তোমার এখানে আসা উচিত হয়নি। এখন কেঁদে কেটে কোন লাভ নেই, সিঁদুর যখন পরেছ এখন তার মূল্য তো তোমাকে দিতে হবে ভাই। মহিম ঠাকুরপো চোর-ছ্যাচোড়-ঠকবাজ যাইহোক না কেন- সে এখন তোমার সোয়ামী। শুধু শুলে হবে না, তাকে মানুষ করো। মেয়েমানুষ পারে না হেন কাজ কি আছে গো?

সেই শুরু, এর শেষ কোথায় জানে না যমুনা, সে শুধু আঁধার ঘরে একটা চামচিকিকে পাখি বানাতে চাইছে, বারবার চামচিকির নখের আঁচড়ে ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে তার দেহমন। মাঝে মাঝে অভাব এমন আসে তখন আর বেঁচে থাকতে মন চায় না যমুনার, তখন মনে হয় মরে গেলে বুঝি ল্যাঠা চুকে যেত, আগুনে পুড়ে ছাই ভেসে যেত বাতাসে। এত ঘেন্না আর অপমান নিয়ে কি মানুষ বাঁচতে পারে, মানুষ তো ক্ষুধায় বাঁচে, বন্যায় বাঁচে, ঝড়-তুফানে সে ভেসে যায় না, ঠিক ধরে রাখে নিজের অস্তিত্ব। মহিম যেদিন জানা বাড়িতে সিঁদ কেটে ঘরে এল—সেদিন তার তৈলাক্ত বরণ শরীরটার দিকে তাকিয়ে কামের আগুনে মথের মতো পুড়ে যেতে পারেনি যমুনা, শুধু দুরুদুরু বুকে তাকিয়ে দেখছিল একটা দামাল মানুষের লোভের জিহ্বা। সে রাতে মহিম তাকে আদরের বন্যায় ভাসিয়ে দিল, জানা বৌয়ের গলার সোনার হারটা তার গলায় পরিয়ে দিয়ে খেজুর পাতার মাদুরের উপর দীর্ঘসময় ধরে দেহের তাপ জুড়াল।

কাপড় গুছিয়ে যমুনা যখন উঠে বসল তখন অন্ধকার ঘরে কেরোসিনের গন্ধ, তার পায়ের ধাক্কায় লুটিয়ে গেছে লম্ফো, গড়িয়ে গিয়ে তেল, ভেজা মাটি ভেদ করে উঠে আসছে উগ্র এক বাসনা—যার ঘ্রাণ নাকে টেনে নিয়ে যমুনার মনে হয়েছিল সেও আজ ধর্ষিতা হল ঐ উল্টে যাওয়া লম্ফোর মতো। মহিম আধো স্বরে বলেছিল, তুমি আমার রানী গো, সোনার হার পরে তোমাকে কী সোন্দর না দেখাচ্ছে! সবুর কর, তোমার সারা গা-গতর আমি সোনায় মুড়ে দেব।

আমার সোনা-দানা কিছু চাইনে। সশব্দে কেঁদে উঠেছিল যমুনা, নাকের সকড়ি টেনে সে কোনমতে বলেছিল, তুমি আর সিঁদ কাটতে যাবে না, আমার মাথায় হাত ছুঁয়ে কিরে কাটো। ক'পা পিছিয়ে গিয়েছিল মহিম, দু'চোখে বিস্ময়-কাজল, চাপা হাসিতে ঘর ভরিয়ে বলেছিল, এ তো বড় মজার কথা! সিঁদ না কাটলে তোমাকে আমি খাওয়াব কি? আমার বাপ তো রাজ্য রেখে যাইনি আমার জন্য যা ভেঙে তোমাকে রানীর মতো খাওয়াব। আমার এই হাত দুটো যতদিন থাকবে, যতদিন রাতের বেলায় চোখের তারায় আলো জ্বলবে—ততদিন তোমার কোন চিন্তা নেই। টাকা-সোনা দানা সব উড়ে আসবে ঘরের ভেতর।

আমি চোরের বউ হয়ে বাঁচতে পারব না, তাতে না খেয়ে শুকিয়ে মরলেও কোন দুঃখ নেই। প্রতিবাদে ভেঙে পড়তে চেয়েছিল যমুনা কিন্তু মহিম তাকে আর বেশি বাড়তে দেয় নি, চুলের মুঠি ধরে জোরসে দু-ঝাকুনি দিয়ে বলেছিল, ফের যদি ওকথা বলো তাহলো তোমার জিভ আমি কেটে নেব। যে পাতায় খাও, সেই পাতা ফুটো করা আমি ঘুচিয়ে দেব। আমি যেমন ভালবাসতে পারি তেমনি গলা টিপেও ধরতে পারি। মনে রেখো যে হাত সিঁদ কাটে, সে হাত অনায়াসে খুনও করে দিতে পারে।

ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়েছিল যমুনা, তার আর মুখ খোলার সাহস হয়নি। মহিম গভীর রাতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলে সে একা ফাঁকা ঘরে ভীতু বেড়ালের মতো বসে থাকত, দু-চোখে ঘুম আসত না একফোঁটা, কখন ঘরের মানুষ ঘর ধরে এই চিন্তায় পোকরা তারা দেখতে পেত আকাশে। এ এক অসহনীয় জীবনযাপন, দিনে দিনে হাঁপিয়ে উঠছিল যমুনা, জীবনের প্রতি নিজের প্রতি ঘেন্না ধরে গেল তার, মুক্তির খোঁজে তার চোখ দুটো তখন লাগাম ছাড়া। চোরপালিয়ার হাটে সে একদিন পেয়ে গেল জটাকে, মুখে তার জর্দা পান, ঠোঁটে রাঙা হাসি, যে হাসিতে মেয়েরা চম্পা-চামেলির সুগন্ধ হয়ে লেপটে যায় গায়ের উপর। কথায় কথায় জটা বলল, বৌদি, আমি মহিমকে খুঁজছিলাম। তার সাথে আমার খুব দরকার। বলতো সে কোথায় গেল এই অবেলায়? আমার ঘরে ফেরার তাড়া আছে। অথচ তার সাথে দেখা করে না গেলে মনটাও মানছে না, সে যে আমার প্রাণের বন্ধু গো।

ভালো কথা, হাটে দাঁড়িয়ে কী কথা হবে-ঘরে চল? যমুনার কালো ভ্রমর চোখের তারায় বুঝি আঠা ছিল, বট আঠায় আটকে যাওয়া বনিপাখির মতো পুরোপুরি আটকে গেল জটা। ঘরে ফেরার তাড়া মুছে গেল মন থেকে। লুকিয়ে চুরিয়ে সে দেখতে থাকল যমুনাকে, এমন বউ গাঁয়ের ঘরে আর কটা আছে-এই ভেবে তার কথা আটকে

গেল গলার ভেতর। কী নেই যমুনার, শীতের পালংয়ের মত যার চনমনে চেহারা, চোখের যাদু যেন দুর আকাশের তারা, সেই তারা এখন জটার নাগালের মধ্যে। ঢেউ আসছে, ক্রমাগত ঢেউ, জটা এখন কোথায় যাবে? আলো ছায়া অন্ধকারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ওরা, জটা মুখ ফসকে বলে ফেলল, বৌদি, পান খাবা?

দিলে আমি বিষও খাই। যমুনার শরীর দুলানো হাসিতে ভূমিকম্প শুরু হল জটার বুকের ভেতর। নিজেকে সামলে সে ছুটে গেল পান-দোকানে। এক খিলি পান যমুনার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, আমার অপরাধ নিও না, তোমার সামনে বেশিক্ষণ দাঁড়ালে আমি বুক ফেটে মরে যাব। আমাকে যেতে চাও বৌদি, ঘরে ফিরে আমি পুকুরে নাইব। আমার তালু দিয়ে ভাপ বেরয়। বুকের ভেতরে সমুদ্র আছড়ায়। সামনে সাগর। আমি কোথায় যাব বুঝতে পারছি নে।

যমুনার হাসি তবু থামে না, আঁচলে মুখ চেপে নিজেকে সংযত করে বলে, বিয়ে করো। বিয়ে করলে বুকের পাথর সরে যায়। সাগরকে মনে হয় ডাঙা জমিন। নিজেকে বাঁধ দাও আগে। আমি আসি।

পানের পিক ফেলে যমুনা হাটের মাঝে হারিয়ে যায়, আঁধার নেমে আসার আগে জটা ভাবে, যমুনা কোন বউ নয়, মেয়ে নয়, আস্ত একটা সাগর অথবা আলেয়া!

তেল মেখে নাইতে চলে গেল ভরত, ওর নাকে-কানে তেল দেওয়ার বহর দেখে মনে মনে হাসি পেল মহিমের, তারও ব্যস্ততার শেষ নেই, রক্তের ভেতর স্রোত বইছে যমুনার, আর তাতেই সে ভেতরে-ভেতরে ঘেমে নেয়ে একসা। ভেতরে ছটফটানী আছে তবু নিজের কথা সে মুখ ফুটিয়ে বলতে পারে না, ফলে দাওয়ায় বসে গঁড়া বুড়ার সাথে অনর্গল বকরবকর করে। কাৎ হয়ে ছোট তক্তাপোষে শুয়ে আছে গঁড়া বুড়া, তার ঘোলাটে চোখ জল কাটে, তবু বিড়বিড় করে সে বলে, অনেকদিন পরে তোকে দেখলাম। তা কেমন আছিস বাপ? স্বভাব-চরিত্র সব বদলেছে-না আগের মতো আছে।

পথের মাঝে বাঘ দেখলে মানুষ এত চমকায় না, মহিম হতবাক চোখে তাকাল, কথা হারিয়ে মুখ নীচু করে নিল সে। কঞ্চির বেড়ার উপর লতিয়ে বাড়ছে অপরাজিতা গাছ, গ্রীষ্মের রোদে তার ছোট-ছোট পাতাগুলো হালকা সবুজ, কঞ্চি জড়িয়ে সুখের সংসার পেতেছে মনের আনন্দে। অথচ আনন্দহারা মহিম বারবার যমুনার কথা ভেবে আতঙ্কিত হচ্ছে, তার ধ্যানধারণায় এখন শুধু এক সের চাল, এর বেশি সে আর কিছু ভাবতে চায় না। গলা খেকারি দিয়ে নড়ে চড়ে শুতে চাইল গঁড়া বুড়া, পাশ ফিরতেও তার কষ্ট তবু মহিমের দিকে সে তাকিয়ে আছে ঘোলা চোখে। মহিম ঢোক গিলে বলল, জ্যাঠা, এখন তোমার শরীল কেমন আছে? মাঝে তো খুব বাড়াবাড়ি হয়েছিল শুনেছিলাম। তখন অবশ্য আমি গাঁয়ে ছিলাম না, ধান্দায় গিয়েছিলাম বাইরে, ফিরে এসে তোমার বউমা আমাকে সব বলেছে—

ট্যাকাটিগাছে পুরনো ঝুল লেগে আছে মাকড়সার, হাওয়ায় দোলে সেই প্রায় ভারহীন জাল, গঁড়া বুড়া সেদিক থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিম তেতো স্বরে বলল, হ্যাঁ,

ঠিকই শুনেছিস বাপ। এ দেহ ছেড়ে পাখিটা যে কবে উড়ে যাবে জানি নে।! তবে আর বেশিদিন নেই, যমের রথ এসে দাঁড়িয়েছে, তার শব্দ আমি শুনতে পাচ্ছি। তবে মরতে আমি ভয় পাইনে, জীবনের শেষ বেলায় এসে ভয়-ডর আমার উবে গিয়েছে।

পুকুরধারের কচাগাছে চড়ুইয়ের দল বসে এক নাগাড়ে ডাকছিল, তাদের বিশ্রী ডাক কান বিষিয়ে দেয় মহিমের, তবু সে ধীর শান্ত হয়ে বলে, জ্যাঠা, এ জীবনের তুমি বহু কিছু দেখলে, যা হয়ত আমরা দেখার সুযোগ পাব না। দশ গাঁয়ের লোক জানে তুমি কত বড় ওস্তাদ, তোমকে দন্ডবত না করে কেউ ঢাক-ঢোলে আওয়াজ তুলতে সাহস পায় না। আমার বাবাও তো তোমার কাছে বাদ্যযন্ত্রের শিক্ষা নিয়েছিল। তার মুখে আমি তোমার অনেক গল্পকথা শুনেছি, সেসব গল্প এখনও এ পাড়ার লোকের মুখেমুখে ঘোরে।

গঁড়া বুড়া উৎসাহিত হয়, কুষ্ঠে কুঁকড়ে যাওয়া আঙুলে কোনমতে দাপনা চুলকে বলে, সেসব দিনের কথা আমি আর ভাবতে চাইনে। কবে ঘি দিয়ে ভাত খেয়েছিলাম— এখন গন্ধ শুঁকলে পাব কোথায়? তবে বাদ্যযন্ত্র আমার জেবন ছিল, তাদের আমি ভালবাসতাম, বশে রাখতাম। তাদের যেমন আমি খেয়াল রাখতাম, তারাও আমার খেয়াল রাখতো। বাদ্যযন্ত্র আমাকে অনেক দিয়েছে, বিনিময়ে আমি তাদের কিছু দিতে পারিনি। তবে আমি শয়নে-স্বপনে ঢাক-ঢোল ছাড়া আর কিছু জানতাম না। তখন তোর বড়মা বেঁচেছিল। আমি মহাদেব-মন্ডপ বাজিয়ে ঘর এসেছি। বাপুত্তি জাইগীর জমিন ভোগ করছি তবু বাবুরা আমার ঢোলের বোল শুনে দেড় মণ আতপ চাল বকশিস দিল। সঙ্গে ফিনফিনে নতুন ধুতি আর গেঞ্জি। বোশেখ মাস এসে গিয়েছে, ঝাঁ-ঝা গরম। বাইরে এই তক্তাপোষে শুয়ে আছি। নিঃঝুম রাত। হঠাৎ কে এসে আমায় ডাকল, গঁড়া, বাজাতে যেতে হবে চল। আমি ধড়ফড়িয়ে উঠে বসলাম। ঢোলটা পেড়ে নিলাম চালাঘর থেকে। তারপর সেই বাবুর পেছন পেছন চলে গেলাম। বেশ কিছুক্ষণ যাওয়ার পরে বাবু বলল, বাজা গঁড়া, প্রাণ ভরে বাজা। এনারা সব তোর ঢোলের বোল শুনতে চায়। আমি নেশার ঘোরে শরীলের সব শক্তি দিয়ে ঢোলের গায়ে চাটি মারলাম। সে এক অদ্ভুত শব্দ! এমন সুমধুর আওয়াজ জীবনে আর কোনদিন শুনিনি। প্রায় ঘন্টা দেড়েক বাজানোর পরে যখন আমার গা দিয়ে দরদরিয়ে ঘাম ঝরছে, তখন হারু চৌকিদারের ডাকে আমার বাজনা থেমে গেল। তাকিয়ে দেখি আমি শ্মশান জমিতে দাঁড়িয়ে আছি, আমার কাঁধে ঝোলান ঢোল, ঢোলের তালা নরম হয়ে গেছে। হারু চৌকিদার আমাকে কি বলল জানিস? গঁড়াদা, এত রাত্রে তুমি কেন শ্মশানে ঢোল বাজাও? তোমার কি মহাদেব-মন্ডপ বাজিয়ে এসে মাথা খারাপ হয়ে গেল? তার সে প্রশ্নের কোন উত্তর আমি দিতে পারিনি, গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল ভয়ে। হারু চৌকিদার আর গাঁয়ের লোকজন আমাকে ঘর অব্দি দিয়ে গেল। তোর বড়মা বলল, সারাদিন ঢাক-ঢোল নিয়ে পাগল, তোমাকে নিশিতে ডেকে নিয়ে গেছিল শ্মশানে, আমার শাঁখা-সিঁদুরের ভাগ্য যে তোমাকে ঘুরোন পেলাম! গঁড়া বুড়া থামল, তারপর ঢোক গিলে নিয়ে মহিমের মুখের দিকে তাকাল, জানিস বাপ, এসব কথা এখন কেউ

আর বিশ্বাস করবে না, সবাই ভাববে স্বপ্ন নয়ত বুড়াটা গুলগাপ্পি দিচ্ছে। কিন্তু আমি মোটে মিছে কথা বলছি নে, যা বললাম তা চাঁদ-সূয্যির মতো সত্য। এই দেখ—এখনও কেমন আমার গায়ের-চেগে উঠেছে।

মহিম ঝুঁকে পড়ল গঁড়া বুড়ার বিছানায়, দু'চোখ ভরে দেখল অশীতিপর বৃদ্ধর যৌবনবেলার উচ্ছ্বাস। বিশ্বাস তার হয়েছে, কেন না এ গল্প সে বহুবার এ গাঁয়ের মানুষের মুখে শুনেছে। গঁড়া বুড়া এখন আর ঢাক-ঢোল বাজাতে পারে না, হাত ওঠে না, কুঁকড়ে গেছে কালব্যাধিতে। কার শাপে তার এমন হল—ভাবে মহিম, যে মানুষটা জীবনে কারোর কোনদিন অনিষ্ট করেনি, যে কিনা ছায়াপ্রদান করা পুরনো বটের মতো, শেষ বয়সে তার কেন হাত-পা কুঁকড়ে যায় কুষ্ঠে। অনেক আগে গঁড়া বুড়ার ঘরের অবস্থা ভাল ছিল, তখন মহাদেব-মন্ডপের দেবত্ব সম্পত্তি ভোগ করত সে। শুধু সে কেন বামুন, নাপিত, মালী সবাই বছর ভর ভোগ করত দেবত্ব-সম্পত্তি। বিনিময়ে তারা সেবা করত মহাদেব মন্ডপের। চৈত্র-সংক্রান্তির দিনে মহাদেব-মন্ডপে মেলা বসত গাজনের. শিবমন্দির প্রাঙ্গণ ভরে উঠত হাজার মানুষের কোলাহলে, নীল পুজোয় পাঠভক্তার সেবা, ধুনচিনাচ, বাণফোঁড়, ওড়াপাঠ সব জমে যেত—সব মনে হোত রূপকথা। মহিমের ছোটবেলার কথা মনে পড়ে, সে কিছু ভোলেনি, মায়ের হাত ধরে সে যেত মহাদেব-মণ্ডপে মেলা দেখতে, খেলনার জন্য বায়না ধরত সে, মায়ের কিনে দেবার সামর্থ নেই তাই ভিড়-ভাট্টায় লোকের চোখ ফাঁকি দিয়ে নির্দ্দিষ্ট খেলনাটা চুরি করে আনত মহিম। মা রাগারাগি করলে সে পালিয়ে যেত হাত ছাড়িয়ে নিয়ে, দূরে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলত, কিনে দিতে পার না যখন শাসন কর কেন? আমি তোমার অমন শাসন মানি নে। আঁচলে মুখ ঢেকে অক্ষমতায় কেঁদে উঠত তার মা, ছেলেকে বোঝাত পাপের পথে হাঁটিস নে বাপ। ও পথে শান্তি নেই। তোর বাপ কোনদিন কারোর খড়কুটো পর্যন্ত না বলে নেয় না, বাপ। সেই বাপের ছেলে হয়ে তুই চুরি-বিদ্যা শিখলি!

মায়ের আক্ষেপ এখন যেন হাতুড়ি পেটায় মহিমের অন্তঃস্থলে, যমুনার মধ্যে সে তার হারিয়ে যাওয়া মায়ের প্রতিচ্ছবি খুঁজে পেয়ে মরমে মরে যায়, বাস্তবিক সে এখন যমুনার কাছে দাঁড়াতে ভয় পায়।

নিমগাছের ডালে এই ভরদুপুরে কাক ডাকে কা-কা স্বরে, নিমের তেলতেলে পাতায় পিছলে যায় রোদ, সেই রোদ গায়ে মেখে সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মরা পুকুরের জলমাপা খুঁটি বাঁশ। বসে থাকতে থাকতে অধৈর্য হয়ে পড়েছিল মহিম, আজকের দিনটা তার বৃথা গেল—এই ভেবে আক্ষেপ ভাসাল হাওয়ায়। হেঁসেলঘর থেকে মুড়ি আর ছাঁচি পেঁয়াজ ছাড়িয়ে এনেছে যোগমায়া যে মানুষটাকে সে দেখতে পারে না, তাকেই উদ্দেশ্য করে বলে, ঠাকুরপো, সারাদিন মনে হয় কিছু জোটেনি। পেঁয়াজ দিয়ে মুড়িগুলো খেয়ে নাও। গা ধুয়ে এসো। আজ আমাদের এখানে দুটো খেয়ে যেও।

তা হয় না বৌদি, যমুনা ঘরে আমার জন্য বসে আছে। আমি না যাওয়া পর্যন্ত সে কিছু খাবে না।

তোমার বউভাগ্য ভাল। অমন বউ লাখে একটা পায় মানুষে।

সে তো ঠিক, কিন্তু—। তোতলাতে থাকে মহিম, নিজের অক্ষমতা ফুটে ওঠে ঠোঁটে, বউ তো ভাল কিন্তু তারে আমি খারাপ করে দিচ্ছি। অভাব মানুষের স্বভাব নষ্ট করে দেয়। কি করব, আমি যে আর কিছু করে উঠতে পারছি নে। যেদিকেই যাই শুকনো সাগর। কোনবিদ্যে জানিনে যে তা ভাঙিয়ে খাবো।

ধৈর্য হারিও না। উপরওয়ালা সব ঠিক করে দেবে।

আমার আর কারোর উপর বিশ্বাস নেই। আমি মনে করি আপনা হাত জগন্নাথ।

তখনই খড়ের চাল থেকে ঠিকরে পড়ল টিকটিকি, যোগমায়া অবাক হয়ে বলল, টিকটিকি ডানদিকে পড়া ভাগ্যের কথা। দেখ তোমার ভাগ্য ফিরলেও ফিরতে পারে। খরার সময় কোন মানুষেরই ভাল যায় না। মাটি ফাটলে মানুষেরও ভাগ্য ফাটে। সেই ফাটলে লুকিয়ে থাকে দুঃখের কেউটে সাপ। তাকে ডরলে চলবে না, রুখে দাঁড়াও। মহিমের মতো গঁড়া বুড়াও মন দিয়ে শুনছিল যোগমায়ার কথা, মনে ধরতেই সে তার বউমাকে উদ্দেশ্য করে বলল, তোমার কথাগুলোয় মরা মানুষও জ্যান্ত হয়ে যাবে এমন তাগদ আছে। আমার চোখ মানুষ চিনতে কোনদিন ভুল করে না। আমার বউমার রূপ যেমন আছে, গুণও কোন কম নেই। ওকে এক নজর দেখেই আমি ভেবেছিলাম—ছেলের বউ করে আনব। ওরা গরীব বলে সবাই মানা করল। সেদিন আমি কারোর কথা শুনিনি। ভরতের বউ করে ঘরে আনলাম। ও আসার পরে আমার ঘরের চেহারা বদলে গেল। বাউণ্ডুলে ভরতকে ও নিজের শাসনে রেখেছে। না হলে ছেলেটা আমার ভেসে যেত। কথাগুলো শেষ করে স্মৃতির সমুদ্রে তলিয়ে গেল গঁড়া বুড়া, মহিমকে শুনিয়ে সে বলল, এই বউমার জন্য আমি এখনও বেঁচে আছি নাহলে কবে মরে-পচে সার হয়ে যেতাম। আমার যখন রোগটা ধরা পড়ল তখন পাড়া-পড়শী সবাই জানতে পেরে ছিঃ-ছিঃ করে উঠল, কেউ বলল, বুড়াকে ভাগিয়ে দে ঘর থিকে, বুড়া মানুষ আর বুড়া গোরুর কুনো দাম নেই। আমার ভরতকে সবাই বলল, তোর বাপের কুঠ হয়েছে, ওরে গাঁয়ের শেষ মুড়োয় কুঁড়েঘর বানিয়ে রেখে আয়। চাপের মুখে ভরত টলে গেলেও আমার এই বউমা কিন্তু টলেনি। সেদিন শিনা ফুলিয়ে বলেছিল, বাপ আমাদের সাথে থাকবে। কোন্ মানুষটার না রোগজ্বালা হয়? রোগজ্বালা হলে কি তারে ফেলে দিতে হয় মরা-কুকুর ছাগলের মতো। তা বাপ, এই বউমার মুখের জোরে আমার সেদিন ঠাঁই হল ঘরে। পাড়া-পড়শী সব এক ঘরে করে দিলেও আমার বউমা মনের জোর হারায়নি। ও আমার সাক্ষাৎ মা-জননী গো। ওর ভাল বই কোনদিন খারাপ হবে না। মহিমের এসব ঘটনা কম বেশি জানা তবু পুনরাবৃত্তিতে স্মৃতি ঝালিয়ে নেয় সে, শ্রদ্ধার চোখে যোগমায়ার দিকে তাকায়, ভাবে—মানুষ দেবত্ব শক্তি পায় নিজের কর্মের গুণে, সততা এবং মনের জোরে। এ গুলোর কোনটাই মহিমের নেই যা বারবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যমুনা।

পুকুরের হ্দী সরিয়ে ডুব দিয়ে পাড়ে উঠে এসেছে ভরত, তার পাতলা ধুতির চোয়ান জল গোড়ালী ছুঁয়ে ভিজিয়ে দেয় তাতা মাটি, ভুসভুস করে ধোঁয়া ওঠার মতো বাষ্প ওঠে বাতাসে, মাটির অদ্ভুত ঘ্রাণ নিমেষে ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে, ভরতের এসবের ভ্রূক্ষেপ নেই, তার কালো দাপনা, পেছনের মাংস ফুটে উঠেছে ধুতি ফুঁড়ে,

গাছের ছালের মতো আটকে গেছে ধুতি কোমরের নিম্নাঙ্গে তবু সে হাতজোড় করে মনসাতলায় দাঁড়ায়, বিড়বিড় করে বলে, রক্ষা করো মা, এই দুর্দিনে টাকা-পয়সা দিয়ে সনসারটা বাঁচাও। আমি আর পারছি নে মা মনসা, গাঁ ঘুরে ঘুরে আমার পায়ের গোড়ালী ক্ষয়ে গেল। আমার পানে এট্টু চাও মা—।

স্নানের পরে রোজ মনসাগাছের সামনে দাঁড়ায় ভরত, এটা তার অনেক দিনের অভ্যাস, অন্তত যোগমায়া তাই দেখে আসছে বিয়ের পর থেকে। মনের ইচ্ছে মনসা মায়ের কাছে জানিয়ে ভরত দৃষ্টি ফেরাল পাশের বিচিকলা ঝাড়টার দিকে। ঢ্যাঙ্গা লম্বা স্বাস্থ্যবান কলাগাছগুলো যেন আকাশ ছুঁতে চায়, ওদের শুধু শরীর-স্বাস্থ্য আছে কিন্তু কোন কাজের কাজে লাগে না। গাঁ-ঘরে বিচিকলার কদর নেই, পাকালেও তেমন সুয়াদ নেই, তরকারীতে কলার বিচিগুলো ড্যামাড্যামা চোখ করে তাকিয়ে থাকে, ঝাল মশলার ঝোলে জল কেটে বরবাদ করে দেয় একেবারে। অতো নির্গুণ তবু পুকুরয়াড়িতে সখ করে বিচিকলার গাছ লাগিয়েছে ভরত, কেননা এর ফলন বেশি, লম্বা কাঁদি এবং ঝামেলা কম। একবার লাগিয়ে দিলেই বেড়া কলমীর গাছের পরমায়ু, খরা-বন্যায়ও মরে না। ভরতের সংসারী চোখ দেখল—একটা বড় কাঁদি সবুজভাব ছেড়ে হলুদ মেখেছে গায়ে, এর অর্থ পাকার সময় হয়েছে, এবার গাছ কেটে লুটিয়ে দাও মাটিতে, থোড় আর কলা দুটোই খাওয়া যাবে অভাবের দিনে।

মহিম ক্রমশ হারিয়ে ফেলছিল ধৈর্য, মনে মনে ভাবছিল—যমুনা নিশ্চয় পুকুরধার থেকে কলমীশাক খুঁটে এনেছে কোঁচড় ভর্তি করে। শুকনো মাছ কুঁচো আলুর চচ্চড়ি ভাল রাঁধতে পারে যমুনা, ওর হাতের রান্নায় বুঝি আলাদা একটা কৌশল লুকানো আছে, যা এপাড়ার কোনো বউ-এর রান্নার সাথে মেলে না। একটা দোয়েল পাখি বাহারী শরীর নিয়ে গলা কাঁপিয়ে শিস দিচ্ছিল বেড়ায় বসে, দিনের আলোয় পাখিটাকে ভয়ানক সুন্দর দেখায় মহিমের চোখে, এক অদ্ভুত আবেশ তার চোখে-মুখে ছড়িয়ে পড়ে শীতের দিনে তেলমাখার মতো। যোগমায়া সব কিছু লক্ষ্য করেছে, সে বলল, ঠাকুরপো, বাবা ছাড়া আমাদের সন্‌সারে আর কিছু নেই। সীতারাম বুড়ারও কুষ্ঠ হয়েছিল একথা তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে। তার জন্য গোবরধন চালাঘর বেঁধে দিয়েছিল ধানমাঠের শেষে। বুড়াটা সেই চালাঘরে একা থাকত, সঙ্গে তার নেড়ি কুত্তা। গোবরধনদার বউ রানী যেত রোজ বুড়ার জন্য খাবার নিয়ে। এভাবেই চলছিল। একদিন সকালবেলায় রানী জলখাবার পৌঁছাতে গিয়ে দেখল সব শেষ। মানুষটা মরে কাঠ হয়ে পড়ে আছে, তার মুখের ভেতর, কানের ছিদ্র থেকে বেরিয়ে আসছে পিঁপড়ে। রানী কাঁদতে কাঁদতে গাঁয়ে এসে খবর দিল। সেদিন রানীর সাথে আমিও গিয়েছিলাম ধানমাঠে। জানো, ঠাকুরপো, সীতারাম বুড়া মরার সময় তার ছেলের হাতে জল পায়নি। গোবরধনদা এই আক্ষেপে কপাল চাপড়ে কাঁদছিল। তার সেই কান্না আজও আমার চোখে ভাসে। সেই কান্নাই আমাকে জেদী করে তুলেছে দিনকে দিন। একটু থেমে যোগমায়া বলল, বাপ কারোর চিরদিন থাকে না। মানুষের জীবন হল পদ্মপাতার জল। মরতে সবাইকে একদিন হবেই। তবে বাবা আমাদের সামনে মরুক এ আমি চাই। গোবরধনদার বাবাকে পোঁতার জন্য সেদিন কেউ যায়নি। তোমার দাদাও ভয় পাচ্ছিল। আমি ওকে জোর করে পাঠালাম। ফিরে এসে সেকি বলল জানো—গিয়ে

ভাল করেছি। জীবনে তো পুণ্য করতে পারিনি, আজ সীতারাম খুড়াকে কবর দিয়ে কিছুটা পুণ্য কামিয়ে এলাম। তবে ভয়ও করছে। শুনেছি—কুষ্ঠ বড় খারাপ রোগ। হাওয়া লাগলে নাকি হাত-পায়ের আঙুল বেঁকে যায়। আমি তোমার দাদার ভুল ভেঙে দিয়েছি। মহিম হা করে শুনছিল যোগমায়ার কথা, তার চোখের ভেতর নড়ে উঠছিল ফুটন্ত ভাতের সচল শরীর।

॥ তিন ॥

পানিপারুলে খবর পাঠিয়েছিল ভরত। চামড়ার মহাজন বলেছে শনিবার ছাড়া তার সময় হবে না, এখন চারদিকে এত গোরু-ছাগল মরছে—একা ঠিক সামাল দিতে পারছে না আব্দুল।

দুপুরে গাঁ ঘুরে এসে ভরত সুদামকে বলল, তোর বয়সে আমরা বাপের কাঁধ হালকা করার চেষ্টা করতাম, তোর দেখছি কোন কিছুতেই গা নেই। এভাবে বসে খেলে সাগরের জলও একদিন শুকিয়ে যাবে।

সুদাম বাপের কথায় কান দেয় না, ভরত বেশি বকাঝকা করলে গাঁ ছেড়ে চলে যায় আত্মীয়ঘর, দু-চারদিন কাটিয়ে রাগ কমলে ঘরে ফিরে আসে। গাঁ-ঘরে এই ঘরানীতে কাজের কোন দেখা নেই। এখন কাজ বলতে শুধু একটা। ডোবা-নালার জল শুকালে সেখানে দাপিয়ে-লাফিয়ে মাছধরা। মাছ ধরেই বা হবে কি? ভাবল সুদাম। ঘরে তেল বাড়ন্ত, আর তাছাড়া যোগমায়া চুনোচাঁদা মাছ ধৈর্য নিয়ে বাছতে পারে না, তার চোখ টনটনায়, মাথা ধরে যায়।

ভরত যাকে একবার ধরে তাকে সহজে ছাড়ে না, সুদামও রক্ষা পেল না তার বাপের কথার কামড় থেকে। ভরত চোখ রাঙিয়ে বলল, আমি যা বলছি, কথা বুঝি কানে ঢুকছে না। আমি চোখ বুজলে তোর যে কী দশা হবে বুঝে পাই না। গতর না খাটালে তোর দুঃখে শেয়াল-কুকুর কাঁদবে।

এবার আঁতে ঘা লাগল সুদামের, পিত্তি চটকে যাবার যন্ত্রণায় সে একবার শূণ্য খলাবাহিরের দিকে তাকাল, পাতলা পাঁপড়ের মতো চটা উঠছে মাটির, তার মধ্যে ঘুরঘুর করছে পিঁপড়ের দল। সুদামের মনে হল পিঁপড়েগুলো বুঝি উঠোনে নয় তার ফাঁকা শরীরে কিলবিল করে হাঁটছে। দাঁতে দাঁত চেপে সে এবার কঠিন চোখে ভরতের দিকে তাকাল, আত্মসম্মানে ঘা দিয়ে কথা বললে সে কাউকে ছেড়ে কথা বলবে না। সুদাম কিছু বলার আগেই ভরত বলল, জাত-ব্যবসায় যদি মন না থাকে তাহলে অন্য কোন ব্যবসা কর। আমি নগদ টাকা দিতে পারব না, সব কিছু তোকে যোগাড় করতে হবে। সুদাম ঘাড়ে-গর্দানের ঘাম মুছল শান্তভাবে, ব্যবসা-ট্যাবসা আমার দ্বারা হবে না। সব কাজ কি সবার দ্বারা হয়? আমাকে তুমি খরচের খাতায় রেখে দাও। তুমি যা পারো, তা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

সে আমি জানি, আর জানি বলেই তো বলছি সময় থাকতে সাবধান হ। সুদামের মুখে কোন ভাষা নেই, সে মায়ের কাছে পালিয়ে গিয়ে বাঁচতে চাইল, কিন্তু তাকে

ছাড়ল না ভরত, খোঁচা মেরে বলল, গায়ের চামড়া তোর গণ্ডারের চামড়া হয়ে গিয়েছে। যদি মানুষের চামড়া গায়ে থাকে তাহলে মন দিয়ে শুন। আসছে গুরুবার মাইতিদের বড় ছুয়ার বে-ঘর আছে। কুঞ্জ বলছিল—পরীযান নিয়ে যাবে দীঘায়। বর মোটর গাড়িতে চেপে যাবে না, ওদের ঘরে রীতি অনুযায়ী বর যাবে পরীযান-এ চেপে। ভারী দরকার। তুই যদি যাস তো আমি বলে দেবো। ওরা ভাল টাকা দেবে।

আমি বইব পরীযান? আকাশ থেকে পড়ল সুদাম, এই শরীলে পাঁচ সের ভার বইতে হাঁপিয়ে উঠি, পরীযান-এর ভার আমি সইব কীভাবে? তাছাড়া পথ অনেক। আমার দ্বারা ওসব কাজ হবে না।

হবে না সে আমি জানতাম। তাচ্ছিল্যের ঢেউ খেলে গেল ভরতের কালচে ঠোঁটে, গলার শুয়োর-হাড়ের তাবিজ নেড়ে সে বলল, না পারলে সে-আমার অদৃষ্ট! কুঞ্জকে আমি কথা দিয়ে দিয়েছি ভারী ঠিক করে দেব। ঠিক আছে তুই না গেলে আমাকে সেখানে যেতে হবে। কথা দিয়ে তো কথার খেলাপ করতে পারি না। আমি তিন-চারদিন থাকব না, গাঁ ঘোরার দায়টা তোকে নিতেই হবে।

এবারও না সূচক ঘাড় নাড়ল সুদাম। গরম তেলে জল পড়ার মত রাগে চড়বড়িয়ে উঠল ভরত, এই সামান্য কাজটাও তুই পারবি না তাহলে কি পারবি তুই নিজের মুখে খোলসা করে বল?

গাঁ-ঘোরা তো ভিক্ষে করার সমান।

সুদামের কথাগুলো বড্ড গায়ে লাগল ভরতের, রাগের ঘোরে ঘামে পেছল হয়ে উঠল তার গা-গতর, ঘনঘন দম নিয়ে সে বলল, তোর চোদ্দগুষ্টি এই কাজ করে মরেছে। এই কাজ তারা করতে পারলে নিজেদের ধন্য মনে করত।

সে যুগ আর নেই। এখন যুগ বদলেছে—

যুগ বদলালেও রীতিনীতি তো মরে যায় নি।

আজ না যাক, দু দিন পরে এসব গাঁ-ঘোরা নিয়ম চলে যাবে। মানুষ তখন অন্যভাবে বাঁচবে।

শান্ত দুপুর তেতে উঠছিল কথায় কথায়, এখনই বাইরে সাইকেলের ঘন্টি শুনতে পেল ভরত। মুখ বাড়িয়ে সে দেখল চামড়ার মহাজন নাসিম এসে দাঁড়িয়েছে তার আগড়ের ধারে। মার্ড-গার্ড খোলা সাইকেলটা বেড়ায় হেলান দিয়ে নাসিম উঁচু গলায় ডাকল, দাদা, আছো নাকি গো?

ভরত ঘরের ছায়া ফেলে বেরিয়ে এল বাইরে, চোখ রগড়ে নিয়ে বলল, তোমার পথ চেয়ে-চেয়ে চোখ আমার শুকিয়ে গেল নাসিম ভাই। মহিমকে বার দুয়েক পাঠিয়েছি তোমার বস্তিতে। সে এসে সব খবর দিয়েছে। আসলে তাড়া কেন জানো? পুরনো মাল পচে যাবার ভয় আছে। আমরা গরীব মানুষ, চাম পচে গেলে দাম পাব না, আর দাম না পেলে খাবো কি! তা এসেছ, ভাল করেছ। বসো, একটু জিরিয়ে নাও।

সে বসছি, তা তোমার খবর কি ভরতদা? তোমার বাপ কেমন আছে? নাসিম চুরুক দাড়িতে হাতবুলিয়ে ছোট তক্তাপোষের দিকে তাকাল। টানা দাওয়ার এক কোণে পড়ে আছে গঁড়া বুড়া, যেন এক তাল মাংস, কোন নড়চড় বা প্রতিক্রিয়া নেই।

অথচ আগে এই মানুষটা ছিল প্রাণোচ্ছল, বন্যার ঢেউয়ের মত। বয়স বুঝি শরীরের জোশ সব নিংড়ে নেয়। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ভরত বলল, বাপের কথা বাদ দাও। তাকে নিয়ে আমার আর চিন্তার শেষ নেই। যদি কিছু বিপদ ঘটে যায় এই ভয়ে দূরে কোথাও কাজে যেতে পারি না। মনটা সব সময় ঘরেই পড়ে থাকে।

সে তো হাজার কথার এক কথা। চিন্তা তো হবেই—

ভরত জল দেওয়ার কথা যোগমায়াকে বলে ঘরের পেছনে চলে গেল চাম আনতে। লোকটা কাজ পাগল! এই ভেবে হাসল নাসিম। পানিপারুল থেকে চোরপালিয়া টানা সাইকেল চালিয়ে তার গা গতরে বেদনা, কোমরের পাশটা, মালাইচাকি শুলোয়, তবু এসব শারীরিক বাধা বিঘ্নকে অগ্রাহ্য করে তাকে আসতে হয় চামড়া কেনার নেশায়। এটা তার বংশগত ব্যবসা, এই ব্যবসা করে সে টালির ঘর তুলেছে বস্তিতে, ঘরে রেডিও বাজে সাঁঝের বেলায়, দু মেয়ের বিয়ে দিয়েছে ধূমধাম সহকারে। তার বাপ আব্দুল আসত গঁড়ার কাছে, দু'-জনে প্রায়ই সমবয়েসী, এলে আর কথা ফুরোত না, তেঁতুলতলায় মুখোমুখি বসে বিড়ি ফুঁকত হরদম, হা-হা গলা ফাড়িয়ে হাসত আর গঁড়াকে আব্দার করে বলত, ব্যবসার কথা ছাড়ো, আজ দুপুরে দুটো পাত পেড়ে খেয়ে যাব, ভাবীরে বলো মুরগার ঝোল রাঁধতে। বাবার মতো উদার মন পেয়েছে নাসিম, টাকাকে সে টাকা বলে জ্ঞান করে না, উঁচু গলায় সে বলে, রূপিয়া তো হাতের ময়লা, ওর কথা ছাড়ো। দিল খুশ্ তো দুনিয়া খুশ্। মুখের হাসিটা যেন সংসারের চাপে পড়ে বিষিয়ে না যায় ভরতদাদা। আল্লা দুখ দিয়েছে, হাসিও আমাদের কম দেয় নি।

সুদাম যখন ছোট তখন থেকে এ বাড়িতে নাসিম মোল্লার যাতায়াত। মানুষটা এলে সুখের হাওয়া বয়ে যায় এই দীর্ন সংসারে, এমন কী যোগমায়াও তৎপর হয়ে ওঠে খাতির-যত্ন করার জন্য। যোগমায়াকে সে বহিন বলে ডাকে। সুদাম সেই সুবাদে তার ভাগ্নে।

নাসিম হাতের ইশারায় সুদামকে কাছে ডেকে বলে, কি মামু, কেমন চলছে তোমার? পানিপারুল গেলে আমার দুয়ারে যেও, মুরগা জবাই করে খাওয়াব। নাসিমের ঢোলা পাঞ্জাবীর ভেতর হাওয়া ঢুকে পতপত করে নড়ছে সাদা কাপড়, তার কাপড়ের টুপি মাথায় দেওয়া চেহারায় পীর-ফকিরের আদল। সুর্মা পরা টানা চোখে স্নেহ-মমতা ছড়ানো। চোয়াল বসা লম্বাটে শরীরে তাকে কসাইয়ের মতো দেখায় না, বরং মনে হয় সে বুঝি বড় আপনজন। ছোটবেলায় নাসিম চাচা এলে সুদামের মন খুশিতে ভরে উঠত, সাইকেলে ওঠার আগে সে তার হাতে ধরিয়ে দিতে নিদেনপক্ষে এক টাকা, পান চিবানো ঠোঁট নাড়িয়ে বলত, লেবেন চুস কিনে খাবে। মীরা কোথায়? তাকে এই টাকাটা আমার হয়ে দিয়ে দিও। তোমার বোন ভারি মিষ্টি মেয়ে গো, ওকে দেখলে আমার আদর করতে মন চায়। অথচ আল্লার কী বিচার, ফুলের মতো মেয়েটাই মাথার গন্ডগোল নিয়ে ঘুরছে।

মীরাকে নিয়ে নাসিমের কোন চিন্তার শেষ ছিল না, সে প্রায়ই বলত, ভরতদাদা,

মেয়েটাকে নিয়ে আমার সাথে চলো পীরবাবার দরগায়। ওখানে ঘোড়া বেঁধে মানত করব। ওর মাথা ঠিক হয়ে গেলে শিন্নি দেব। নাসিমের জেরাজুরিতে ভরত গিয়েছিল মীরাকে নিয়ে পীরবাবার দরগায়। যাওয়া-আসার সব খরচ তার, এমন কী এগরা হোটেলে সে মাংস-ভাত খাওয়াল। বড় দোকান থেকে মীরাকে কিনে দিয়েছিল ফুল ছাপা ফ্রক, মীরার হাতে চিকচিকি কাগজে মোড়ান ফ্রকটা ধরিয়ে দিয়ে বলেছিল, এ জামাটা পরলে বিটিকে একেবারে প্রজাপতির মতো দেখাবে!

ঘরের পেছনের চালে পাট করে বাঁধা আছে কাঁচা চামড়া। হাওয়া দিলে দুর্গন্ধ ছোটে এদিক-সেদিক। চাম ঝুলিয়ে না রাখলে রাত-বেরাতে ক্ষামি করে দেবে শ্যাল-কুকুরে। চামড়ার গন্ধে এ ঘরের পেছনে কতবার যে শেয়াল এসে উৎপাত করে গেছে—তার কোন গোণাগুণতি নেই। যোগমায়া শেয়ালকে ভীষণ ভয় পায়, ওদের গায়ের বোট্‌কা গন্ধটা তার সহ্য হয় না। গাঁয়ে শেয়াল এলে পাড়ার কুকুরগুলো ঝগড়া ভুলে ঝাঁপিয়ে পড়ে এক সঙ্গে, গাঁয়ের শেষ সীমানা পার করে তারা দম নেয়, আর ওই অত রাতে চামড়া ক্ষুয়ানোর আশঙ্কায় ঘরের ভেতর বিড়বিড়িয়ে ওঠে ভরত, নাসিম ভাই আসছে না, দেখো অত কষ্টের চামগুলো শেয়ালে ঠিক নিয়ে পালাবে। কাল থেকে আমি বাইরে শোব।

যোগমায়া ওদলা বুকে কাপড় বিছিয়ে হাঁ করে চেয়ে থাকে ভরতের দিকে, চাম-চাম করে তুমি কি পাগল হলে? চাম বড় না মানুষ বড়? আমি কিছু বুঝতে পারি নে!

পাটকরা সাতটা চামড়া ভরত ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে যায় নির্জন পুকুর পাড়ে, নাসিমকে বলে—আসো ভাই, দেখে-শুনে নাও। এবারে চামগুলোয় কোন খুঁত নেই, খাল আমি মন দিয়ে ছাড়িয়েছি। ভাঁজ খুলে কাঁচা চামড়া সাটপাট মেলে ধরে ভরত, পুকুরপাড়ে চামড়া বিছিয়ে সে স্বপ্ন দেখে টাকার। সুদাম এখন আর নাসিমের পেছন-পেছন যায় না, সে বড় হয়েছে, সঙ্কোচ-লজ্জা তাকে পুকুরপাড়ে যেতে দেয় না। সে না গেলেও কাক উড়ে যায় দলে-দলে, অর্জুন গাছের ডালে বসে তারা গলা ফাড়িয়ে ডাকে, দুপুরের ধ্যান-মগ্ন ভাবটা চটকে যায় সেই কাকের চিৎকারে। বিরক্ত ভরত চিল্‌লে ওঠে, ঢিল তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারে বেয়াড়া কাকগুলোর দিকে। নাসিম তাকে থামায়, কাকের কাজ কাক করছে, তোমার রাগ কিসের ভরতদাদা? ওরা তো ডালে বসে আছে, বসতে দাও। কাক-কুকুরকে না ভালবাসলে কাঁচা চামড়ার ব্যবসা হবে না।

ভরতের হাতের ঢিল অর্জুন গাছের ডালে ঠোক্কর খেয়ে ঠিকরে পড়ে পুকুরের জলে, ছোট ঢেউটা ক্রমশ ছড়িয়ে যেতে থাকে কিনারায়, আর ঢিল পড়ার শব্দে এক ঠেঙে বক উড়ে পালায় কাঁটা বাঁশঝাড়ে। বকের কক্ক কক্ক কর্কশ চেরা ডাকে জেগে ওঠে দুপুরের পাড়া। পুকুরপাড়ের মরা-মরা ঘাসের উপর দাঁড়িয়ে দরদাম হয় চামড়ার, ভরত কুঁই কুঁই করে বলে, এবারের চামগুলো তুমি সস্তায় নিয়ে নিলে নাসিমভাই। যা কথা হয়েছে তাই থাকুক, আর বিশটা টাকা ধরে দিও। দিনকাল খারাপ, সন্‌সার আর চলছে না।

সে হবেখন, বিড়ি দাও আগে। নাসিম হাত বাড়িয়ে দেয় বিড়ির জন্য। বার্লির ডিবা খুলে বিড়ি বের করে ভরত, এই ডিবাটা তার ছায়াসঙ্গী, এখানে বিড়ি রাখলে নেতিয়ে বা সেঁতিয়ে যাবার কোন সুযোগ নেই। আগে বিড়ির বান্ডিলের সঙ্গে চকমকি পাথর আর শোলার টুকরো রাখত গঁড়া, এখন সেসব ঝামেলা মিটে গিয়ে একেবারে বারুদ বোঝাই ম্যাচিস বাক্স সঙ্গে রাখে ভরত, এতে সুবিধা অনেক, ফস্ করে বারুদে বারুদ ঘসে জ্বালানো যায় টাটকা আগুন। সময় লাগে কম। সময় পাল্টে দেয় সময়ের রূপরেখা।

সাইকেলের ক্যারিয়ারে চাম বেঁধে নাসিম চলে যায় পাকা রাস্তায়, গাছের আড়ালে শীর্ণ শরীরটা আর চোখে পড়ে না। আগড়ের কাছে ঠায় দাঁড়িয়ে টাকার ওমে নিজেকে সেঁকতে থাকে ভরত। খাওয়া-দাওয়ার পাঠ চুকলে তাকে একবার যেতে হবে কুঞ্জর ঘরে, সুদাম ভারীর কাজে গেল না বলেই সে যে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে এমন শিক্ষা গঁড়া তাকে কোনদিন দেয়নি। জীবনে সুযোগ বারবার আসে না। মা লক্ষ্মী যখন নিজে এসে ধরা দিচ্ছে তখন তাকে অনাদর ফিরিয়ে দেওয়া উচিত নয়। ভরত মনে করার চেষ্টা করে যোগমায়ার কথাগুলো। লক্ষ্মী পেঁচা বেশ ক'দিন ধরে ঘরের ভেতরে আসছে, কোথা থেকে উড়ে এসে পেঁচাটা ঘরটাকে তার নিজের নিরাপদ আস্থানা বানিয়ে ফেলেছে। যোগমায়ার নীচু গলার কথাগুলো প্রথমে বিশ্বাস করেনি ভরত, শেষে যোগমায়া তার কথার সত্যতা যাচাই করার জন্য বলল, বড় ঘরে চল। লক্ষ্মী পেঁচা যে এসেছিল তার প্রমাণ আমি তোমাকে দিয়ে দেব। মাটির বড় ঘরটায় আলো-বাতাস ঢোকে না, দিনের বেলায় চাপ-চাপ অন্ধকার শুয়ে থাকে, ঘরের ভেতর ধানের গোলা আছে একটা, আমন ধান উঠলে গোলায় ধান ভরে রাখে ভরত, এমনটা চলে আসছে বহু বছর আগে থেকে। এখন দুর্দিনে গোলা ফাঁকা, ধান গোলার ভেতর ঘনঘোর আঁধার। আলো না জ্বাললে কিছুই দেখা যায় না ঘরের, জানলা নেই যার জন্য এই দুরাবস্থা। যোগমায়া ভরতকে জোর করে নিয়ে গিয়েছিল বড় ঘরে, তার হাতে পেতলের শিস বাড়ানো লম্ফ স্থির হয়ে জ্বলছিল ঘরের ভেতর। যোগমায়া লম্ফো নামিয়ে উবু হয়ে দেখাল পেঁচার বিষ্ঠা, সাদা পালক আর অচেনা এক সুগন্ধ। ভরত লক্ষ্মী-পেঁচার একটা পালক তুলে নিয়ে গভীর-নিবিড় চোখে দেখল, নিজের চোখকে তার যেন বিশ্বাস হল না, এক অপ্রত্যাশিত সুখের স্বপ্নের ভেতর সে তলিয়ে যেতে লাগল, দেখতে পেল সুখের আলো, হঠাৎ লম্ফো নিভিয়ে সে যোগমায়াকে টেনে আনল নিজের কাছে, বউয়ের ওদলা বুকে মাথা গুঁজে সে যেন লক্ষ্মী পেঁচার সুগন্ধটা বুক ভরে নিতে চাইল। প্রগাঢ় অন্ধকারে দু'বাহু মেলে যোগমায়া নিমেষে হয়ে গেল সুখের প্রতীক, সমৃদ্ধির দূত লক্ষ্মী পেঁচা।

মায়ের মুখে গল্প শুনেছে ভরত লক্ষ্মী পেঁচা যে ঘরে একবার আশ্রয় নেবে সে ঘরের ভাঙা হাটের চাঁদের আলোয় উথলে পড়বে সুখ, ঝগড়া অশান্তি মনোমালিন্য পালাবার পথ পাবে না। মায়ের কথাগুলো ঘুরে ফিরে মনে আসে ভরতের, মা যেন তার সামনে এসে দাঁড়ায় যোগমায়ার রূপ ধরে। সে বছর ধানের ফলন ভাল হল

না, পোকায় কেটে দিল সব ধান, যেটুকু বাঁচল তা-ও আবার চিটে ধরা, সেই আকালের দিনে শুধু অভাব নয়, শীতও নামল জব্বর, সঙ্গে টানা চারদিন ধরে বৃষ্টি। সমুদ্রধার থেকে উড়ে এল উত্তুরে হাওয়া, কনকনে শীতে মানুষ ঘরের বাইরে বেরতে সাহস করে না এমন দুঃসহ শীতের দিনে গোরু-ছাগল বাঁচে কি করে? রোগ এসে চেপে বসল গবাদিপশুর শরীরে, শত চেষ্টা করে গৃহস্থজন বাঁচাতে পারল না গোরু-ছাগলের জীবন। ভাগাড় ভরে গেছে মরা গোরু ছাগলে, গলাফুলো ব্যামোর তখন কোন ওষুধ বেরয়নি ফলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল দশাসই গোরুগুলো। সে বছর চামড়া-ছাড়িয়ে হাত এলে গিয়েছিল গঁড়া এবং ভরতের, সুদাম তখন সবে ছয়-সাত বছরে অবোধ বালক, সেও বাপ-দাদুর সঙ্গে ভাগাড়ে যেত তুমুল উৎসাহে লাঠি হাতে। ছোট্ট সুদাম লাঠি হাতে পাহারা দিত ভাগাড়, কাক তাড়াত কিন্তু শকুন খেদাতে গেলেই ভয়ে এতটুকু হয়ে যেত তার মুখমন্ডল, তবু লাঠি হাতে সে চিৎকার করত, যা, যা, পালা। বলেই নিষ্ফল আক্রোশে লাঠির বাড়ি মারত ভাগাড়ে ঘাস-মাটিতে, তার এই চেষ্টা দেখে গঁড়া রগড় করে বলত, ভরত রে, তোর ছেলেটা ভাগাড়-ওস্তাদ হবে। আমি তো বাজনা-মাস্টার, তোর ছেলে ভাগাড়-মাস্টার হয়ে আমার মুখ রাখবে।

সাতটা-আটটা গোরুর ছাল ছাড়িয়ে হাঁপিয়ে উঠত ভরত, ভাগাড় সংলগ্ন পুকুরের জল খেয়ে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ত আর স্বপ্ন দেখত কাড়ি কাড়ি অর্থ উপার্জনের। গঁড়া ছেলের মনোভাব ঠাওর করতে পেরে বলত, টাকা টাকা করলে ফাঁকা জীবন কোনদিন ভরাট হবে না। বৃষ্টি না হলে যেমন পুকুর ভরে না তেমনি উপরওয়ালার দয়া না হলে টাকা কেন এট্টা ফুটা কড়িও তুই পাবি না। যার যতটুকু পাওনা সে তো লিখে রেখেছে সব। টাকা টাকা করে কপাল চাপড়ালে কপাল ফুলবে কিন্তু টাকা আসবে না।

গঁড়ার কথাগুলো যে কত সত্যি জীবনের প্রতিটা মুহূর্তে টের পায় ভরত। তখন চাম কিনতে আসত নাসিমের বাপ আব্দুল। পরনে চেক লুঙি, মাথায় সাদা টুপি, খালি পা, বুকের হাড় জাগানো শরীর, জর্দা—পান চিবিয়ে নরম গলায় বলত, আল্লা অবলা জীবগুলো তুলে নিচ্ছে কার পাপে কে জানে। এত খাল আমার দরকার ছিল না, আমার দু'একটা হলে সন্সার চলে যেত, এত জীবের মরণ আমার সহ্য হয় না।

দয়ায় ভরপুর ছিল আব্দুলের শরীর, পরের দুঃখে তার মন কাঁদত, হর শুক্রবার মসজিদে নামাজ না পড়ে সে জল পর্যন্ত ছুঁতো না। তখন পানিপারুল থেকে চামড়া বোঝাই হয়ে গোরুর গাড়ি যেত এগরা পর্যন্ত। সেখান থেকে ট্রাকে করে মাল বোঝাই হয়ে চলে যেত কলকাতায়। তারও আগে কাঁচা চামড়া যেত পালতোলা নৌকায় বোঝাই হয়ে জলপথে কলকাতায়। সময় লাগত বেশি, চাম পচে গিয়ে নষ্ট হোত কারবার। দিন বদলের সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেছে পরিবহন মাধ্যম, শুধু পরিবহন নয়—বদলে গেছে মানুষের ব্যবসা করার মনোভাব। সে বছর দু'হাতে টাকা কামিয়েছিল গঁড়া এবং ভরত, তখন পাড়ায় প্রায়ই দিনই মরা ছাগলের মাংস হোত ঘরে ঘরে। ভরত

ভাগাড় থেকে তুলে আনত মরা খাসী বা ধাড়ী ছাগল। চারা তেঁতুলগাছে টাঙিয়ে যত্ন করে খাল ছাড়াত মহিমের বাবা। নকুলের বাপও আসত, হাত লাগত মাংস কাটায়, ভাগ বাটোয়ারায়। বিনামূল্যে বা সামান্য মূল্যে বিতরণ হোত ছাগলের মাংস। ক'ঘর মানুষ খেয়ে বাঁচত, রুচি বদলাত মুখের।

টাকা গুনতে বসলে ভরত যেন অন্যমানুষ, একবার নয়—বারবার করে সে গুনতে থাকে টাকা, গুনতে ভাল লাগে—এটা তার নেশা বা বদ-অভ্যাস। যোগমায়ার এসব আদিখ্যেতা পছন্দ নয়, বেলা বাড়ছে দেখে সে বিরক্তি সহকারে বলল, তুমি এমন ভাব করছো যে জীবনে কোনদিন টাকা দেখো নি! এত টাকা-টাকা করে কি হবে বলতো? তুমি কি চেষ্টা করলে জীবনে কোনদিন রাজা হতে পারবে? ভাগ্যে যা আছে তাই নিয়ে খুশি থাকো দেখবে টাকার খিদে কমে গিয়ে সব সমস্যা মিটে গেছে। কড়া গলায় কথাগুলো বলে যোগমায়া একটু ভাবল, মুহূর্তে প্রসঙ্গ বদলে নিয়ে সে বলল, বাবার দিকে এট্টু নজর দাও। ক'দিন থেকে দেখছি হাতে পায়ে ভীষণ রস কাটছে। কাপড়ের কানি সব ভিজে যাচ্ছে রক্ত-পুঁজে। ওগুলো কেচে কেচে আমার ঘেন্না ধরে গেল, খেতে বসলে ঘেন্নায় আমি খেতে পারিনে।

তোমার কষ্ট হচ্ছে বুঝলাম কিন্তু আমি কী করব? অসহায় চোখে তাকাল ভরত। সে যেন গঁড়াকে দেখতে পেল সামনা সামনি। ঘাড় কাৎ করে নির্জীব শুয়ে আছে তার বাপ, গলার তুলসী কাঠের মালাটা ঝুলে পড়েছে শুকনো বুকের মাঝখানে। কিছু ধরতে গেলে কেঁপে উঠছে হাত, গলার স্বরও কেমন জড়ানো, খুব মনোযোগ দিয়ে না শুনলে বোঝা যাবে না। ঝোলা চামড়ায় ঢাকা পড়ে আছে শরীরের সব হাড়, তার মাঝখানে ন্যাকড়া জড়ানো আঙুলগুলো সাদা চুনের উপর যেন আলতার ছোপ বোলান। শিরা জাগান কপালটা ছোট হয়ে এসেছে এখন, অজস্র কাটাকুটি রেখায় বদলে গেছে শুধু কপাল নয়, পুরো মুখটাই। শুয়োরের হাড়ের তাবিজটা তুলসী কাঠের মালার পাশাপাশি দোলে, এছাড়াও আরোগ্য লাভের জন্য তার ডান বাহু, কোমরের ঘুনসিতে মাদুলির ছড়াছড়ি। এত করেও সুস্থ হচ্ছে না গঁড়া বুড়া। ভরতের ইচ্ছে থাকলেও তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারে না, হাসপাতালে নিয়ে যেতে গেলে কমসে কম চারটে মানুষের দরকার, খাটিয়ায় না শোওয়ালে এ রুগী হাসপাতাল অব্দি যাবে কী করে? চার মানুষের দিনভরের মজুরী তো কম টাকা নয়, তারপর আছে খাওয়া-দাওয়া আর বিড়ির খরচ। ভরতের ইচ্ছে থাকলেও সেই ইচ্ছাকে সে জোর করে দমিয়ে রেখেছে পয়সার ভয়ে, আর এই ভয়টাকেই কী করে যেন ধরে ফেলেছে যোগমায়া, তাই দিন-রাত সে শুধু বুড়া মানুষটার চিকিৎসার কথা বলে, আর তা শুনে শুনে রোদে ঝলসানো ভরত মরমে মরে যায়, ফাটা বাঁশে আটকে যাওয়া আঙুলের যন্ত্রণায় সে ছটফটায়।

যোগমায়ার মুখোমুখি দাঁড়াতে এখন ভয় পায় ভরত, তাই তাকে এড়ানোর জন্য চামড়া বিক্রির পুরো টাকাটাই ধরিয়ে দেয় যোগমায়ার হাতে, টাকাগুলো তোমার কাছে রাখো। আমি পরীযান নিয়ে যাব দীঘায়। ফিরে এসে সুয়ারী ভাড়া করে বাপকে নিয়ে যাব এগরায়, ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ কিনে আনব।

কী ভেবে টাকাগুলো ধরে নিয়ে চুপ হয়ে গেল যোগমায়া। ভরত মাথায় আঙুলের বিদে দিয়ে বলল, সুদামকে একটু বোঝাও, ও আমার মাথার ব্যথা বাড়িয়ে দিচ্ছে। ঘরে জোয়ান ছেলে বসে খেলে সে বাপের দশা মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল।

ও বড় হচ্ছে, ওভাবে ওর সাথে কথা বলা তোমার উচিত নয়। যোগমায়া স্পষ্ট কথা বলল, তুমি যা অনায়াসে পারো ও তা কেন পারবে? বাবা যা পারে তুমি কি সব পারো? আমার দশটা নেই, বিশটা নেই—ঐ একটা ছেলে। তোমার কথায়, সে যদি কিছু করে বসে তাহলে আমাদের মুখে জল-আগুন দেওয়ার কেউ থাকবে না।

বনবাবুইয়ের ডাকে চারপাশ এখন ভীষণ রকমের ভরাট, পক্ষীকুলও জেনে গেছে এখন আনন্দ করার সময়। আলো মরলে ওরা ফিরে যাবে সে যার বাসায়, এখন শুধু গায়ে রোদ মেখে দানা খুঁটে খাওয়ার ব্যস্ততা। সাতভাই পাখির দল ছাইমাখা পালক নিয়ে শুকনো পাতায় থপর থপর হেঁটে বেড়ায়, সারা দিন ওরা যে এত কী বলে তার বিন্দু বিসর্গ বুঝতে পারে না মনুষ্য-সমাজ। তবু পাখিগুলো আছে বলে ভাল লাগে যোগমায়ার, ওদের কিচিরমিচির ডাক শুনতে-শুনতে সময় হারিয়ে যায় যোগমায়ার। আলো চলে গেলে সে ব্যস্ত হয়ে পড়ে গঁড়া বুড়াকে নিয়ে, কাপড়ের মশারিটা টাঙ্গিয়ে দিতে হয় জুঁত করে, রাতের খাবার না খাইয়ে দিলে বুড়োটা যে খেতে পারে না। অথচ গাঁ-ঘরের লোক বলে, কুষ্ঠ রোগের পোকাগুলো দিনের বেলায় সূর্যের আলোয় মড়ার মত পড়ে থাকে। সূর্য ডুবলে, আঁধার ঘনালে সেই দুরারোগ্য ব্যাধির জীবাণুগুলো কিলবিলিয়ে ওঠে, যা নাকি সেবা-শুশ্রূষাকারীদের পক্ষে ভয়ের কারণ। সবাই ভয় দেখালেও আদৌ ভয় পায়, না যোগমায়া, যা আছে ভাগ্যে এই বিশ্বাসে সে অনড়, অটল। তার ধারণায় রুগীর সেবা করা পুণ্যের কাজ, পুণ্যের কাজ করে যদি অভিশাপ দুঃখ কুড়াতে হয় তাহলেও তার মনের জোর কমবে না। এই মানুষটার জন্য সে এঘরে এখন রানীর মতো আছে, দুঃখ-কষ্ট যেটুকু তা গায়ে না মাখাই ভাল। ওগুলো সব সংসারেই আছে। গঁড়া বুড়া জল চাইতেই উঠে গেল যোগমায়া, কাঁচের গ্লাসে জল নিয়ে সে শ্বশুরের বিছানায় গিয়ে বসল, জল ভরা গ্লাসটা মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে নীচু গলায় বলল, বাবা, জলটুকু খেয়ে নাও। গা-হাত শুলোলে বলো-আমি টিপে দেব।

ঢকঢক করে জল খেয়ে গঁড়া বুড়া ঝিমোনো চোখে তাকাল, দু' চোখ ভিজে গেছে অক্ষমতার অশ্রুতে, তবু বিড়বিড় করে সে বলল, তুমি আগের জন্মে আমার মা ছিলে গো! তোমার সেবাযত্ন না পেলে কবে আমি ছাই হয়ে যেতাম।

যোগমায়া মৃদু ধমক দেয় গঁড়া বুড়াকে, চুপ করো, অমন কথা বলতে নেই। আমি তো সন্‌সার সামলে তোমার জন্য বেশি কিছু করতে পারি না, যেটুকু করি সেটুকু না করলেই যে নয়।

গঁড়া বুড়া হাত উঠিয়ে আশীর্বাদ করতে চায় যোগমায়াকে, কিন্তু বেজায় হাত কাঁপার জন্য সামান্য উঠিয়ে আবার নামিয়ে রাখে বিছানায়, মিনমিন করে বলে, তোমার ভাল হবে বউমা। তুমি পুণ্যবতী, এঘরের লক্ষ্মী। আমি চলে গেলে তুমি ভরতকে এট্টু দেখো। ও রাগারাগি করে ঠিকই কিন্তু মন ভীষণ ভালো।

ওসব কথা কেন বলছো, বাবা? যোগমায়ার চোখ ছলছলিয়ে ওঠে।

মন হচ্ছে তাই বলছি। গঁড়া বুড়ো মুখ ঘুরিয়ে নেয় উল্টো দিকে। বিকেলে ঝড়ের একটা আভাস ছিল চরাচরে, সেই ইংগিত আগাম বুঝতে পেরে ঘরে ফিরে এসেছে গোরু-ছাগল, পাতিকাকের দল নিমগাছের ডালে বসে গলা সাধছে, ঝড় উঠলে তারা ডানা মেলবে পাগল হাওয়ায়। পাড়ার কলাগাছগুলোর অবস্থা আরো শোচনীয়, ঝড় আসলে তাদের সাজান বেশ-ভুষা ছিঁড়ে যাবে, অসময়ে ধর্ষিতা হবার ভয়ে তারা যেন টান টান উত্তেজনা নিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। আশ্চর্য, ঝড় এল না, থিতিয়ে গেল সাময়িক হাওয়ার কুন্ডলী, কালো মেঘ উড়ে গেল পানিপারুলের দিকে। ফলে আবার নেই ভ্যাপসা গরমটা ঠেলে উঠল মাটি ফুঁড়ে। ভরত আর কালবিলম্ব না করে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে, কুঞ্জর সাথে তার পাকা কথা বলার দরকার নাহলে পরীযান বওয়ার কাজটা যে হাতছাড়া হয়ে যাবে।

কুঞ্জ এ পাড়ার সম্পন্ন মানুষ, একমাত্র তার ঘরে দুটো পালকি আর সাজান-গোছান পরীযান আছে। ভরতকে দেখে সে উৎসাহিত হল, ফাঁকা তক্তাপোষের উপর মাদুর বিছিয়ে দিয়ে বলল, দাদা, কী সিদ্ধান্ত নিলে গো? আমি তো বায়না ধরে নিয়েছি। লোককে কথা দেওয়া মানে ধর্ম দেওয়া।

ভরত জোরের সঙ্গে বলল, কেউ না যাক, আমি তোমার সাথে যাব। তুমি গেলেই হবে, আর আমার লোক সব ঠিক আছে।

বিড়ির ধোঁয়ায় ভরে উঠল মাটির দাওয়া, একথা সে কথায় সময়ও পেরিয়ে গেল অনেকটা, শেষ-মেষ ভরত ব্যস্ত হয়ে বলল, আমি এখন যাই। আমার জন্য ভেব না, আমি ঠিক সময় মতো এসে যাবো।

আগড় পর্যন্ত ভরতকে এগিয়ে দিয়ে গেল কুঞ্জ, ভরত পথে নামতেই সে চিৎকার করে বলল, দিন-তিনেক থাকতে হবে, সেইমত কাপড়-জামা গুছিয়ে নিও। পথে কোন অসুবিধা হবে না। বাবু বলেছে—পথের সব খরচ তাদের।

মরা আলোয় ঘরে ফিরে এল ভরত, কথাটা যোগমায়াকে বলার জন্য ছটফটিয়ে উঠল তার মন। যোগমায়া সব শুনে আব্দারের সুরে বলল, তিন দিন থাকবা না? তুমি না থাকলে সব ফাঁকা লাগে আমার কাছে। সন্সার আমি চালিয়ে নেব কিন্তু মীরাকে নিয়ে ঝামেলা হয়। ও কোথায় কোথায় ঘুরতে থাকে বুঝতে পারিনে। কে ওকে চোখে-চোখে রাখবে বল তো। ভরত চোখ ঘুরিয়ে বলল, আমি যে কদিন থাকব না, ওকে তুমি বেঁধে রাখবে।

ও কি গোরু-ছাগল যে বেঁধে রাখব? অসন্তুষ্ট হল যোগমায়া, যাকে জন্ম দিয়েছি তাকে কি বাঁধা যায় গো?

মুখ নামিয়ে নিল ভরত, এত বড় কথাটা তার বলা উচিত হয়নি, অনুশোচনা প্রকাশ পেল তার চোখে-মুখে, মেয়েটাকে নিয়ে আমি ও তো ভেবে মরি। ওকে নিয়ে কোথায় আমি যাইনি, সব জায়গা ঘোরা হয়ে গেল, তবু ওর এক ফোঁটা উন্নতি হল না। আর ভগবানকে বলিহারি—মানুষ করলি অথচ মানুষের বুদ্ধিটা দিলি না।

ভগবান মারলে কারোর কিছু করার থাকে না! কথায় বলে না-ভগবানের মার দুনিয়ার বার! বহু প্রত্যাশিত বৃষ্টি নামল, সঙ্গে ঝড়-বজ্র-বিদ্যুৎ, পাগল হাওয়ার ক্ষেপামুতে কড়াৎ করে ভেঙে পড়ল সজনে গাছের ডাল, নিমডালের ফাঁক থেকে খসে পড়ল কাকের বাসা, 'হায়' বলে কপালে হাত দিয়ে মেঝেয় বসে পড়ল যোগমায়া। সুদাম আর মীরা তখনও ঘিরে বসে আছে তার দাদুকে, বৃষ্টির ছাটে ভিজে যাচ্ছে তক্তা পোষে বিছিয়ে রাখা বিছানা, যোগমায়া কেমন কান্না জড়ানো ভঙ্গিতে বলল, যা রে সুদাম, তোর দাদুর বিছানাটা এট্টু সরিয়ে দে, আমি গোয়ালে গোরুগুলো একটু বেঁধে আসি। লাল মোরগটা এখনও ঘর ধরেনি, জানিনা মোরগটা এই ঝড়-জলে হারিয়ে গেল কিনা। কাল যদি মোরগটা ঘরে না ফেরে, তাহলে তোর বাবা ঘরে ফিরে রাগারাগি করবে। মোরগের বাচ্চাটাকে তোর বাবা কিনে এনেছিল এগরা থেকে, হারিয়ে গেলে সে আমার মাথা খেয়ে নেবে। আমার হয়েছে যত জ্বালা, আমি কোন দিক সামলাব বুঝতে পারছি না।

দুপুরে গঁড়া বুড়ার অবস্থা যাই-যাই হলো, মুখ বেঁকে গিয়ে কথা আটকে গিয়েছিল তার, প্রায় ঘন্টা দুয়েক পরে সে কথা বলল, আর যোগমায়ার বুক থেকে ভয়ের পাথরটা নেমে গেল। যমুনাকে খবর পাঠাতেই সে এল ঝড়-মাথায়, হাঁকুপাকু দম নিয়ে সে বলেছিল, জ্যাঠার অবস্থা ভাল মনে হচ্ছে না দিদি, আজকের দিনটা পেরবে কিনা সন্দেহ হচ্ছে। এসময় দাদাও ঘরে নেই, সে কবে দীঘা থেকে ফিরবে কে জানে, দাদা থাকলে আমাদের এত চিন্তা হোত না।

ঠাকুরপো কোথায়, তাকে তো দু'দিন ধরে দেখছি না!

সে ঘরেই আছে, আজ দুপুরে কী কাজে যেন এগরা গেল। তার ফিরতে রাত হবে। যমুনার কথা শুনে আরো ঘাবড়ে গেল যোগমায়া, ঠাকুরপো থাকলে আমার অত চিন্তা হোত না। এখন আমি বড় একা বোধ করছি। বাবার অবস্থা ভাল বুঝছি না। খুব ভয় করছে আমার।

যমুনা সেই ভয়ার্ত, পাংশু বিবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল নিজেও ভয় পেয়ে, তার মুখে কথার কোন অনুরনণ হল না। সে যে নিজেও ঘাবড়ে গিয়েছে, তার ভরাট মুখে বিন্দু বিন্দু ঘামগুলো সেই প্রমাণ দেয়। ঝড়ের মধ্যে সে ছুটে এসেছে, সেইজন্য তার পরনের কাপড়-চোপড় এলোমেলো, কাচবরণ শরীরে লেপটে আছে ধুলোর আস্তরণ, মাথার চুলে জড়িয়ে গেছে খড়কুটো, গাছের হলুদ পাতা। যোগমায়া এগিয়ে গিয়ে সেই খড়কুটো খুঁটে নিয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে বলল, আজ তোমাদের খাওয়া হয়েছে তো?

ফ্যাকাসে হাসল যমুনা, চোখে-মুখে বিছিয়ে গেল দুঃখ, হ্যাঁ, আজ চুলা জ্বলেছে। আলু-সেদ্ধ আর ভাত করেছিলাম, ও খেয়ে-দেয়ে এগরা গেল। ঝড় সঙ্গে নিয়ে যোগমায়া ব্যস্ত পায়ে গোয়াল থেকে ফিরে এল গোরু বেঁধে, বৃষ্টিতে ভিজে গিয়েছে ওর গায়ের কাপড়, দড়ি থেকে শুকনো গামছাটা সে মুছে নিয়ে মাথা এবং গা হাত পা মুছল, ভেজা শাড়িটা বদলাবার প্রয়োজন ও মনে করল না। গঁড়া বুড়ার

তক্তাপোষের কাছে গিয়ে দাঁড়াল, বাবা— বার চারেক ডাকার পরে চোখ মেলে তাকাল গঁড়া বুড়া। কোন কথা নেই। আশ্চর্য মমতায় সে দেখতে থাকল মাটির ঘরের পুরনো চালা। কড়ি বাঁশে ঝোলান আছে ঢোলটা, ঢোলের উপর ছিটকাপড়ে ঢাকনা, অব্যবহারে ধুলো জমেছে ঢোলের উপর, ঢোলকাঠি গুলোও কেমন পুরনো লাগে অথচ এই ঢোলটাই এক সময় প্রিয় ছিল গঁড়া বুড়ার। তেঁতুল গাছের গুঁড়ি খোদলা করে মিস্ত্রি লাগিয়ে বানিয়েছিল বহু সখ করে। এই ঢোল বাজিয়ে গঁড়া বুড়ার যত সুনাম, এতো চামড়ায় ঢাকা ঢোল নয় যেন কথা বলা যন্ত্র, যে বোল তুলতে চাইত—সেই বোলই ধরা দিত এর ডায়া-বায়া চামড়ায়। ঢাকও ঝোলান আছে কড়িবাঁশে পরপর, শত অভাবেও এগুলো বন্ধক দেয়নি গঁড়া বুড়া, বেচা তো দূরের কথা। ভরত একবার জেদ ধরেছিল বাদ্যযন্ত্রগুলো বেচে দেবে, খদ্দেরও ঠিক করে ফেলেছিল, কিন্তু বেঁকে বসল গঁড়া বুড়া ; খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিল এই দুঃখে, সারাক্ষণ মনভার, কারোর সাথে কথা বলে না, যেন তার কেউ মারা গিয়েছে। যোগমায়া ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ভরতকে আর ও পথে যেতে দিল না, বুঝিয়ে বলল, বাবা যতদিন আছে, বাদ্যযন্ত্রগুলো আমাদের ঘরেই থাকবে, বাবা চোখ বুজলে পরের কথা পরে— তখন ভাবা যাবে।

টুকে জল...! মুখ ফাঁক করল গঁড়া বুড়া, মুখের লালায় চিপকে গেছে চোখ, হাত-পায়ের ঘাগুলো বুঝি টনটনিয়ে উঠছে পাকালঙ্কার মতো, দু-ঠোঁটের ফাঁকে লালার সুতোর আস্তরণ। যোগমায়া জল নিয়ে এল, ঝিনুক ভরে জল দিল গঁড়া বুড়ার মুখে বহু কষ্টে জলটা ঢোক গিলে নিয়ে আবার সেই শূন্য দৃষ্টি মেলে তাকাল সে, বড় বিদনা হচ্ছে, আর পারছি নে, ভরত কোথায়...ওকে ডাক।

তখন বাজ পড়ল দক্ষিণ মাঠে, বিদ্যুৎ-এর সাপ ছোবল মারল কালো আকাশে, ঝমঝমিয়ে শুরু হল মুষলধারায় বৃষ্টি, যমুনা এবার ভয় পেয়ে সরে এল যোগমায়ার কাছাকাছি, দিদি কাউকে ডেকে আনলে মনে হয় ভাল হোত। ভরতদাকে দেখতে চাইছে, সে তো এখন দীঘায় পরীযান নিয়ে গিয়েছে। এই অসময়ে কী করা যায় বলতো? তোমার ঠাকুরপো ও নেই, সে থাকলে দীঘায় তাকে পাঠিয়ে দিতাম—

আমি দু-চক্ষে আঁধার দেখছি, যোগমায়া ভেঙে পড়ল, বিপদ যখন আসে হাতের কাছে কেউ থাকে না। এটা বিপদের ধর্ম। আমি এখন মা শীতলাবুড়ি ছাড়া আর কাকে ডাকব বলো—

তাই ডাকো দিদি, জ্যাঠার সময় হয়ে এসেছে। যমুনার গলা কেঁপে উঠল। ঝড়-জল থামার কোন লক্ষণ নেই, আকাশ ভেঙে পড়ার শব্দ চতুর্দিকে, ভেজা মাটি থেকে উঠে আসছে সোঁদা গন্ধ, আর সেই প্রার্থিত গন্ধে বুক টাটিয়ে ওঠে যোগমায়ার। অশুভ সংকেতে নেচে ওঠে তার চোখের পাতা, ধড়াস ধড়াস করে ওঠে বুক। ভরতের উপর তীব্র অভিমানে কেঁপে ওঠে তার ঠোঁট, গলায় আটকে যায় তার কথা। আবার কোথায় যেন বাজ পড়ল, নিমেষে আলোকিত হয়ে উঠল চরাচর। বিদ্যুৎ-এর আলো নিষ্প্রভ-ম্রিয়মান হতেই আবার বৃষ্টির সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ল নিকষ-কালো অন্ধকার। আর সেই অন্ধকারে ভেসে এল গঁড়া বুড়ার কণ্ঠস্বর, জল, টুকে জল....।

॥ চার ॥

দুধ-গঙ্গা জলের মিশ্রণ তৈরি করে দিয়েছিল যমুনা, কাঁসার গ্লাসে ভরা আছে সেগুলো, এর আগেও বার দুয়েক দুধ-গঙ্গা জল ঝিনুকে করে খাইয়েছে যোগমায়া, মীরা আর সুদাম। গঁড়া বুড়া যে চলে যাবে, তার যে ডাক এসেছে এ নিয়ে যোগমায়ার মনে কোন সন্দেহ নেই, তবু যমুনা ঢুলুঢুলু চোখে বলল, দিদি, ঝিনুকে করে দুধ-গঙ্গা জল খাইয়ে দাও। তোমার হাতের জল না খেয়ে জ্যাঠা মনে হয় মরবে না।

অলস ভঙ্গিতে এগিয়ে গেল যোগমায়া, তার শরীর আর চলছিল না। তবু দুধ-গঙ্গাজল ঝিনুকে ঢেলে গঁড়া বুড়ার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল, বাবা, মুখ ফাঁক করো, ; জল খাবে যে, মুখ ফাঁক কর।

পাখির বাচ্চার মতো অল্প একটু মুখ ফাঁক করল গঁড়া বুড়া, যোগমায়া অতি সাবধানে দু'ফোঁটা জল ঢেলে দিল তার মুখে, তারপর কিছুটা সরে গিয়ে ভেঙে পড়ল কান্নায়। উছলে ওঠা কান্নার বেগকে সামাল দিয়ে সে সুদামের দিকে তাকাল, যা, তোর দাদুর মুখে জল দিয়ে আয়।

সুদাম দাঁড়িয়ে থাকল চুপচাপ, কিছুটা রাগত স্বরে যোগমায়া বলল, শেষযাত্রায় মুখে জল দিতে হয়। যা বাবা, দেরি করিস না।

সুদাম তার মায়ের কথার অর্থ বুঝতে পারে না, এমন অভিজ্ঞতা তার জীবনে প্রথম, তাই সে ফ্যালফ্যাল করে তাকাল যোগমায়ার দিকে। তার চোখ জোড়া অশ্রুসজল হয়ে উঠল মুহূর্তে, বুকের খোদল থেকে কান্নার বেগটা এসে আটকে গেল গলার ভেতর। তবু সে ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে দু'ফোঁটা জল দিল গঁড়া বুড়ার মুখে। তখনই ঘটে গেল এক আশ্চর্য ঘটনা। গঁড়া বুড়া ঘোর লাগা গলায় বলল, দাদুরে টুকে হরিনাম কর আমার কানের কাছে। নাম-সংকীর্তন শুনতে আমার মন চাইছে—

সুদাম কিংকর্তব্যবিমূঢ়, সে অবাক করা চোখে যোগমায়ার মুখের দিকে তাকাল। যোগমায়া বলল, তোর দাদু হরেকৃষ্ণ হরে রাম শুনতে চাইছে। শেষ বেলায় সবাই কৃষ্ণনাম শুনতে চায়। তুই কর বাবা। মানুষটা কষ্ট পাচ্ছে, কৃষ্ণ নামে যদি উদ্ধার পায়।

যমুনা যোগমায়ার পাশে দাঁড়িয়ে বলল, যমরাজের রথ এলে মানুষ কৃষ্ণনাম শুনতে চায়। কৃষ্ণনাম শুনে চোখ বুজতে পারা অত্যন্ত ভাগ্যের ব্যাপার। আমার মা 'নাম' শোনার পরে চোখ বুজে ছিল। জ্যাঠাও নাম না শুনে যাবে না। সুদাম, তুই যতটুকু জানিস-গা। কৃষ্ণনাম ভুল গাইলেও দোষের হয় না।

ইতস্তত সুদাম কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে থাকে, মহা ফ্যাসাদে পড়েছে এমন তার চোখমুখের অবস্থা, পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য সে বলল, নাম গান আমি জানি না। মহোৎসব খেতে গিয়ে দু-একবার শুনেছি, তা আমার মনে নেই ঠিকঠাক।

কথাটা গঁড়া বুড়ার কানে গিয়েছিল হয়ত বা, তার চোখে জল এল, মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে সে বলল, ঢোলটা কড়িবাঁশ থেকে পেড়ে নিয়ে আমার ছিমুতে বাজা। আমি

যে যেতে পারছি নে, বড় কষ্ট। বুকের উপর কে চড়ে বসেছে, আমি দম নিতেও পারছি না।

কৃষ্ণনামের চাইতে ঢোলবাজান সুদামের কাছে সহজ কাজ, দাদুই তাকে শিখিয়েছিল যত্ন নিয়ে, বোলগুলো এখন আর মনে নেই অনভ্যাসে, তবু তক্তাপোষের এক কোণায় দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে ঢোলটা পেড়ে আনল সুদাম, ধুলোঝুল ঝেড়ে ঢোলটা ঝুলিয়ে নিল গলায়, ডান-বাম তালায় কাঠির বাড়ি মেরে ঘুম ভাঙিয়ে দিল ভারী বাতাসের।

ভোর হয়ে আসছে তখন, গাছের ভেজাপাতা থেকে খসে পড়ছে জল টুপটুপিয়ে, কাকের দল 'কা-কা' ডেকে মেলে দেয় ফ্যাকাসে আলোয়। সুদাম ঢোল বাজায়, তার সেই চামড়া কাঁপান ঢোলের আওয়াজ কঞ্চির বেড়া ডিঙ্গিয়ে পিচ রাস্তার উপরে গিয়ে থামে, জেগে ওঠে ঘুমন্ত মানুষ, ঘুম জড়ানো চোখে তারা শোনে আনাড়ী হাতের এলোমেলো ঢোলের বোল। পাড়া ভেঙে ছুটে আসে লোক, তাদের দেখে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ে যোগমায়া, বাবার কী হয়েছে দেখ তোমরা....বাবা মনে হয় আর বাঁচবে না গো!

গঁড়া বুড়ার প্রাণপাখি উড়ে গেছে অনেক আগেই, কেউ তা খেয়াল করেনি, মহিম ঝুঁকে পড়ে বুড়ার গায়ে হাত দিয়ে বলল, সুদাম, ঢোল থামা। যা হবার সব হয়ে গিয়েছে। কে শুনবে তোর ঢোলের বাজনা, যে শোনার সে তো চলে গিয়েছে—

থেমে গেল ঢোল। যোগমায়া সুদামকে দু'হাত দিয়ে ঠেলে আছাড় খেয়ে পড়ল গঁড়া বুড়ার বুকের উপর, বাবা, এ তুমি কি করলে গো? আমি কাকে বাবা বলে ডাকব? কে আমাকে দেখবে গো....?

যোগমায়ার দেখাদেখি মীরাও কান্না ভাসাল হাওয়ায়, সুদাম শব্দ করে কাঁদতে পারে না, একরাশ শূন্যতায় হাল্‌কা হয়ে গেল তার বুকের খাঁচা, কোথা থেকে ছোঁয়াচে অশ্রু এসে জড়ো চোখের কোনায়, বারবার নড়ে উঠল ঠোঁট, করকরিয়ে উঠল চোখের দু'কোন, অশ্রুভেজা চোখে সে শুধু নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকল গঁড়া বুড়ার পোড়খাওয়া মুখের দিকে। কাছ থেকে কারোর মৃত্যু দেখা-তার জীবনে এই প্রথম। একটু আগে যে মানুষটা বেঁচেছিল এখন তার কোন সাড়া-শব্দ নেই, কেমন শান্ত ভঙ্গিতে শুয়ে আছে সে, এসব কান্না আকুলি-বিকুলি হা-হুতাশ শোক তার কানে পৌঁচেছে না। অথচ একদিন এমন ছিল এই গঁড়া বুড়ার বাজনা শুনতে লোক এসে ভিড় করত তাদের উঠোনে, অনেক রাত পর্যন্ত গান-বাজনা হোত, কথা-হাসি-মশগুল হোত, তাল-বোল-লয় নিয়ে ব্যাখ্যা চলত ঘন্টার পর ঘন্টা, এখন সব যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে চিরদিনের মতো। গঁড়া বুড়ার মৃত্যুর সাথে সাথে যেন পরিসমাপ্তি ঘটল একটা যুগের, অবসান হল এক দীর্ঘ অধ্যায়ের।

একজন সুখী-ওস্তাদ চলে গেল। মহিম সবাইকে শুনিয়ে বলল এমন মানুষ আমি খুব কম দেখেছি জীবনে। জ্যাঠার ঢোল কথা বলত, ঢাকের বোল কান ভরিয়ে দিত আমাদের। তার চ্যালারা এখন এক একটা ওস্তাদ। জ্যাঠা তাদের মধ্যে বেঁচে থাকবে।

সুদাম ভাবছিল অন্য কথা। ভরত ঘরে নেই, সে কখন ফিরবে—এ খবর কেউ জানে না। মানুষটা যে এখন কোথায় আছে কে জানে!

জ্যালজেলে আঁধার সরে গিয়ে ফর্সা হয়ে আসছে সকাল, কালকের ঝড়ে বিধ্বস্ত হয়েছে অপরাজিতা ফুলের ঝাড়, বেড়া থেকে পুরো সংসার নিয়ে ছিটকে পড়েছে মাটিতে, জলকাদায় একাকার দশা তবু তারই মাঝে ফুটে আছে কয়েকটা আকাশ নীল ফুল, বেশ সতেজ এবং প্রাণবন্ত।

মহিমের কথা শেষ হতেই যোগমায়া কাতর হয়ে বলল, ঠাকুরপো, ঘরে মড়া রেখে আমি কী করব বুঝতে পারছি না। সুদামের বাবা যে কখন ফিরবে আমি তার কিছু জানি না। তুমি খোঁজখবর নিয়ে দীঘায় চলে যাও। হয়ত যাওয়ার পথেই তোমার সাথে তার দেখা হয়ে যাবে। সে না আসা পর্যন্ত কোন কাজ হবে না। যোগমায়ার কথাকে সমর্থন করল অনেকেই, সুদাম যাওয়া-আসার গাড়ি ভাড়া নিয়ে চলে গেল বাস রাস্তায়। দীঘা যাওয়ার ফার্স্ট এখনও যাইনি, সুদাম তাই অপেক্ষা করতে লাগল পিচ রাস্তার একদিকে। গঁড়া বুড়ার মৃত্যু তাকে বেশ নাড়িয়ে দিয়েছে, মানুষটা মাথার উপর ছিল, আজ নেই—এটা ভাবতে গিয়েই একরাশ শূন্যতায় মনটা কেমন যেন উদাম হয়ে গেল। মনে পড়ে গেল গঁড়াবুড়ার কথা, যা করবি মন দিয়ে করিস, মন না চাইলে করবি না। এই আমাকে দেখ, আমি কিন্তু কারোর কাছে হারিনি। গরীব ঘরে জন্মেও আমার একটা সমাজ ছিল, আমি ছিলাম সেই সমাজের মাথা। আমাকে গুরুদক্ষিণা না দিয়ে কেউ যদি বাজাতে যেত তার কিন্তু ভাল হোত না। গুরু সে তো সবার উপরে। সে কারোর কাছে টাকাকড়ি কিছু চায় না, সে চায় তার প্রাপ্য সম্মান। এই সুনাম আর সম্মানটুকু নিয়ে আমি যেন মরতে পারি। এর বেশি আমার কিছু চাওয়ার নেই, এই মাটির থেকে।

পানিপারুলে কী মনে করে বাস থেকে নেমে পড়ল মহিম, তার উদগ্রীব, চিন্তাগ্রস্থ চোখ একটা খালি পরীযান আর চার বেহেরাকে খুঁজছিল। এলোমেলো ঘুরতে ঘুরতে সে হঠাৎ-ই পেয়ে গেল পরীযানের সুসজ্জিত রূপটি, ক্লান্ত বিবশ পায়ে ছ-বেহেরা পাকা রাস্তার একধার ধরে, গাছের ছায়ায় তাদের কালো-কালো ভাঙাচুরো ছায়াগুলো সময়ের সাথে সাথে সচল হয়ে উঠছিল, ক্রমশ এগিয়ে আসছিল তারা, গলায় কোন 'হেই আ হো' সুর নেই, নিস্তরঙ্গ হাঁটা। মহিম নিজেকে নিজের ভেতর ধরে রাখতে পারল না, বুক চাপা কথা নিয়ে সে ছুটে গেল পরীযানের দিকে, কাছাকাছি এসে হাত তুলে বলল, ভরতদা, পরীযান থামাও।

ছ' বেহেরার কাঁধ থেকে পরীযান নামল পিচ রাস্তার একপাশে, ঘাড়ে দরকচা মারা মাংস গামছায় আলতো ভাবে রগড়ে নিয়ে ভরত মুখোমুখি দাঁড়াল মহিমের, অশুভ আশঙ্কায় গলা কেঁপে উঠল তার। কি হয়েছে রে মহিম, তুই কেন ক্ষ্যাপা মোষের মত ছুটে এলি এখানে, তোর কি তর সইছে না? বল, কার কি হয়েছে?

কি বলব ভরতদাদা, তোমার ঘরে চরম বিপদ!

আমার ঘরে? ভরত গায়ের ঘাম মুছে বিস্ফারিত চোখে তাকাল, মীরাকে কি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না? মেয়েটাকে নিয়ে আমি আর পারব না—মীরা ঘরেই আছে। ভাল আছে।

তাহলে?

মহিম ঢোক গিলল ভরতের ঘাবড়ে যাওয়া চোখের দিকে তাকিয়ে, বলা উচিত হবে কিনা এই ভেবে সে কিছুটা অপব্যয় করে মুখ ফসকে বলে উঠল জ্যাঠা আর নেই—। তার গলার স্বর বর্শা হয়ে গিঁথে গেল ভরতের বুকে। কথা আটকে ভরত মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল রাস্তার এক পাশে, কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে দমটা ছেড়ে দিয়ে সে কেঁদে উঠল সশব্দে, বাবা আর নেই, এ হতে পারে না। আমাকে শেষ দেখা না দেখে সে কোনদিন যেতেই পারে না। কেনে মিছে কথা বলছিস তুই! বারবার করে একই কথা পাগলের মতো বলতে থাকল ভরত, মহিম গিয়ে তার গায়ে হাত রাখল, আর দেরি করা যাবে না, তুমি আমার সাথে বাসে চল। সবাই তোমার জন্য মড়া আটকে রেখেছে ঘরে। ভোর রাতে মরেছে, বাসি মড়া তো বেশি সময় আটকে রাখা যাবে না।

পরীযানের মালিক কুঞ্জ বলল, আমিও ভরতদার সাথে যাবো। তোরা চারজনে পরীযানটা বয়ে আন। তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই। ধীরে-সুস্থে আসলেই হবে।

মিনিট দশেকের মধ্যে চোরপালিয়া ফেরার বাস পেয়ে গেল ওরা। একস্‌প্রেস বাস, পানিপারুল ছাড়লে জুমকী বা বঁইচায় থামবে না, সোজা একেবারে চোরপালিয়ায় থামবে। মহিম বাসের ভাড়া মেটাল, ভরত পেছনের সীটে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে চুপচাপ, কুঞ্জ তাকে সান্ত্বনার দেবার চেষ্টা করছে, মা-বাপ কারোর চিরদিন থাকে না দাদা। সময় হলে সবাইকে একদিন যেতে হবে। এটাই সন্‌সারের নিয়ম।

ভরতের মুখে কোন কথা নেই, সে যেন বোবা হয়ে গেছে, কিছুতেই মন থেকে মানতে পারছে না এই মৃত্যু। এটা যেন তার কাছে বিনা মেঘে বজ্রপাতের সমান। বিড়বিড় করে ভেজা স্বরে সে বলল, মাকেও দেখিনি, বাবাকেও শেষবেলায় দেখতে পেলাম না। আসার সময় তোমার বৌদি বলছিল—তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে। কিন্তু পয়সার মায়ায় আমার সব চলে গেল! এখন লাখ টাকা দিলেও বাবার শেষ কথা শুনতে পাব না!

সবার ভাগ্যে সব কিছু থাকে না। কুঞ্জ বলল, এখানেও ভাগ্যের দরকার হয়। ভাগ্যে না থাকলে তুমি পাড়ায় থেকেও দেখতে পেতে না।

গঁড়া বুড়াকে পোড়ান হবে না, সবার রায়ে ঠিক হল, তাকে কবর দেওয়া হবে ডাঙা মাঠের একধারে। সেইমত পাড়ার ছেলে-ছোকরার দল কোদাল ঝুড়ি নিয়ে তৈরি। গঁড়া বুড়াকে ভালবাসত সবাই ফলে তার শেষযাত্রায় পুরো পাড়া ভেঙে পড়ল ডাঙার মাঠে। বাঁশ কেটে খাটিয়া বানাল মহিম, কুঞ্জ গেলে কাচা কিনতে মাইতিদের কাপড় দোকানে। ঘাট থেকে ডুব দিয়ে এসে নতুন কাচা পরবে ভরত। একটা লোহার চাবিকাঠি যোগাড় করে এনেছে সে। লোহার চাবিকাঠিটা গলায় ঝুলিয়ে দেবে ভরতের। এখন অশৌচের ক'দিন খুব সাবধানে থাকতে হবে তাকে, এখন ঘর থেকে যত কম বেরবে ততই মঙ্গল।

এক কোমর মাটি খুঁড়ে হাঁপিয়ে উঠেছিল মহিম আর তার দলবল। তবু তারা অন্যকে কোদাল ছাড়তে রাজি নয়। কুঞ্জ হাঁটু মুড়ে ঘাসে বসে দেখছিল ওদের মাটি

খোঁড়া। যত দেখছিল ততই যেন সে ভাবুক হয়ে উঠছিল মানুষের পদ্মপাতা ক্ষণস্থায়ী জীবন নিয়ে। দার্শনিক ভঙ্গিতে সে বলল, আমার সব শেষ হল এবার। আমার বলতে এ সন্‌সারে কিছু নেই। যা আছে শুধু সাড়ে তিন হাত জমিন। এর বেশি কেউ তোমাকে একছটাক জমিন বেশি দেবে না—।

তা যা বলেছ। পাশ থেকে কেউ বলল একজন, দাদা, বিড়ি থাকলে দাও। হাতে-পায়ের বিদ্‌না শুরু হয়েছে। বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া না দিলে শরীর-মন চাঙ্গা হবে না।

কুঞ্জ বিড়ি দিল সবাইকে। গর্ত খোঁড়া শেষ হতেই গঁড়া বুড়ার পা দুটো দুমড়ে কাপড় সমেত শুইয়ে দিল তাকে। কুঞ্জ এগিয়ে এসে বলল, জ্যাঠার বুকে প্রথম মাটিটা ভরতদাই দেবে। যাও দাদা, আর দেরি করে মায়া বাড়িয়ে লাভ নেই। সৎকার হয়ে যাওয়ার পরেও তোমার অনেক কাজ বাকি আছে। ঘাটে যেতে হবে, নাইতে-ধুইতে হবে। তারপর কাচা পরা, চাবি ঝুলানো। যাও যাও, তাড়াতাড়ি করো—

ভরতের দিকে কোদালটা এগিয়ে দিল মহিম, ভরত কাঁপা হাতে কোদালটা নিয়ে অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল, মনে পড়ে গেল কত কথা। বাপ তো তার কাছে বটগাছের ছায়ার মতো ছিল, ছায়া সরে যাওয়ার দুঃখে সে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল আবার। কুঞ্জ উঠে গিয়ে ডান হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরল ভরতের দেহ, এসময় কাঁদতে নেই দাদা। মায়ার বন্ধন ছিঁড়ে জ্যাঠা যখন চলে গিয়েছে, তাকে যেতে দাও। ভগমানের কাছে প্রার্থনা করো—তার আত্মা যেন শান্তি পায়।

এক কোদাল মাটি গঁড়া বুড়ার শরীরে গড়িয়ে দিয়ে ভরত আর মৃতদেহর দিকে তাকাল না, তাকে ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল কুঞ্জ, নীচু স্বরে বলল, যতক্ষণ না পুরো মাটি পড়ছে—ততক্ষণ তুমি পিছন ফিরে বসে থাক। বিড়ি খেতে মন চাইলে খাও। আমি দেখে আসি—ওরা কি করছে!

কুঞ্জ চলে গেল।

প্রায় জনা দশেক মানুষ কোদাল দিয়ে মাটি ফেলছে দুড়দাড়, সেই শব্দে ভেতরে ভেতরে আঁতকে ওঠে ভরত, ফাঁকা হয়ে যাওয়া বুক ঠেলে কান্না বেরিয়ে আসতে চায় বাইরে, তবু সে আর কাঁদতে পারছে না, শুধু ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে শূন্য আকাশের দিকে। মানুষটা ছিল, এখন নেই, এই বোধ ভারাক্রান্ত করে তোলে তার হৃদয়, কিছুতেই সে মেনে নিতে পারে না গঁড়া বুড়ার এই চলে যাওয়া। তবু মেনে নিতে হয় মানিয়ে নিতে হয়, নাহলে এই সংসার- জীবন বৃথা। স্যাকুলের কাঁটা ভর্তি ঝোপ কেটে এনেছে মহিম, কিছুটা মাটি-চাপা দেওয়ার পর এগুলো বিছিয়ে না দিলে শেয়াল-কুকুরে শবদেহ বের করে ফেলবে—এই আশঙ্কায় সকলে কম বেশি চিন্তিত। স্যাকুলের কাঁটা বিছিয়ে তার উপর আবার মাটি-চাপা দিল শবযাত্রীর দল। পুরো মাটি ভরে যেতেই উঁচু করে সেখানে মাটির বেদী বানাল ওরা। এবার আর স্যাকুলের ডাল নয়, খেজুরের ডাল কেটে পুঁতেছিল মহিম। পুরো কাজ শেষ হতে ঘন্টা দুয়েক লেগে গেল, মাথার উপর সূর্য তার ক্রোধী প্রতাপ নিয়ে জ্বলছে, ঘামে বিড়বিড় করছে কম বেশি সকলের শরীর।

স্নান সেরে সবাই উঠে এল ঘাট থেকে। তার আগে শ্মশানযাত্রীদের জল খাবারের ব্যবস্থা করে রেখেছিল কুঞ্জ। পাত পেড়ে ভরতের উঠোনে সে সবাইকে খাওয়াল। খাওয়া শেষে ভরত হাত জোড় করে বলল, আমাদের সমাজের নিয়ম অনুযায়ী দশ দিনে ঘাটকাজ, এগার দিনের মাথায় শ্রাদ্ধ এবং আত্মীয়স্বজনদের খাওয়া। আজ যারা আমার বাবার শেষযাত্রায় এসেছে, তাদের প্রত্যেকের নিমন্ত্রণ রইল। আমি আবার শ্রাদ্ধের আগে ঘরে ঘরে গিয়ে সবাইকে বলে আসব। তোমরা সবাই না এলে আমি পিতৃদায় থেকে উদ্ধার হতে পারব না।

ভরত যখন বলছিল কথাগুলো, কুঞ্জ তার পাশে এসে দাঁড়াল, তোমার কোন চিন্তা নেই ভরতদা, আমি সবার নাম মনে রেখেছি। তোমার মনে না থাকলেও আমি তোমাকে মনে করিয়ে দেব। যাও, এবার তুমি কিছু খেয়ে নাও। কাল থেকে তো তোমার মহা-অশৌচ। এ কয়দিন একটু সাবধানে থাকবে। কোথাও যেতে গেলে সঙ্গে কাউকে নিয়ে যেও। এসময় একা একা কোথাও যেতে নেই।

শ্রাদ্ধশান্তি মিটে যাওয়ার পর ভরত ভাবছিল তার নিজের কথা। রাত প্রায় ন'টা হবে, গঁড়া বুড়ার ফাঁকা তক্তাপোষের উপর হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে দিয়ে বসেছিল ভরত। সারাদিন ধকলের শেষ ছিল না, সবই কুঞ্জ, মহিম এবং গ্রামের আর-সবাই সামলেছে। তবু ভরতকে তাদের পাশাপাশি থাকতে হয়েছে, না থাকলে উপায় নেই, পিতৃদায় বলে কথা। এখন ফাঁকা উঠোন শুয়ে আছে একা, মরা জ্যোৎস্নায় কুকুরের দল এঁটো পাতা উচ্ছিষ্ট খাওয়ার জন্য কামড়াকামড়ি শুরু করেছে নিজেদের মধ্যে। বিরক্তি হলেও ভরতের উঠে গিয়ে কুকুর তাড়াবার ইচ্ছে হল না। সে ভাবল এই ছোট তক্তাপোষে দিনের পর দিন শুয়ে থাকত তার বাবা, এমনও হয়েছে সারাদিনে গঁড়া বুড়ার সাথে একটা কথাও বলা হয়নি। দিন চলে গেছে তবু তার উপলব্ধি হোত—বাবা তো মাথার উপর আছে, দায়ে-অদায়ে সে তাকে সদুপদেশ দেবে, তাকে উদ্ধার করবে। এখনও সেই অনুভূতি ভরতকে প্রায়- সময় গ্রাস করে, তার মনে হয় গঁড়া বুড়া শুয়ে আছে তক্তাপোষে, তার সংসারকে দেখছে নিবিষ্ট চোখে। এক ঘোর লাগা আচ্ছন্নতার মধ্যে ভরত ডুবে যাচ্ছিল যখন তখন যোগমায়া এসে বসল তার পাশে। খড়খড়ে হাতটা ভরতের কাঁধের উপর রেখে সে বলল, কি ভাবছ? রাত হয়েছে। শুয়ে পড়।

সারাদিন ধকল গেল তবু ঘুম আসছে না। ভরত ক্লান্ত চোখে তাকিয়ে তার কেশহীন মাথায় হাত বোলাল। যোগমায়া লক্ষ্য করল—মাথায় চুল না থাকায় পুরো মুখটাই বদলে গেছে ভরতের, হঠাৎ দেখলে তাকে চেনাই যায় না! এই পরিবর্তন মানিয়ে নিতে একটু সময় লাগবে। সময়ই পারবে এই ক্ষত ভরিয়ে দিতে।

ভরত একটা বিড়ি ধরাল, ধুঁয়ো ছেড়ে বলল, আজ বাবার কত কথা আমার মনে পড়ছে। এত কথা গিজগিজ করছে মাথায় যার জন্য ঘুম আসছে না। বড় ফাঁকা-ফাঁকা লাগছে সব কিছু।

যোগমায়া হাই তুলে বলল, বাবা খুব কষ্ট পাচ্ছিল। সে-কষ্ট চোখে দেখা যায় না। কষ্ট থেকে ওপরওলা তাকে মুক্তি দিয়েছে। এইটুকু শান্তি নিয়ে আমাদের বাঁচতে হবে।

।। পাঁচ ।।

আষাঢ়ের মাঝামাঝি তবু বৃষ্টির দেখা নেই এক ফোঁটা ; চাতকপাখি মাঝমাঠের আকাশে বুক ফাটায়, ধুঁকোবক এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে প্রায় জল শুকিয়ে আসা ডোবার ধারে, পোকামাকড় যা পাবে তাই খুঁটে সে জীবনরক্ষা করবে এই প্রতিজ্ঞায়। সুদামের ঘরে একদম মন বসে না, সময় পেলেই সে জীবনমাস্টারের টেলারিং দোকানে চলে যায়, নয়ত মাঠ পেরিয়ে একেবারে হাজির হয় বাড়িতে, যেখানে তার জন্য অপেক্ষা করে থাকে ফুড়ফুনী অধীর আগ্রহ নিয়ে। আজ আর সে ওপথে গেল না। ফাঁসজাল নিয়ে সোজা চলে গেল ঘন ছায়ায় ভরা বাঁশবনের সেই ডোবার ধারে। যেখানে ডাহুক-ডাহুকী আসে নিয়ম করে, 'কককক' শব্দে ভরিয়ে তোলে বাঁশবনের বাতাস। মীরাই তাকে খবরটা প্রথম দিয়েছিল, আর আনন্দের সঙ্গে বলেছিল, দাদারে, ড্যক-পাখি ধরে আন, মা ঝোল রেঁধে দেবে, আমরা খাবো।

তার এত উৎসাহ ভাবিয়ে তুলেছিল সুদামকে, আর ডাহুক পাখি ধরার প্রস্তাবটা মনে ধরেছিল তার। সারাদিন তো ঘরেই বসে থাকে সে, যদি ডাহুক পাখি ধরতে যায় সে তাহলে মন্দ হয় না, কাজের কাজ হয় একটা। দাদু এই ফাঁসজালটা বানিয়েছিল কায়দা করে, তরলা বাঁশের কাঠিগুলো শুধু যত্ন নিয়ে চেঁচে দিয়েছিল সুদাম। এর আগে ফাঁসজাল বানানো সে দেখেনি, ফলে আগ্রহের আর শেষ ছিল না তার। প্রায় ঘন্টা চারেক সময় ব্যয় করে, সেদিন গঁড়াবুড়ো বানিয়েছিল এই ফাঁসজাল, বানানো শেষ হতেই তৃপ্তির শ্বাস ছেড়ে গঁড়াবুড়া বলেছিল, বগলা ফাঁস তো বানালাম কিন্তু কার এত সময় আছে এই ফাঁসজাল পেতে বসবে ঘন্টার পর ঘন্টা। পাখ-পাখালিকে ঠকানো তো অত মুখের কথা নয়, তারাও মাথায় কম বুদ্ধি ধরে না।

সেদিন সুদাম বলেছিল জোর গলায়, তোমার সময় না হলেও আমার সময় হবে। তুমি আমাকে শিখিয়ে দাও কী ভাবে ফাঁসজাল পেতে পাখি ধরতে হয়।

চৌকোনো সেই ফাঁসজাল চার ভাঁজ করলে এক ভাঁজে দাঁড়ায়, আবার মেলে ধরলে তা আবার চৌকোণো ঘরের মত, যার মাঝখানে ঝুলবে পাখিদের প্রলুব্ধ করার জন্য ধানের শিস অথবা টাটকা চুনো মাছ। সবই দাদুর কাছ থেকে ভাল মতন শিখে নিয়েছিল সুদাম, শেখার পরে প্রয়োগ করার ইচ্ছাকে সে দমন করতে পারেনি। পরপর তিন-চারদিন এখানে-সেখানে ফাঁদ পেতে বসেছিল সে, শেষ পর্যন্ত মশার কামড় খাওয়া সার হল কিন্তু কাজের কাজ কিছু হল না। ছেলের কান্ডকারখানা দেখে বিরক্ত যোগমায়া তাকে বলেছিল, এ সন্‌সারে কোন কাজ আর তোকে দিয়ে হবে না। তুই হলি অকম্মার ঢেঁকি। তোকে নিয়ে আমার যত চিন্তা—

মায়ের চিন্তা দূর করার জন্য পরদিন থেকে ফাঁসজাল নিয়ে আর বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়নি সুদাম, এর চেয়ে বরং সে জীবন মাস্টারের টেলারিং দোকানটাকে নিরাপদ আশ্রয় বলে মনে করেছে।

ফাঁসজাল রাখা ছিল বড়ঘরের এক কোণায়, লম্ফ জ্বেলে সেই ফাঁসজাল খুঁজে

বের করতে কালঘাম ছুটে গেল দুই ভাই-বোনের। কবেকার বানানো সেই ফাঁসজাল তার শ্রী হারিয়ে ঝুল-ময়লার আখড়া হয়ে বসে আছে, পচন ধরেছে সুতোয়, খুন লেগেছে বাঁশের কাটিতে তবু বিশ্বাস আর মনোবল হারাল না সুদাম, ঝুল-ময়লা সাফ-সুতরো করে সে মীরাকে আশ্বস্ত করার জন্য বলেছিল, এটার এখনও যা জোর আছে, একটা ডাহুক পাখি কাবু করার পক্ষে যথেষ্ট। এখন শুধু দরকার একছড়া ধানের শিস।

অসময়ে ধান পাওয়া গেলও ধানের শিস পাওয়া দুরূহ কাজ। মীরা এখানেও পথ বাতলে দিল, দাদারে, লক্ষ্মীঠাকুরের থানে ধানের ছড়া ঝোলান আছে। মাকে বললে-দেবে না। তুই ওগুলো নিয়ে নে, কেউ টের পাবে না। তাছাড়া ঐ ধানের শিস কারোর কোন কাজে লাগবে না—একসময় ঝরে গিয়ে নষ্ট হয়।

মীরার নির্দেশমত ধান ছড়াও পাওয়া গেল, এবার শুধু ফাঁসজাল পেতে ডোবার ধারে নিজেকে লুকিয়ে বসে থাকা। ডাহুক ধান খেতে এলেই তার লম্বা গলা আটকে যাবে ফাঁসে, ছটফট করবে উদ্ধারের জন্য, উড়ে পালাবার চেষ্টাও করবে কিন্তু ফাঁসজাল সমেত উড়ে পালাবে—একটা সামান্য ডাহুকের এত শক্তি কোথায়?

সেই সকাল থেকে ফাঁসজাল পেতে হা-পিত্যেশ চোখে গাছের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিল সুদাম, ঠায় তাকিয়ে থেকে তার চোখের তারা, ভ্রূ'র নীচটা কনকন করছিল যন্ত্রণায়। তবু আশা ছাড়েনি সে, মন বলছিল আজ হলেও হতে পারে আস্ত একটা ডাহুক পাখি যা দেখে খুশিতে উছলে উঠবে মীরা। পাখি ধরার কাজে ধৈর্য হল আসল কথা। ধৈর্য হারা হলে বৃথা হবে সময়, সার হবে মশা-মাছির কামড় খাওয়া। হেলে পড়া বাঁশের ফাঁকফোকর দিয়ে সূর্যের আলো ঢুকে আসছিল সিঁদেল চোরের মত। শুকনো বাঁশ পাতার বিছানায় থপথপ করে চরে বেড়াচ্ছিল একটা হাঁড়ি চাচা-পাখি—যাকে দেখে সুদাম দাঁড়কাক বলে ভুল করছিল। নিবিষ্ট চোখে দেখার পরে সে নিশ্চিত হল ওঠা দাঁড়কাক নয়—হাঁড়িচাচা পাখি, যে কিনা দিনভর বনে-বাদাড়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় খাদ্যের সন্ধানে। ঐ হাঁড়িচাচা পাখিটাই এখন কাল হল সুদামের কাছে, সে ভাবল—এতবড় একটা পাখি যদি ফাঁসজালের কাছের ঘুরঘুর করে তাহলে ডাহুকপাখি ভয়ে এদিকের ছায়া মাড়াবে না, বৃথা হয়ে যাবে সময় ব্যয় করা। সুদাম উবু হয়ে একটা ঢিল তুলে নিল হাঁড়িচাচা পাখিটাকে তাড়াবার জন্য এবং মুহূর্তের মধ্যে ঢিলটা ছুঁড়ে মারল পাখিটাকে তাক করে। কাজ হল এতে, ভয়ে নজরের বাইরে উড়ে গেল হাঁড়িচাচা পাখি। এরও প্রায় ঘন্টা খানিক পরে সুদামের যখন ধৈর্যের বাঁধ ভাঙছিল, ফিরে যাবে বলে ভাবছিল তখনই কাঁটা বাঁশ ঝাড়ের ঝোপ থেকে সুন্দর পাখনা মেলে উড়ে এল দুটো স্বপ্নের ডাহুক পাখি। থ' হয়ে গেল সুদামের চোখের তারা। জড়োসড়ো চোখে সে দেখল ডাহুক-ডাহুকীর রূপ। গলায় মুক্তোর মালা, পাখি দুটোর চোখ দুটো ভীষণ সুন্দর আর চঞ্চল, সতর্ক পা ফেলায় ছন্দ মিশে আছে যেন। পালকগুলোয় যেন তেল ঠিকরায়, আভিজাত্য প্রকাশ পায় চেহারায়। বুড়ো আঙুলের উপর খাড়া হয়ে দাঁড়ায় সুদাম উত্তেজনায়, যে কোন মুহূর্তে একটা অঘটন ঘটে যেতে পারে, আর তাতেই ভাগ্য ফিরে যাবে সুদামের, মীরার কাছে মাথা

উঁচু করে বলবে, দেখ, ডাহুক পাখি ধরে এনেছি। মা যতই আমাকে অকম্মার ঢেঁকি বলুক—আমি জানি আমি নিজে কি!

পাকা ধানছড়ার দিকে নজর গিয়েছে ডাহুক পাখির, ওরা কিছুটা চিন্তিত, কিছুটা শঙ্কাগ্রস্থ, সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না ধান খাওয়া উচিত হবে কিনা! শেষ পর্যন্ত ধানের লোভই টেনে নিয়ে গেল দুটো ডাহুক পাখিকে ফাঁসজালের দিকে। এতদূর এগিয়ে এসে আর ফিরে যাওয়া যায় না, বড়সড় গোছের ডাহুক পাখিটা ধান খাওয়ার জন্য গলা বাড়িয়ে দিল ফাঁসের দিকে। ধানে ঠোক্কর মারতেই পাকানো সুতোর ফাঁস চেপে বসল গলায়, ভয়ে ডাহুকপাখিটা নড়াচড়া করতেই এঁটে গেল ফাঁস তার সরু গলায়, হাঁসপাস করতে করতে পাখিটা ওড়ার চেষ্টা করল, আর তাতেই সর্বনাশ হয়ে গেল পাখিটার। ডানার ঝটপটানীতে পাখিটা উল্টে দিল ফাঁস, মাটিতে লুটিয়ে পড়েও তার তেজ কমে না। সুদাম লক্ষ্যপূরণের দৃশ্য চোখে দেখে আত্মহারা, সে দ্রুত পায়ে দৌড়ে গেল পাখিটার কাছে, ফাঁসজালটা বুকের কাছে চেপে মেঠোপথে সে ফিরে এল ঘরে, আনন্দ-উল্লাসে জাগিয়ে তুলল ঘর, মা, দেখো—ডাক পাখি ধরে এনেছি! মীরা কোথায়? ডাকো ওকে। ও মনে হয় কোনদিন ডাক পাখি ছুঁয়ে দেখেনি!

মীরার খোঁজ করল যোগমায়া, হাঁকডাক করল কিন্তু পাড়া মাথায় তুলেও সে তার সাড়া পেল না। হতাশ সুদাম বলল, মীরা যে কোথায় যায় কে জানে! সে না আসা পর্যন্ত ডাক পাখিটাকে মারা হবে না। মা, তুমি আমাকে একটা দড়ি দাও। ডাকপাখিটার পা দুটো আমি বেঁধে রাখি।

শুধু পা বাঁধলে হবে না, ডানা দুটোও বাঁধতে হবে, নাহলে উড়ে পালাবে। যোগমায়ার কথায় সতর্ক হল সুদাম। যোগমায়া সুতলি দিল তাকে, বুঝিয়ে দিল কীভাবে বাঁধতে হয় পাখির ডানা এবং পা। সুদাম যত্ন নিয়ে বাঁধল ডাকপাখির ডানা এবং পা। যোগমায়া এক পাশে দাঁড়িয়ে দেখছিল সব। বাঁধন পর্ব শেষ হতেই সে বলল, গোয়ালঘরে ঝুড়ি আছে। ঝুড়ি দিয়ে ডাকপাখিটাকে ঢেকে রাখ। নাহলে বেড়ালে মেরে ফেলবে।

মীরা ঘরে না ফেরা পর্যন্ত ডাহুক পাখির গায়ে কেউ হাত দেবে না, এমনই কথা বলে সুদাম বেরিয়ে গেল ঘর থেকে মীরার খোঁজে। বেশি দূর যেতে হল না, তেঁতুলতলার কাছে মীরার দেখা পেল সুদাম। ধুলোর মধ্যে বসে মীরা আঙুল দিয়ে দাগ কাটছিল মাটিতে, সুদামকে দেখে সে উঠে দাঁড়াল, মাথার ময়লাগুলো ঝেড়ে নিয়ে সে কাছে এসে দাঁড়াল, দাদা, ডাহুক পাখি এনেছিস তো?

সুদাম একবার ভাবল বলবে না, কিন্তু না বলে সে থাকতেও পারল না। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে সে বলল, বড় একটা ডাহুক পাখি ধরেছি। ঝুড়ি চাপা দিয়ে এসেছি। দেখবি চল—হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল মীরা, ঘরে এসে পাখিটার বেহাল দশা দেখে তার মন ভারাক্রান্ত হল, না রে দাদা, এটা আর খাবো না, পুষব। সে কি রে, ডাহুক আবার কেউ পোষে নাকি? ডাহুক পোষ মানে না।

মীরা কেমন হতাশ চোখে তাকাল, এত সুন্দর ডাকপাখিটা মেরে ফেলবি? আমার কষ্ট হবে। তার চেয়ে বরং ছেড়ে দে।

ছেড়ে দেবার জন্য কি এত কষ্ট করে ধরলাম?

সন্ধ্যেবেলায় ভরত কলাঝাড়ের কাছে গিয়ে ডাহুক পাখিটার গলা দ্বিখণ্ডিত করল ধারাল বটিতে। দূরে দাঁড়িয়ে মীরা ভীতু চোখে দেখল ফিনকি দেওয়া তাজা রক্ত ছিটিয়ে গেল মাটিতে। খালপোশ করে মাংস নিয়ে ভরত যখন দাওয়ায় এল তখন যমুনার সাথে তার চোখাচোখি হল। যমুনা আগেই শুনে নিয়েছে ডাহুক পাখির গল্প, সুদাম তাকে সবিস্তারে সব বলেছে—ফলে জিভে জল এল তার, এসময় জিভে জল আসা তার পক্ষে স্বাভাবিক, কেননা সে যে পোয়াতী মেয়েমানুষ। তার মনোভাব বুঝতে পেরে যোগমায়া বলল, তুমি আজ দুটো আমাদের ঘরে খেয়ে যেও। ঠাকুরপো তো ঘরে নেই, ফলে তোমাকে আর চুলা ধরাতে হবে না।

যমুনা মনে মনে এটাই চাইছিল, সে নিঃশ্চুপ ভঙ্গিতে মুখ নীচু করে দাঁড়াল। ভরত যোগমায়ার কথা শুনে খুশি হল না, এতটুকু মাংস কটা লোকে খেতে পারে—এই ভেবে মনে মনে বিরক্ত হল কিন্তু মুখ ফুটিয়ে সে কিছু বলল না। যোগমায়ায় পেছন পেছন হেঁসেল ঘর অব্দি এল যমুনা। একটা পিঁড়ি পেতে দিয়ে যোগমায়া বলল, বসো। আমি চুলাটা ধরাই। তারপর ভাতের হাঁড়ি চড়াব।

যমুনা অস্থির হয়ে বলল, দিদি, আমার দেরী হয়ে যাবে। দেরী হলেও তোমার কোন চিন্তা নেই। সুদামকে তোমার সাথে পাঠিয়ে দেব। সে তোমাকে ঘর অব্দি পৌঁছে দিয়ে আসবে।

এবার আর কথা বাড়াবার সাহস পেল না যমুনা।

মাটির হাঁড়িতে ভাত ফুটছিল টগবগিয়ে, শুকনো পাতা চুলার গহ্বরে ঠেলে দিচ্ছিল যোগমায়া, পাতার আগুনে যমুনার মুখের দিকে তাকাল। কপালে বড় আকারের সিঁদুরের টিপ তার কাচবরণ মুখের সাথে সোনায় সোহাগার মত মিল খায়, ভারি সুন্দর দেখায় তার মুখখানা, চেয়ে থাকলে মনে হয়—বহুযত্ন নিয়ে সিঁদুরের টিপ পরতে ভালবাসে যমুনা। সিঁদুরের উপর অতিরিক্ত ভালবাসা থাকার দরুণ মাঝামাঝি সিঁথিটা সিঁদুরে চোবান, এমন কী সিঁথিপথের আশেপাশের চুলগুলোর গোড়াও রেঙে ওঠে সিঁদুর স্পর্শে। দেখতে খারাপ লাগেনা, বেশ ভাললাগে যোগমায়ার, নতুন বিয়ের পরে সে-ও তো এমন অনভ্যস্ত হাতে সিঁদুর পরত, যা দেখে পাড়ার বউ-ঝিউড়ি'রা তাকে ক্ষেপাত। পরে সব ঠিক হয়ে গেল, এখন সে কথা মনে পড়লে হাসি পায় যোগমায়ার। এ পাড়ায় যমুনার সাথে যোগমায়ার মনের মিল বেশি, দায়ে-অদায়ে যমুনা যেমন আসে সেও ছুটে যায় তার কাছে। সুখ-দুঃখের কথা হয়। কথায় কথায় যমুনা একদিন দুঃখ করে বলেছিল মহিমের স্বভাব-চরিত্রের কথা। সে বলেছিল, দিদি, আমি শুনেছি তোমার ঠাকুরপোর নাকি মাথায় ঘুঘরো পোকা আছে। যোগমায়া অবাক হয়েছিল তার কথা শুনে, এসব কথা কেন বলছ, কি হয়েছে? কিছু হয়নি, এমনি জিজ্ঞেস করছি। দশ লোকে দশ কথা বলে, কানে আসে তাই তোমার কাছে শুনে নিশ্চিত হতে চাই। যমুনা বেশ কিছুক্ষণ নিজের ভেতরে ডুবে থেকে হঠাৎ বলে ফেলল, দিদি, তোমার ঠাকুরপো কি গোরুকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলে? তারপর সেই মরা গোরুর চামড়া ভাগাড় থেকে ছাড়িয়ে এনে বিক্রি করে মহাজনের কাছে?

মহিমের গুণের শেষ নেই, যোগমায়ার সব জানা তবু সে যমুনাকে বুঝিয়ে বলে, বেঁচে থাকার জন্য মানুষকে কত কী না করতে হয়। পচা কাদা ঘাটলে গন্ধ বেরবে, ওসব কথা ভুলে যাও। ঠাকুরপো আগে অনেক কিছুই করত, এখন সে ভাল মানুষ। তোমাকে বিয়ে করার পর ও পাল্টে গেছে পুরোপুরি, আসলে তুমিই ওকে পাল্টে দিয়েছ।

খুশি হতে পারে না যমুনা, তার চোখের কোন ছলছলিয়ে ওঠে, নিজের যে ভুল করেছে তার জন্য অনুশোচনা হয়। যোগমায়া বলে, পুরুষের অত দোষ ধরতে নেই, সন্‌সার চালাতে গেলে তাদের অনেক সময় ভুল কাজ করতে হয়।

এতো ভুল নয় দিদি, এ তো অপরাধ। যমুনার চোখ জ্বলে উঠেছিল রাগে, আগে যদি বুঝতে পারতাম মানুষটাকে তাহলে সারাজীবন আইবুড়ো থাকলেও ওর হাত আমি ধরতাম না। আসলে ও আমাকে ফুঁসলিয়ে ফুঁসলিয়ে নিজের ফাঁদে ফেলে দিল। আমি যে ফাঁদ কেটে বেরিয়ে যাব তা আর সম্ভব নয়। ওর সন্তান আমার গর্ভে বাড়ছে, আমি যে মা হতে চলেছি দিদি।

চুলার আগুন আলোকিত করে দিয়েছে হেঁসেল ঘর। ডাহুক মাংসের গন্ধে ম-ম করছে পুরো হেঁসেল ঘরখানা। যোগমায়ার হাতের রান্না এর আগেও খেয়েছে যমুনা, অল্প তেল-মশলায় তার রান্না যেন অমৃত সমান।

পাশাপাশি খেতে বসেছে যোগমায়া আর যমুনা। যোগমায়া খাওয়া থামিয়ে শুধোয়, আচ্ছা, তুমি যে একা থাকো ঘরে ভয় করে না?

ভয় করলেও কোন উপায় নেই। ঘর ছেড়ে তো যেতে পারি না। যমুনার চঞ্চল চোখের তারায় নিমেষে দুঃখ বিছিয়ে যায়, চোখ ভরে ওঠে জলে। আঁচলে দু' চোখ রগড়ে নিয়ে সে আবার খাওয়ায় মনোনিবেশ করে।

যোগমায়া বলে, ঝাল কামড়ে ফেলেছ বুঝি, জল দেব?

ঝাল নয়, মনের দুঃখে চোখে জল এসে গিয়েছিল যমুনার, তবু সে পরিস্থিতিকে সামাল দেবার জন্য ঢকঢক জল খায়। খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে সুদাম যায় তাকে এগিয়ে দিতে। আগড় অব্দি গিয়ে সুদাম বলে, এবার তুমি যাও কাকি, আমি ঘরে ফিরে যাই।

যমুনা কথা না বলে আগড় খুলে সুদামের দিকে তাকায়। আকাশের ক্ষয়িষ্ণু চাঁদ আলো ছড়ায় পৃথিবীতে। সেই চাঁদের দিকে তাকিয়ে যমুনার কেমন ভয় করে, পা কেঁপে ওঠে ভীতু বুকের সাথে পাল্লা দিয়ে। অনেকক্ষণ পরে অস্ফুট স্বরে সে বলল, সুদাম, তুই একটু দাঁড়া। আমি তালাচাবি খুলে আলো ধরাই, তারপর যাবি।

কাকা কখন আসবে? সুদামের প্রশ্নে যমুনা ভাষাহীন চোখে তাকাল। নিজেকে মনে হল বোবা আকাশের ক্ষয়া চাঁদ।

।। ছয় ।।

আষাঢ়ের শেষ, তবু বৃষ্টির কোন দেখা নেই—প্রচন্ড দাবাদহে ঝলসে গেছে চারপাশ। হাতে কাজ নেই বলে মন ভাল নেই মহিমের। সে সকালবেলায় দারস্থ হল ভরতের। অনুনয়-বিনয় করে বলল, দাদা, সংসার আর চলছে না, তুমি আমাকে একটা রাস্তা দেখাও—যাতে দুটো প্রাণী বেঁচে থাকে।

ভরত বলল, গাঁয়ে ঘরে কাজ কোথায় যে তোকে আমি বলব! তার চেয়ে বরং তুই নকুলের মতো সমুদ্রমাছের ব্যবসা কর।

গরমে সমুদ্রমাছ কেউ খাবে? তাছাড়া এখন সমুদ্রমাছের আমদানী কম। দীঘা থেকে মাছ এনে হাট ধরতে হলে এই গরমে পচে-গলে সার হয়ে যাবে। মহিমের কথাটা ফেলে দেবার মতো নয়, ভরত ভাবল। তার ব্যস্ততা ছিল, সে কাজে বেরবে, চঞ্চল হয়ে বলল, ঠিক এখন আমার মাথায় কিছু আসছে না। পরে ভেবে বলব।

মহিম মন খারাপ করা চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল তখনও, ভরত সমব্যথীর গলায় বলল, তোর বউয়ের বাচ্ছা হবে শুনেছি। এসময় তার তো ভাল-মন্দ খাওয়া দরকার। ঠিক আছে—আমি দেখছি—তোর জন্য কী করতে পারি।

ভরত চলে যাওয়ার পরও বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল মহিম। যোগমায়া পুকুরের দিকে যাচ্ছিল, মহিমকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, কখন এলে ঠাকুর পো?

বেশিক্ষণ নয়, দাদার সাথে কথা বলছিলাম।

বসো। আমি পুকুরঘাট থেকে আসছি।

না, আজ আর বসব না। যমুনা কাঁথি যাবে ক'দিন ধরে বলছে। দেখি, আজ যদি পাঠাতে পারি।

এই অবস্থায় ওকে পাঠাবে? তুমি নিশ্চয়ই সঙ্গে যাচ্ছ?

মহিম অক্ষমতার সঙ্গে বলল, দু'জনের যাওয়া-আসার ভাড়া কোথায় পাব বৌদি? এখন খুব খারাপ সময় যাচ্ছে—। বৃষ্টি না হলে কেউ মাঠের কাজে নেবে না।

সব শুনে চুপ করে, থাকল যোগমায়া। বৃষ্টির প্রার্থনায় নিয়মিত নাম-সংকীর্তনের দল ঘুরছে পাড়ায়-পাড়ায়। মানুষ চাতক চোখে তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে, কিন্তু মেঘের বংশ বলতে কিছু নেই, সব নিরুদ্দেশ। এভাবে চললে তীব্র খরায় জ্বলবে গ্রাম, ভূগর্ভে জলের লেয়ার কমে পাঁক জল উগলে দেবে চাপাকল। এই ভয়াবহ গরমে ঘামাচির চাষ-আবাদ এখন সবার শরীরে, কাহিল মানুষ একটু শীতল হাওয়ার জন্য কাতরায়।

একমাথা রোদ নিয়ে মহিম আর যমুনা ঠায় দাঁড়িয়ে আছে বাসের প্রতীক্ষায়। এ লাইনে বাস কম, কতক্ষণ যে দাঁড়াতে হবে ভেবে পেল না মহিম। মনে মনে বিরক্ত হচ্ছিল সে। যমুনা চুপচাপ দাঁড়িয়ে, তার মুখে কোন কথা নেই, মন পড়ে আছে কাঁথির দিকে। রোদের প্রকোপে বাস-রাস্তা ফাঁকা। শুধু ইস্কুলের মাঠে লেজ দুলিয়ে চরছিল দু'একটা গোরু। জীবন মাস্টারের টেলারিং দোকানের শব্দ আসছিল ঘড়ঘড়,

এছাড়া সব দোকানের ঝাঁপ আধখোলা। অনেকটা ধর্মঘটের ভয়ে লুকিয়ে চুরিয়ে দোকান খোলার মতো। যমুনা কাঁথি যাবে বলে সেজেছে খুব। তার খয়রেটে চোখের তারায় অদ্ভুত এক মাদকীয়তা নিবিড়ভাবে। ঘোর কাটে না মহিমের। তার বৌভাগ্য নিয়ে হিংসে হয় অনেকের, এর জন্য যমুনার গচ্ছিত রূপই দায়ী অনেকটা। মাথায় ঘোমটা দিয়ে গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ছিল যমুনা, বিড়ি আনতে দোকানে গেল মহিম, সে এখন একা। নীল আকাশের নীচে তার ছাপা শাড়ি পতপত করে ওড়ে, দু-চোখে মুগ্ধতা বিছিয়ে যমুনা তাকিয়ে থাকে দূরের দিকে, রোদ কিলবিল হাওয়ার মধ্যে জীবনের কোন রসদ নেই, তবু কথা বলার শক্তি পেয়ে গেল যমুনা। ব্রেক কষে তার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল জটা, মুখে হাসির ঝালর টেনে শুধোল, বৌদি, কোথায় যাচ্ছ গো তুমি?

যমুনা ঠোঁট ভরিয়ে হাসল, জটার গল্প সে মহিমের মুখে অনেকবার শুনেছে, দায়ে-অদায়ে এই জটাই নাকি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় মহিমকে নিঃস্বার্থভাবে। কৃতজ্ঞ মহিমের জটা-প্রীতি তাই কম নেই। সে প্রায়ই বলে, তুই আছিস বলেই আমার সন্‌সারটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কোন মতে চলে যাচ্ছে। নাহলে বৌ নিয়ে আমাকে শুকিয়ে মরতে হোত।

যমুনার চোখের তারায় জটার হাসি মুখটা ভেসে উঠল, এই মানুষটাকে সে মনে মনে চাইছিল অনেকদিন, আজ আবার দেখা হতে তার ভাল লাগল। মনে পড়ে গেল হাটের কথা, সেদিন অল্প সময়ের জন্য হলেও জটাকে তার ভাল লেগেছিল। ভাল লাগার দুটো কারণ (এক) জটা বড়লোক। (দুই) তার কাছে জাতপাতের কোন বালাই নেই। সবার সাথে মিশতে পারে বলেই জটার দিলদরিয়া স্বভাব। হাটের মাঝেই যমুনা তাকে ঘরে যাওয়ার কথা বলেছিল, কিন্তু আজ অব্দি সে ঘরে এল না—এই অভিমানে ফুলে উঠল তার ওষ্ঠ যুগল, জটাদা, তোমার সাথে আমার কথা বলা উচিত নয়। তোমাকে কত করে বললাম ঘরে আসতে কই এলে না তো?

যাব বৌদি, সময় হলে ঠিক যাব তখন কিন্তু বিরক্ত হয়ে যাবে।

যমুনা সেই একই ভঙ্গিতে বলল, এ তোমার এড়িয়ে যাবার কথা। আমরা গরীব বলে আমাদের তুমি ঘৃণা কর। নিজের ভাবলে নিশ্চয়ই একবার আসতে

যাওয়া হয়নি এরজন্য তুমি কি দণ্ড দেবা বল, আমি মাথায় পেতে নেব। জটা সরে এসে যমুনার ছায়ায় দাঁড়াল, তা এখন কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি?

কোথায় আর যাব? মেয়েদের আর যাওয়ার জায়গা কোথায়?

জটা কিছু বলতে যাচ্ছিল, সেই সময় মহিম এসে দাঁড়াল ওদের মাঝখানে, জটাকে দেখে সে বুঝি চাঁদ পেল হাতে, কী রে ডুমুরের ফুল! তোর দেখা-সাক্ষাৎ নেই কেন?

সময়ের বড় অভাব, কি করব বল?

সময়ের অভাব না এড়িয়ে যাওয়া কোনটা? মহিম হাল্‌কা চালে বলল, ভয় নেই রে, তোর কাছে আর ধার চাইব না। যে ধার করেছি তা শোধ না করে মরব না বলে দিচ্ছি।

জটা অপ্রস্তুত, গলায় কথা আটকে গেল তার, থতমত খেয়ে বলল, আমি কোনদিন তোকে টাকা ফেরত দেওয়ার কথা বলেছি? তুই লজ্জা পাবি বলে আমি তোর কাছে আসি না।

তুই আসিস না বলেই তো আমার কষ্ট। তোর কথা ঘরে খুব আলোচনা হয়। বিশ্বাস না হয় যমুনাকে শুধা!

যমুনা ঘাড় নাড়তেই বেকায়দায় পড়ে গেল জটা। আত্ম-সমর্পণের ভঙ্গিতে সে বলল, ঠিক আছে বৌদি, তোমরা কাঁথি থেকে ঘুরে আসো তারপর আমি একদিন আসব তোমাদের ঘরে। যাওয়া-আসা তো লেগেই থাকবে, ও নিয়ে অত চিন্তা কিসের। যমুনা চোখের মণি নাচিয়ে হাসল, ঠিক আছে, কত আসো দেখা যাবে। এবার না এলে আর কোনদিন রাস্তাঘাটে দেখা হলে কথা বলব না।

বাস এসে গেল ধুলো উড়িয়ে, যমুনা একাই উঠল, মহিম আর গেল না। সে শুধু চিৎকার করে বলল, সোমবার চলে এসো, দেরী করো না।

ঘাড় নাড়ল যমুনা। বাস দ্রুত গতিতে দৃষ্টির বাইরে চলে যেতেই আশ্চর্য জটা শুধোল, তুই কেন গেলি না? বউকে কেউ একা ছাড়ে রে—

মহিম বলল, দু-জন গেলেই ভাল হোত কিন্তু টাকা-পয়সার বড় টানাটানি চলছে। এখন কাজকর্ম নেই, ঘরে বসে আছি।

আমাকে তো কিছু জানাস নি?

কত আর জানাব বল? তোর কাছে তো গলা অব্দি ডুবে আছি। আর ডুবতে ভাল লাগছে না।

একটা কথা বলব, রাগ করিস না? জটার চোখে-মুখে রগড়, তোর বউ ভাগ্য ভাল। ভাগ্য করে বউ পেয়েছিস। এবার একটু সামলে-সুমলে চল। বাকি জীবনটা তোর ভালই কাটবে।

জটা এ কথায় কি ইঙ্গিত করতে চাইল তা ধরতে পারল মহিমা। তার পুরনো অতীত তো ভাল নয় আদৌ, সে নিজেই নিজের বদনাম ছড়িয়েছে পাড়ায়। তার ভবঘুরে মন আর বাঁধন হারা আবেগই এর জন্য দায়ী। সেবার মাইতিদের গোরুকে বিষ খাইয়ে সে পালিয়ে গিয়েছিল নিহারী। প্রাণের দায়ে সেখানে তাকে থাকতে হয়েছিল ছ'মাস। মালার সাথে সেখানে তার আলাপ এবং ভাব ভালবাসা। মালাকে বিয়ে করবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কিন্তু সর্বস্য নেওয়ার পরেও মালাকে সে গ্রহণ করল না। অন্তঃস্বত্তা মালা আত্মহত্যা করল গলায় দড়ি দিয়ে, ফলে বাধ্য হয়ে নিহারী ছাড়তে হল তাকে। মালাকে সে ঠকিয়েছে, মালার স্মৃতি তাকে এখন তাড়িয়ে বেড়ায় একা থাকলে। মালার কোন দোষ ছিল না, দোষী তো সে নিজে। মেয়েটাকে প্রেমের জালে ফাঁসিয়ে দৈহিক সুখ নিয়েছে মহিম, কিন্তু মানসিক সুখ সে তাকে দিতে পারিনি। মালা ঘর বাঁধতে চেয়েছিল তার সঙ্গে, এমন কী সে পালিয়ে আসতে রাজি ছিল—কথা দিয়েও তার কথা রাখেনি মহিম। মালা আজ নেই তবু তার কথাগুলো মনে ভাসে মহিমের। মালার অতৃপ্ত আত্মা তাকে কি ছেড়ে দেবে? একা ঘরে মালা এসে হাজির হয় তার কাছে, মনের দখল নিয়ে বলে, তুমি আমাকে ঠকিয়েছ। তোমার জীবনও সুখের হবে না।

আমার পেটেও সন্তান ছিল, সে-ও আমার সঙ্গে মরল। তুমি খুনী, তুমি ঠক, প্রতারক। মালা কোথায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে টের পায় না মহিম, সে শুধু অন্যমনস্ক হয়ে যায়, হাত-পা-সর্ব শরীর অবশ, ঘামতে থাকে সে। যমুনার নজর এড়ায় না এসব। সে কিছু প্রশ্ন করলে এড়িয়ে যায় মহিম। জোর করে হেসে ওঠে, কিছু না, শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। তুমি তোমার কাজ কর। আমি ঠিক আছি।

জটা সাইকেল চালিয়ে চলে গেল ঘরের দিকে, রোদ মাথায় ঘরে ফিরে এল মহিম। মালাকে সে ঠকালেও যমুনাকে সে ঠকাতে পারবে না। যমুনার ভালবাসার কাছে সে ধরা পড়ে গেছে। ফাঁকা ঘরে মন বসছিল না মহিমের, নীরবতা পাথর হয়ে চেপে বসছিল বুকের উপর। তখনই সুদাম এসে হাজির হল তার উঠোনে, গলা তুলে ডাকল, কাকা, ও কাকা....

বাইরে এল মহিম, কী হল রে, ডাকছিস কেন?

মা তোমাকে আজ আমাদের ঘরে খেতে বলেছে। গা ধুয়ে তাড়াতাড়ি চলে এসো। সুদামের মুখের দিকে তাকিয়ে নিজের ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গেল মহিমের। তখন বাবা-মা বেঁচে ছিল। সে সারাদিন শুধু ঘুরে বেড়াত এদিক-সেদিক, শুধু খাওয়ার সময় ঘরে আসত। পাড়ায় যেদিন শুয়োর মারা হবে সেদিন ঘর ছেড়ে সে কোথাও যেত না। মজা লাগত শুয়োর নিধন দেখতে। সে ছোট বলে অংশগ্রহণ করত না, তা বলে আগ্রহের কোন কম ছিল না তার। খাসী শুয়োরকে পা বেঁধে ফেলে দেওয়া হোত পুকুরে, তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত চার পাঁচজন মানুষ, তাদের জান্তব উল্লাসে মেতে উঠত পুকুরপাড়ের চারধার, শুধু ছেলেরা নয়, মেয়েরাও হা-করে দেখত সেই শুয়োর মারার দৃশ্য। জলের গভীরে ঠুসে ধরা হোত শুয়োরের মুখ দীর্ঘ সময়, একসময় দম আটকে শেষ নিঃশ্বাস ছাড়ত দশাসই সেই শুয়োর। তারপর তুলে আনা হোত সেই শুয়োর, খড় শুকনো পাতা জ্বেলে পোড়ান হোত তার গায়ের লোম। পশ্চাৎ দেশে গুঁজে দেওয়া হোত বিচুলির আঁটি যাতে মল-মলাদি না বেরিয়ে আসে। শুয়োর ভাল কাটতে পারত গঁড়া বুড়া। পিস পিস করে কেটে কলাপাতায় সাজিয়ে রাখত চর্বি বোঝাই সেই থলথলে মাংস। উঠতি ছেলে-ছোকরাদের আগ্রহ থাকত পিঠুলি বা মেটের দিকে। এক খাবলা পিঠুলি, পাতার জ্বালে পুড়িয়ে নুন দিয়ে চেখেঁ-চেখে খেত ওরা। বড়রাও ভাগ বসাত ছোটদের পিঠুলি পোড়ায়, আব্দর করে বলত, দে না টুকে, মদের সঙ্গে খাব।

এসব সুখের দিন এখন যেন হারিয়ে যাচ্ছে দিনে দিনে, পিঠুলি আছে ; পিঠুলি পোড়ানও হয়, খাওয়াও হয়—শুধু হারিয়ে গেছে সেই আনন্দমুখের দিনগুলি। এখন আর কেউ হুকা খেতে চায় না, এতে ঝামেলা বেশি, এখন বিড়ি-সিগারেটে সবাই সন্তুষ্ট।

রোদের তেজ এখনও কমে নি, মধ্য গগনে আকাশকে শাসন করে সূর্য। মহিম সুদামকে বলল, ঘরে চল। এই রোদ মাথায় এলি, এখনই আবার চলে যাবি? বসব না। আমাকে জীবন মাস্টারের দোকানে যেতে হবে। ব্যস্ত হয়ে উঠল মহিম, মীরার জামাটা ছিঁড়ে গিয়েছে, ওটা সেলাই করে আনা দরকার। ঠিক আছে যা। তোর মাকে বলিস, আমি সময়মত চলে যাব।

ঘামালু আর গোলমরিচ দিয়ে গায়ে মাখামাখি তরকারী বেঁধেছিল যোগমায়া, সঙ্গে মৌরালা মাছের টক, চিকনি শাকের চচ্চড়ি। রান্নাগুলো এত ভাল হয়েছিল যে চেটেপুটে খেল মহিম। খাওয়া শেষ করে সে বলল, বৌদি, অনেকদিন পরে তৃপ্তি করে দুটো ভাত খেলাম। এ পাড়ায় তোমার রান্না তো কারোর সঙ্গে মেলে না, কী করে যে তুমি এত ভাল রাঁধো আমার মাথায় আসে না।

তোমার মাথায় না আসাই ভাল। রান্নাবান্না পুরুষের কাজ নয়। যোগমায়া হাসল, যাওয়ার সময় তুমি আমার সঙ্গে দেখা করে যেও। কথা আছে—

কি কথা বলতে পারে যোগমায়া—মহিম ভেবেও পেল না, তার গলায় ভাত আটকে যাওয়ার অবস্থা হল, যোগমায়া তার বিচলিত মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, অত ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নেই। মন দিয়ে খাও।

খাওয়া-দাওয়ার পাঠ চুকতেই পান সেজে দিল যোগমায়া, তখনই মহিম বলল, বৌদি, আমি চলে যাব। কী বলবে বলছিলে, বলে দাও।

এখানে বলা যাবে না। তুমি একটু পুকুর ধারে চল।

মহিম ঘাবড়ে গিয়ে ঘামছিল, বুকের ভেতর লাফিয়ে উঠছিল ভয়ের ব্যাঙ, কোনমতে বলল, ঠিক আছে, তুমি আসো—আমি যাচ্ছি।

মাথা নীচু করে পুকুরয়াড়ি পর্যন্ত হেঁটে গেল মহিম। যোগমায়া কী শোনাবে এই ভেবে তার মন বড় বেশি অস্থির। সাদামাটা চেহারার যোগমায়াকে সে ভয় করে তার ব্যক্তিত্ব পূর্ণ কথাবার্তা এবং অনমনীয় মনোভাবের জন্য। আজ এতদিন হল সে কোনদিন যোগমায়ার মাথা থেকে ঘোমটা খসে পড়তে দেখিনি, ছ্যাবলামি করা তো দূরে থাকুক। নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে সে খুব বেশি সচেতন, আত্মসম্মান বিকিয়ে সে কোনদিন খ্যা-খ্যা করে হাসে না, নিজেকে গুছিয়ে রাখতে জানে দশ জনের মধ্যে থেকেও।

মহিম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামছিল, তখনই যোগমায়া এল মুখে পান ফেলে। ছাঁচি পানের গন্ধটা টের পেল মহিম, সে যোগমায়ার মোটা ভ্রূ'র ইঙ্গিত পড়তে চাইল নিজেকে বোঝ দেওয়ার জন্য। পানের পিক ফেলে যোগমায়া বলল, আজ তোমাকে আমি বাঁচিয়ে দিয়েছি বিপদের হাত থেকে। আজ নিহারী থেকে মালার মা অহল্যা এসেছিল আত্মীয়ঘরে। তোমাকে খুঁজছিল।

কথা-শুনে কেমন পাংশু হয়ে গেল মহিমের চোখ-মুখ, তার মুখে কোন কথা সরল না, তার আগেই যোগমায়া যোগ করল, সে তোমাকে মন ভরে গালাগালি দিচ্ছিল, তোমার জন্য নাকি তার একমাত্র মেয়ে গলায় ফাঁস নিয়েছে। একথা সে এ পাড়ার জন-জনকে বলে যাবে। আমি তা হতে দিইনি, ধমকে দিয়েছি। পাড়ায় পেট পাতলা লোকের অভাব নেই। তারা যদি এসব কথা যমুনার কানে তুলে দেয় তাহলে সেও মনের দুঃখে মরবে। তোমার এই অধঃপতন সে কিছুতেই মেনে নিত না। যোগমায়া থামল, চোখ পাকিয়ে পুষ্ট স্বরে বলল, ভেবো না আমিও মেনে নিয়েছি। মেয়ে হয়ে একটা মেয়ের ক্ষতি হোক—এটা শুধু আমি নই—কেউই মেনে নেবে না। তবে যা ঘটে গিয়েছে তা

নিয়ে আমি আর ভাবছি না। ভবিষ্যৎ-এ যাতে না ঘটে এই নিয়ে ভাবনা চিন্তা করো, ঘরে তোমার বউ আছে, তার যেন কোন অমর্যাদা না হয়। যমুনার কিছু হলে সবাই ক্ষমা করলেও আমি তোমাকে ক্ষমা করব না। আমার এই সতর্কবাণী মনে রেখো ঠাকুরপো....

কানের পাশ দিয়ে দরদরিয়ে ঘাম নামছিল মহিমের, শুকনো ঢোক গিলে সে হঠাৎ পা দুটো ছুঁতে চাইল যোগমায়ার, বৌদি, আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও। আজ তুমি না থাকলে মালার মা আমার মান-সম্মান সব ডুবিয়ে দিয়ে যেত। ওর মেয়ে আত্মহত্যা করেছে এ তো ঠিক কিন্তু তার জন্য যে আমি-ই দায়ী একথা সে কি করে নিশ্চিত হল?

মেয়েদের চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় না ঠাকুরপো! যোগমায়া আগুন উগরান চোখে তাকাল, আগুনকে ছাই দিয়ে, যেমন চাপা যায় না, তেমনি সত্যি কথাকে কি গলার জোর দিয়ে ঢাকা যায়? সে চেষ্টা তুমি করতে যেও না, তাহলে নিজের পাঁকে নিজে ডুবে যাবে। কারোর সর্বনাশ করে নিজের ভাল কোনদিন হয় না। যে ভুল তুমি করেছ, তার জন্য মালার মায়ের কাছে না হোক শীতলাবুড়ির কাছে ক্ষমা চেয়ে নিও। নাক-কান মুলে প্রতিজ্ঞা করো—এমন কাজ আর তুমি জীবনে করবে না।

কলাগাছের বেগো ভেঙে পড়ার শব্দের চমকে ওঠে মহিম, ভয়ার্ত চোখ মেলে আশেপাশে তাকায়, অস্ফুটে বলে, বৌদি, যে ভুল আমি করেছি, তার কোনো ক্ষমা নেই। এমন ভুল আমার আর কোনদিন হবে না।

মাঝরাতে বৃষ্টি এল সেদিন, ঘরের চাল ভেদ করে জল ঝরল অনবরত, মহিম থালা বাটি হাঁড়ি পেতে দিয়েছে জল ধরার জন্য, হঠাৎ বৃষ্টির শব্দে ঘুম ভেঙে যাওয়াতে সে কিছুটা ক্ষুব্ধ বিরক্ত। চোখ রগড়ে নিয়ে সে দাওয়ায় এসে দাঁড়াল, বিদ্যুৎ-এর আলোয় আকাশের মুখ দেখা যায় তাৎক্ষণিক। আকাশের যে চেহারা হয়েছে তাতে বুঝতে পারে মহিম, আজ মুষলধারায় বর্ষাবে আকাশ আর সেইসঙ্গে ব্যতিব্যস্ত হতে হবে তাকে ফুটো চালের জল ধরার জন্য। এসময় যমুনা সঙ্গে থাকলে হাত লাগাত এই কাজে, যমুনা নেই ফলে বিরক্তবোধ করল মহিম। মালার মা ফিরে গিয়েছে পরের দিন, যোগমায়ার মুখের ভয়ে সে আর পাড়ার কারোর ঘরে যাওয়ার সাহস পায়নি। যা হবার ছিল হয়ে গিয়েছে, মালা তো আর ফিরে আসবে না, ফলে এসব চর্চার ইতি হওয়া দরকার অবিলম্বে। এই সহজ কথাটা অহল্যা কিছুতেই বুঝবে না, সে তার জেদে অনড়। কথায় আগুন ধরে, কথায় পুড়ে খাক হয় ঘর। ভীত মহিম থরথর করে কাঁপতে থাকে এসব কথা ভাবতে গিয়ে। অহল্যা যেন তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, কন্যা-শোকে ব্যাকুল তার হৃদয়, শোকের দাবানলে সে ছারখার করে দিতে চায় মহিমের সাজান সংসার। প্রতিশোধ স্পৃহায় ধুঁকছে সে সদ্য সন্তানহারা বাঘিনীর মতো। ভাগ্যিস এ সময় যমুনা নেই, সে থাকলে মেয়েমহলে চাউড় হওয়া কথাটা একান-সেকান হয়ে ঠিক আসল জায়গায় পৌঁছে যেত, এবং তার ফলে যে ফাটল তৈরি হোত ওর মনে, সে ক্ষত ভরাট করার ক্ষমতা মহিমের একজীবনেও হোত না। যমুনা আর দু'দিন পরে আসুক, সে হাত পুড়িয়ে খাবে—এতে তার কষ্ট হলেও

সে মেনে নেবে কেন না অশান্তির চেয়ে কষ্ট অনেক ভাল।

একটা ঝলমলে সকাল এল প্রত্যাশা মত, গাছের পাতার ধুলোবালি ময়লা সব ধুয়ে গেছে বৃষ্টির তোড়ে, শুধু জাড়াগাছের পাতাগুলো গোল আয়নার মত চকচক করছে সূর্যের আলো পড়ে। যেদিকে তাকায় সব কিছুকে নতুন বলে মনে হয় মহিমের, আবিষ্কারের আনন্দে তার জমাট বাধা মনের শ্যাওলাগুলো সরে যেতে থাকে ধীরে ধীরে, সে ধীর পায়ে বাড়ির পেছনের পুকুর পাড়ে গিয়ে দাঁড়ায়, যেখানে বিশাল শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রায় ষাট-সত্তর বছরের পুরনো তেঁতুলগাছটা। কালকের হঠাৎ বৃষ্টিতে তেঁতুলের ক্ষুদে পাতাগুলো উড়ে এসে পড়েছে পুকুরের জলে—, হলুদপাতাগুলো চুঁনো মাছের মত ঘুরছে হাওয়ার তাড়া খেয়ে। হঠাৎ গা ছমছম করে ওঠে মহিমের, তেঁতুলগাছের ডালগুলোর দিকে তাকিয়ে তার যমুনার কথা মনে পড়ে। সে দেখতে পায় তেঁতুলগাছের ডালে মালা নয়, যমুনা যেন লাশ হয়ে ঝুলছে। সায়ার খোলে ঢুকে গিয়েছে হাওয়া।

।। সাত ।।

এই দৃশ্যটাই কাল রাত থেকে ভাবিয়ে তুলছে মহিমকে, একটা অশুভ সংকেত তার রক্তে ভয়ের জীবাণুগুলো ছড়িয়ে দেয়, যমুনার কিছু হয়ে গেলে সে পাগল হয়ে যাবে, তার হয়ত এ জীবনে কোনদিন আর সংসার করা হবে না। পাড়ার বউ-ঝিউড়িদের পেট পাতলা, তারা কি মালার মৃত্যুর খবর ইনিয়ে-বিনিয়ে বলে দেবে যমুনাকে? যদি বলে দেয় তাহলে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাবে মহিমের। সে কী ভাবে প্রতিরোধ করবে—এই ভেবে অস্থির তার হৃদয়-মন। যমুনাকে সে চিনেছে খুব ভাল ভাবে, সে অভাব সইতে পারে কিন্তু মহিমের কোন চারিত্রিক দোষ তাকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। এমনটা হলে যমুনাও যে কোন সময় ঝুলে যেতে পারে তেঁতুলের ডালে, জীবনদীপ নিভিয়ে দিয়ে সেও অন্ধকার করে দিতে পারে মহিমের জীবন। মহিম যত ভাবছিল ততই কপালের চারপাশটা দপদপ করছিল তার, অসহ্য যন্ত্রণায় ছিঁড়ে পড়তে চাইছিল তার মাথা। এসময় একটা বিড়ি ধরালে শান্তি হয় বুঝি—এই ভেবে মহিম বিড়ির ডিবা খুঁজে স্যাঁতসেঁতে একটা বিড়ি ধরাল, পরপর তিনটে ম্যাচিস কাঠি নষ্ট করে চতুর্থবারে সে সফল হল তবু ধোঁয়ার অপ্রতুলতায় তার চোয়াল বসে গেল ঘন ঘন টান দিতে গিয়ে, এক সময় হাঁপিয়ে ওঠে বিড়িটা ছুঁড়ে দিল দূরের দিকে। পুরো মুখ বিড়ির ধোঁয়ায় তেতে হয়ে উঠল তার। মুড়ি ভিজিয়ে জল খাবার খেয়ে সে ভাবল—কাঁথি চলে যাবে, যমুনাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আর কদিন থেকে যেতে বলবে। বলবে—দারুণ অভাব। এখন কোনমতে গাঁয়ে থাকা ঠিক নয়। গাঁয়ে এখন অসুখ-বিসুখ লেগে আছে। যমুনা যদি কথা না শোনে তাহলে তাকে নিয়ে আসতে সে বাধ্য হবে। পোয়াতী বউয়ের মনে দুঃখ দেওয়া তার উচিত হবে না, যা আছে ভাগ্যে তাই

মেনে নিতে হবে তাকে। কিন্তু কাঁথি যেতে গেলে টাকার দরকার, কে দেবে তাকে টাকা? যোগমায়ার কাছে হাত পাতবে কি সে? পরক্ষণে ভাবল—না। ওখানে হাত পেতে কোন সুবিধা হবে না। ওদেরই অভাব। ওরাই বা পাবে কোথায়? তাছাড়া ভরত জানলে পাড়া মাথায় তুলবে সে। হয়ত বকাঝকা করবে যোগমায়াকে। আর কার কাছে হাত পাতা যায় ভাবল মহিম। জীবন মাস্টারের কাছে গেলেও কাজ হতে পারে, কিন্তু মন সায় দিল না শেষপর্যন্ত। অবশেষে জটার কাছে যাবে মনস্থির করল সে, ওই একটা জায়গা আছে যেখানে গিয়ে খালি হাতে কোনদিন ফিরে আসতে হয়নি তাকে। চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে মহিম গিয়ে দাঁড়াল জটার কাছে। সমবয়েসী জটা ঘরে ছিল না, তার বিপদ, পানিপারুল থেকে গোরুর গাড়িতে মাল নিয়ে ফেরার সময় বেকায়দায় তার গোরুর গাড়ি পুকুরে পড়ে গিয়েছে। প্রায় মণ খানিক নুন-চিনি গলে গিয়েছে পুকুরের জলে। এক বস্তা মুগের ডাল ফুলে-ফেঁপে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে গেছে। এছাড়াও তার ক্ষতি হয়েছে সমূহ। জোড়া বলদ উদ্ধার না পেয়ে জলে ডুবে মারা গিয়েছে পুকুরে, বহু কষ্টে সেই মরা বলদ দুটো পুকুর থেকে উঠিয়েছে গ্রামের মানুষ। গলায় দড়ি নিয়ে গোরু মরলে প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক। বিধান দিয়েছে গ্রামের মুরুব্বির দল। তাদের বিধান নত মস্তকে মেনে নিয়েছে জটা। কার পাপে এত বড় অঘটন ঘটল—এখনও ভেবে পাচ্ছে না জটা। তবে তার মনে একটা সংশয় দানা বেঁধেছে। সেদিন বাস রাস্তার ধারে সে যমুনাকে দেখেছিল খারাপ নজরে। তার মনের মধ্যে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল তা যমুনার শরীরকে কেন্দ্র করে। পরের বউকে নিয়ে খারাপ স্বপ্ন দেখা শুধু অন্যায় নয়—পাপ। সেই পাপের ফল কি তাকে এভাবে হাতে-নাতে দিতে হল? মনের কথা তার মনের ভেতরে রয়ে গেছে, সে কাউকে বলতে পারেনি একথা, তাহলে নিজের নগ্নতা-অক্ষমতা প্রকাশ হয়ে যাবে সবার সম্মুখে। তবে যমুনাকে সে যতবারই দেখেছে—ততবারই তার মনে হয়েছে, যমুনা কারোর নয়, শুধু তার একার। এমন মনে হওয়ার যে কোন কারণ আছে তা নয় তবু তার মনে হয়েছে। ওর মুখটা মনে পড়লে অদ্ভুত রোমাঞ্চে সিরসিরিয়ে উঠেছে তার সর্বাঙ্গ। সে হেরে গেছে বারবার। এরজন্য কি যমুনার আগুন-রাঙা রূপই দায়ী? কাচবরণ মেয়েটির অভাব থাকলে-ও সে রূপের দিক থেকে ধনী, ঈশ্বর তাকে নিখুঁতভাবে সাজিয়েছে যেখানে যত্নের কোন অভাব নেই। টগর ফুলের চেয়েও যমুনার সাদা চোখের পাপড়িতে যে সরলতা এবং বিশ্বাস আছে—তা এ গ্রামের আর কারোর নেই। হাতে শাঁখা, লোহা আর বাহারী চুড়ি পরে সে অনন্যা, তার গোছান চিবুক পদ্মকলির চেয়েও মনোরম। পরস্ত্রী সম্পর্কে এমন ভাবনা রুচিকারক নয়, জটার হৃদয় তবু প্লাবিত হল যমুনাভাবনায়। নিজেকে সংশোধন করার চেষ্টায় মগ্ন হল সে, কিন্তু পারল না, যমুনা তার চিন্তার মধ্যে শরবতের চিনির মতো মিশে গেল। তখনই তার খোঁজে মহিম এসে দাঁড়াল সামনে। জটার চেহারা দেখে সে কিছুটা ঘাবড়ে গেল, অসময়ে জটা কেন কাছা পরেছে তার ব্যাখ্যা সে খুঁজে পেল না। জটা বাল্যকালের

বন্ধুকে দেখে বলল, আমার খবর তুই শুনিস নি বুঝি? পানিপারুল থেকে ভুষিমাল দোকানের মাল নিয়ে ফিরছিলাম। গোরুর গাড়িটা কী ভাবে যে পুকুরে পড়ে গেল এখনও বুঝতে পারছি না। গাড়ি ভর্তি মাল তো গেলই সেই সঙ্গে কেরোসিন তেলের টিনটাও উল্টে গেল। বলদ দুটোকে বাঁচানো যায় নি, ওরা গলায় রশি নিয়ে মরল। কার পাপে মরল জানি না তবে গাড়িতে তো আমি ছিলাম। বলদ মরার প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে আমাকে, তাই গলায় চাবি ঝুলিয়ে কাচা পরে ঘুরছি। পাঁচজন বামুনকে খাওয়াতে হবে কাল। এটাই রায় দিয়েছে গ্রামের মুরুব্বিরা। আমি তাদের রায় মাথা পেতে নিয়েছি। মহিম সব শুনল, শুনে কিছুটা অবাক হল সে। সত্যিই জটার এখন দুর্দিন। এসময় কি তার কাছে ধার-উধার চাওয়া ঠিক হবে? ভেবে পেল না সে, মন খারাপ করে দাঁড়িয়ে থাকল চুপচাপ। জটা হয়ত বুঝতে চাইছিল মহিমের মন, সে যেন কিছু হয়নি এমন গলায় বলল, তুই কার মুখে শুনে এলি? মহিম সত্যি কথাটাই বলল, তোর এসব ঘটনার আমি কিছু জানতাম না। আমি এখানে এসেছি নিজের দরকারে। তবে এখন, এসময় এগুলো বলা আমার উচিত হবে না। আমি যাচ্ছি। তুই সাবধানে থাকিস।

যাবি কোথায়? জোর করল জটা, মানুষের আপদ-বিপদ তো লেগেই থাকে। আমি ওসব নিয়ে আর ভাবছি না, যা হবার তো হয়েই গিয়েছে। বল, তুই কিসের জন্য এসেছিস?

আমার তো সেই একটাই দরকার। মহিম মলিন হাসল, যমুনা এখনও কাঁথি থেকে ফেরেনি। আমি তাকে আনতে যাব। আমার কাছে যাওয়া-আসার খরচ নেই।

ঠিক আছে আমি তোকে টাকা দেব। তুই যা। গিয়ে যমুনাকে নিয়ে আয়। ও এলে আমাকে খবর দিবি। আমি তখন তোর ঘরে যাব। সে আমাকে বারবার করে যেতে বলেছে। না গেলে খারাপ দেখায় তাই না বল?

জটার কথায় কোন মারপ্যাঁচ ছিল না, মহিম তার মনের কথা বলে ফেলল বন্ধুর কাছে, যমুনা না থাকলে ঘরটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। ফাঁকা ঘরে মন বসাতে পারি না, কষ্ট হয়। সেইজন্যই তো তোর কাছে ছুটে এসেছি।

জটা তাকে টাকা দিল, টাকা কটা গুনে নে। ফেরত দেবার জন্য ভাবতে হবে না। যখন সুসময় আসবে তখন দিবি। তোর কটা টাকার জন্য আমার কোন অসুবিধা হবে না।

বন্ধুর উদারতায় মন গেল মহিমের, তার মুখে কোন ভাষা নেই কৃতজ্ঞতা জানাবার, সে ঠোঁট ভরিয়ে হাসল, তারপর নেমে এল পথে। কটা টাকার উত্তাপ এত বেশি— ঘামছিল মহিম। আজ তাকে যে করেই হোক কাঁথি যেতে হবে। যমুনাকে সে এখন আনবে না, এখন আনলে তার সমূহ ক্ষতি হতে পারে। নিজের জালে নিজে জড়িয়ে যেতে পারে সে। ভেঙে যেতে পারে তার সংসার। ভুল বুঝে দূরে সরে যেতে পারে যমুনা। তখন তার কি হবে, সে কাকে নিয়ে থাকবে? কলজেটায় কে যেন নখ ঢুকিয়ে

দেয় এমন ভয়ে কুঁকড়ে যেতে থাকে মহিম। চোরপালিয়া বাজারের ধার দিয়ে আসার সময় বিড়ি কেনার প্রয়োজনটা উপলব্ধি করে সে। এক কাটা বিড়ি কেনে মহিম। জীবন মাস্টারও দোকানে এসেছে কিছু কেনাকাটা করার জন্য, মহিমের চোখে চোখ পড়তেই বলল, কোথায় ঘুরছিস, আর দোকানে আসিস না কেন?

বাজারে আসি কিন্তু তোমার দোকানে আসার সময় হয় না। মহিম অজুহাত দেখাল, তুমি ব্যস্ত মানুষ, সব সময় কাজ নিয়ে থাকো—তোমাকে বিরক্ত করা আমার উচিত নয়।

কিসের বিরক্তি। দোকানে কেউ এলে আমার ভাল লাগে। আমি মানুষ ভালবাসি।

সে আমি জানি। মহিম পালিয়ে বাঁচতে চাইল, জীবন মাস্টার তাকে ছাড়ল না, যমুনার প্রসঙ্গ টেনে বলল, বৌমাকে তো কদিন দেখছি না, কোথায় গিয়েছে নাকি?

মহিম ঢোক গিলল, কাঁথি গিয়েছে। আজকালের মধ্যে আসবে। আমি তাকে আনতে যাব।

সেই ভাল। বৌমাকে নিয়ে আয়। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাকাই ভাল। জীবন মাস্টার দাঁত বের করে হাসল, তোর খুড়িমাকে আমি কোনদিন নজরের বাইরে যেতে দিইনি। তোর খুড়িমাও আমাকে ছেড়ে একদিনের জন্য বাইরে থাকে নি। এ নিয়ে গাঁয়ে কত হাসাহাসি হয় আমরা তা জানি।

মহিম কি বলবে, তার কিছু বলার নেই—শুধু ঘাড় নাড়ে।

জীবন মাস্টার বলে, যা বেলা হল। কাঁথি যেতে গেলে বেলায় বেলায় যাওয়া ভাল। পথ অনেকটা—

ছাড়া পেয়ে স্বস্তির শ্বাস ছাড়ল মহিম।

ঘরে গিয়ে টিপ তালাটা লাগিয়ে সে কাঁথি যাবে এমন ভাবল। কিন্তু ঘর পর্যন্ত যেতে হল না তাকে, সুদাম দৌড়ে এসে খবর দিল, কাকা, কাকি এসেছে। তোমার ঘরে তালা দেওয়া, সেইজন্য আমাদের ঘরে বসে আছে। চল, কাকি তোমাকে ডাকছে।

ধড়াস করে ওঠে সুদামের বুকটা, সেই ভয়টা আবার এসে ঝাঁকিয়ে দেয় তাকে। যমুনা একা চলে এল কেন? তবে কি খবরটা কাঁথি পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে! যদি যায় তাহলে তার কি করণীয় এই ভেবে কপালের রেখাগুলো কুঁচকে গেল তার। দুরু-দুরু বুকে সে সুদামের সঙ্গে এল ঘর পর্যন্ত। যমুনা টুকি দিয়ে দেখল তাকে, তার রাঙা ঠোঁট আরো রাঙা হয়েছে, হাসিটাও কি মিষ্টি! মহিম নির্বাক চোখে দেখতে থাকল যমুনাকে, যত দেখে ততই যেন অবাক হয় সে, যমুনার সরল চোখের তারার সে কোন সন্দেহের কুটিল ধোঁয়া দেখতে পেল না, ফলে আশ্বস্ত হল সে। এগিয়ে গিয়ে বলল, তুমি না এলে আমি আজ কাঁথি যেতাম তোমাকে আনতে। জটার কাছ থেকে তাই টাকা উধার এনেছি।

মনে মনে প্রীত হল যমুনা, চোখের ভ্রূ বেঁকিয়ে বলল, আমি জানতাম তুমি ঠিক আসবে। ওখানে আমার মন ধরল না তাই একা একা চলে এলাম।

এই শরীরে তোমার একা আসা ঠিক হয়নি।

যমুনা চোখের দিকে তাকাল, মহিমের ভালবাসায় আপ্লুত হল সে। নিজেকে দেখল আর একবার। শরীরে এখনও তেমন কোন পরিবর্তনের আভাস ফুটে ওঠে নি। সে ভাবল—আগের মতই আছে। তবু যারা তাকে ভালবাসে, সবাই মনে করিয়ে দিতে চায়—সে অন্তঃসত্ত্বা। এই মনে করিয়ে দেবার মধ্যে যেন লজ্জা মিশে আছে, আর সেই লজ্জায় আরক্ত হয়ে ওঠে তার-ঠোঁট এবং পুরো মুখ। নিজেকে সামলে নিয়ে যমুনা বলল, আমার কি হয়েছে যে আমি একা আসতে পারব না? আমি তো আগের মতো আছি।

হ্যাঁ, তুমি আগের মত আছো। কিন্তু একটা ফারাক তো হয়েছে। মহিম রগড়ের গলায় বলল, আগে তুমি একা ছিলে, এখন তোমার ভেতরে আরেকজন বাড়ছে। তার তো যত্ন দরকার। তোমার যত্ন হলে তার যত্ন আপসেই হবে।

যমুনা আর কথা বাড়াল না, যোগমায়ার কাছে সম্মতি নিয়ে তারা ফিরে এল ঘরে। টিপতালা খুলে যমুনা ঘরে ঢুকতেই মহিম ছুটে গিয়ে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল যমুনাকে, আদরের বন্যায় তাকে ভাসিয়ে দিয়ে বলল, ক'দিন নেই অথচ মনে হচ্ছে কত বছর তুমি আমার কাছে নেই! কেন এমন হয় বলত? যমুনা হাসল, এটাই তো স্বাভাবিক। এটুকু আছে বলেই তো সংসার এত মধুর।

মহিমের আব্দার মেটাতে যমুনার হিমসিম খাওয়া দশা, হাঁপিয়ে ওঠে শাড়ি গুছিয়ে সে বলল, আর নয়, আবার আমাকে রাঁধাবাড়ার যোগাড় করতে হবে। তুমি যাও গা ধুয়ে এসো। খেয়ে-দেয়ে আমি একটু ঘুমাব।

জটার চন্দ্রায়ন শেষ হয়েছে, পাঁচজন ব্রাহ্মণকে সে গীতা এবং দানধ্যান করেছে। আপাতত সে শাপমুক্ত। নিজেকে কিছুটা হাল্‌কাবোধ করছে সে। সন্ধেবেলায় সে বাজারে ঘুরতে এসে মহিমের ঘরে এল খোঁজখবর নিতে। মহিম নয়, লম্ফো নিয়ে বাইরে এল যমুনা, জটাকে দেখে হাসতে-হাসতে বলল, রাস্তা ভুলে নাকি? আসো। সে তো ঘরে নেই। এগরা গিয়েছে। ফিরতে রাত হবে।

তাহলে আজ থাক। পরে আসব—। জটা ইতস্ততঃ করছিল।

যমুনা জেদ ধরল, আজ কি দোষ করল!

যার জন্য আসা সে যখন নেই—! জটার কথা শেষ হল না অভিমানে ফুলে উঠল যমুনা, ওঃ, আমি তাহলে কেউ নই, যত সম্পর্ক ওই বন্ধুর সাথে! ঠিক আছে, আমি আর কিছু বলব না—

জটা বাধ্য হল ঘরে ঢুকতে, মাটির ঘরে লম্ফোর শিস কালো সাপের চেহারা নিয়ে কাঁপছিল হাওয়ায়, স্বল্প আলোয় জটা যতটুকু দেখল সবখানে অভাবের চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে উঠল তার চোখে। এ ঘরে কোন তক্তাপোষ নেই বসতে দেওয়ার, ফলে একটা জীর্ণ মাদুর পেতে দিল যমুনা, খুবই আন্তরিকতার সঙ্গে বলল, বসো। আমি সরবত করে আনি।

সরবতের আর দরকার নেই। তুমি চুপচাপ বসো। আমি কটা কথা বলেই চলে যাব।

যমুনা কপট রাগ দেখিয়ে বলল, আমার কাছে বসতে বুঝি ভয় করে? আমি বাঘ-ভালুক নই যে খেয়ে নেব।

যমুনার কথায় লজ্জা পেল জটা, ইতস্তত গলায় বলল, একটা কথা বলি—যদি কিছু মনে না করো—

যমুনা নীরব থাকল কিছু সময়, জটা বলল, তোমাকে দেখলে আমার ভেতরে একটা কেমন হয়, মনে হয় তুমি আমার খুব কাছের মানুষ। কেন যে এমন হয় আমি কিছু বুঝি না, তবে ক'দিন থেকে তোমার চিন্তা আমার মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। কিছুতেই মন থেকে সরাতে পারছি না এই চিন্তাটাকে। তুমি আবার খারাপ ভাবলে না তো কথাগুলো বললাম বলে—

যমুনার সরস মুখের হাসিটা কেমন ফিকে হয়ে এল, কিছুটা গম্ভীর দেখাল তাকে, কপালের রেখাগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠল কি সব চিন্তা করে, জটার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে সে সশব্দে হেসে উঠল সহসা, বিয়ে করোনি, যদি বিয়ে করতে তাহলে এসব কিছু হোত না।

জটা কুঁকড়ে গেল সংকোচে, থতমত খাওয়া গলায় বলল, না, মানে আমার যা মনে হয়েছে তাই আমি বললাম। বলে হয়ত শান্তি পেলাম কিছুটা।

তুমি তো শান্তি পেলে কিন্তু আমার যে এখন জ্বালা—। যমুনা বাঁকা চোখে তাকাল, হাটে তুমি আমাকে পান খাওয়াতে চেয়েছিলে, আজ তুমি কি আমার হাতে সাজা পান খাবে?

পান খেতে আমার কোন 'না' নেই।

যমুনা গিন্নির মতো পান সেজে দিল জটাকে। পানটা নেওয়ার সময় যমুনার হাতের স্পর্শ পেল জটা, সে শিহরিত হল, মুগ্ধ চোখে তাকাল। পানটা মুখে পুরে জটা বলল, আজ আসি। রাত হচ্ছে। আমাকে আবার অনেক দূর যেতে হবে।

আবার এসো। তোমার প্রাণের কথা আমার প্রাণে ধরেছে। যমুনা আর কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু কথা আটকে গেল তার।

জটা বলল, মানুষের মনটা যে কী তা আমার জানা হল না। আমি তো এখনও আমার নিজের মনটাকে চিনি না। তবে তোমাকে আমি চিনেছি। তুমি ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো। তোমার কাছে বেশি এলে জ্যোৎস্নায় আমি ডুবে যাব। লোকে কু ভাববে। তোমার বদনাম হবে। আমি সেসব চাই না।

জটা চলে যাওয়ার পর ভীষণ একা বোধ হল যমুনার, নিজেকে নিয়ে তার ভাবনা শুরু হল। জটার চোখে সে আজ যে উচ্ছ্বাস দেখেছে সেখানে ছিল প্রেমের জোয়ার, পানকৌড়ি পাখির মতো যমুনা সেখানে ডুব দিলে থৈ পেত না। তবু মানুষ ডুব দেয় সঙ্গোপনে, নিজের বিপদকে ডেকে আনে নিজের ইচ্ছায়। যমুনার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল—এ কী ভাবছে সে। তার স্বামী আছে, ঘর সংসার আছে—তার এমন ভাবনা কখন-ই স্বাস্থ্যকর নয়, নিজেকে সাবধান করল সে তবু জটার কথাগুলো সে জাবর কাটতে থাকল মনে-মনে।

হাওয়ায় নিভে গেছে লম্ফো, অন্ধকারে নিজেকে আর দেখতে পায় না যমুনা, শুধু বুঝতে পারে তার খুব ঘনঘন নিঃশ্বাস পড়ছে, বুকের ভেতর ঢেঁকির পাড় দিচ্ছে অজানা এক আশঙ্কা—যা সে কাউকেই কোনদিন বলতে পারবে না। জটা নামের মানুষটা যদি কোনদিন তার ঘরে না আসে তাহলে সে বেঁচে যায়। জটা একটা আগুন, সে পুড়ে যেতে পারে।

অন্ধকার ঘরে একা একা বসে আছে যমুনা, হঠাৎ মহিমের পায়ের শব্দে সে সচকিত হয়ে উঠল। ঘরে ঢুকে মহিম বলল, লম্ফো জ্বালাওনি? অন্ধকারে বসে আছ তোমার ভয় করছে না।

ঘাবড়ে গেল যমুনা, এলোমেলো ভাবে বলল, লম্ফোটা বাতাসে নিভে গেল এইমাত্র। আর ধরাইনি। অন্ধকারটাই চোখে সয়ে গেছে।

দেশলাই জ্বেলে লম্ফো ধরাল মহিম, আমার আসতে একটু দেরি হয়ে গেল। যে কাজে গিয়েছিলাম তা আর হল কই? শুধু যাওয়াটাই সার হল—

যমুনা বলল, তুমি বসো, আমি পুকুরঘাট থেকে থালা বাসনগুলো ধুয়ে আনি তারপর খেতে বসব।

একা একা যাবে, আমিও তোমার সঙ্গে যাই।

না, না তুমি বসো। আমি যাব আর আসব। যমুনা থালা বাসন নিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। আজ তার সব কাজ এলোমেলো হয়ে গেল। সময়েরটা সময়ে করা হয়নি। অন্ধকারে চেনা পথ কোন ভয়ের নয় তবু ঘরের পেছনের তেঁতুলগাছটার কাছে এসে তার পা দুটো কেঁপে গেল হঠাৎ। চাপ চাপ অন্ধকারে কার যেন নিঃশ্বাস পড়ল, তার গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল ভয়ে, মুখে কোন শব্দ হল না, শুধু নীরব দৃষ্টিপাতে সে বুঝতে চাইল ঘটনাটা কি। অন্ধকারে যতটুকু দেখা যায়—যতদূর চোখ যায় সে কাউকে দেখতে পেল না আশেপাশে। ক'পা এগিয়ে ঘাটের কাছে এসে যমুনার টের পেল তার পেছনে কে যেন এসে দাঁড়িয়েছে, এবার রীতিমতন ভয় পেয়ে গেল যমুনা, সে চিৎকার করে উঠল, কে, কে ওখানে?

কোন সাড়া এল না কিন্তু ঘর থেকে লম্ফো হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল মহিম সঙ্গে সঙ্গে। যমুনার গলা দিয়ে কোন কথা সরছে না, দাওয়ায় লম্ফো নামিয়ে মহিম ছুটে এল যমুনার কাছে, তার গলা কেঁপে উঠল, কী হয়েছে, অমন ঘামছো কেন?

যমুনা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে, কোন মতে বলল, গঁড়া বুড়া!

মহিম ঘাবড়ে গেল, কোথায়?

যমুনার আর কথা বলার কোন ক্ষমতা নেই, তার হাত থেকে ঝনঝন করে খসে পড়ল এঁটো বাসন-কোসন। ঘামে পৃচ্ছিল হয়ে উঠেছে তার পুরো মুখখানা, চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসার উপক্রম। ঘাড় ঝুঁকে গেছে ডান দিকে, হাত দুটো এলোমেলো, পায়ে এক ফোঁটা জোর নেই শরীরটাকে ধরে রাখার, দু'চোখে অন্ধকার ভরে উঠতেই হঠাৎই তেঁতুলপাতার বিছানায় ভূপতিত হল যমুনা। পড়েই দাঁতে দাঁত লেগে গেল তার, মুখের দু'পাশে জমে উঠল গ্যাঁজরা। মহিম কী করবে কিছু বুঝে

উঠতে পারল না, হঠাৎ-ই সে যেন বুদ্ধিহীন হয়ে পড়ল। এভাবে কয়েক পলক কেটে যাবার পরই মহিম কোলপাঁজা করে নিজের বুকের কাছে তুলে ধরল যমুনাকে তারপর কাঁপা পায়ে এগিয়ে গেল ঘরের দিকে। মাদুরে যমুনাকে শুইয়ে দিয়ে চোখে-মুখে জল দিল সে। গামছা দিয়ে মুছিয়ে দিল মুখের ফেনা। তারপর দাঁত ছাড়াবার চেষ্টা করল আপ্রাণ। সফল হল। কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরল যমুনার কিন্তু সেই ঘোর লাগা বিহ্বল দৃষ্টিটা তার আর মেলাল না। মহিম ঝুঁকে পড়ল যমুনার মুখের উপর, এখন কেমন লাগছে? হঠাৎ তোমার কি হল? ভয় পেয়েছিলে বুঝি?

নিস্তেজ শোনাল যমুনার কণ্ঠস্বর, আমি কিছু জানি না। আমার খুব শীত করছে। গায়ে একটা কাঁথা চাপা দাও।

মহিম ভাঁজ করা একটা কাঁথা এনে মেলে দিল যমুনার শরীরে, আমি যাই বৌদিকে ডেকে আনি।

না, তুমি আমাকে একা ফেলে কোথাও যাব না। গঁড়া বুড়া আসবে। সে আমার গায়ে নিঃশ্বাস ছেড়েছে। কাতরে উঠল যমুনা, সে আমাকে ছাড়বে না। ডাকছিল নিয়ে যাবার জন্য। আঃ, কি ঠাণ্ডা তার হাত! বুড়াটা যে আমাকে খুব ভালবাসত। যমুনা ফ্যালফ্যাল করে তাকাল ঘরে চালের দিকে, ভয় পেয়ে গুটিয়ে গেল সে, ঐ দেখ, সে এখনও যায়নি, আমাকে দেখছে!

কোথায়? মহিম ঘরের চালের দিকে তাকাল, কেউ নেই তো! তুমি ভুল দেখছো।

ভুল নয় গো, আমি ঠিক দেখছি। সে আমাকে নিতে এসেছে।

অসংলগ্ন কথাবার্তা কিছুই বুঝতে পারছিল না মহিম। তার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যা এল সে তাই করল, একটা দাঁ এনে রাখল যমুনার মাথার কাছে। এমন বিপদে সে এর আগে কোনদিন পড়েনি। এসময় পাশে কাউকে পেলে ভাল হোত। কিন্তু যমুনাকে সে একা ছেড়ে যাবে কি করে? কাউকে যে চিৎকার করে ডাকবে-তেমন সাহস তার হল না। লম্ফোটা কিছু দূরে সরিয়ে রেখে সে যমুনার মাথার কাছে বসল। বাড়ির পেছনের তেঁতুলগাছটা বহু বছরের পুরনো। মহিম অভাবে পড়ে বিক্রি করে দিতে চেয়েছিল গাছটা। গ্রামের লোকের জন্য তা আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তবে এ পাড়ার সবাই জানে—গাছটা নাকি ভাল না। মাঝেমধ্যে ওখানে শকুন উড়ে এসে বসে। রাতে তাদের ডানা ঝাপটানর শব্দ শোনা যায়। তবে মহিম কোনদিন খারাপ কিছু দেখেনি। পুরনো তেঁতুল-গাছটাকে ঘিরে গ্রামে অনেক গল্পকথা ছড়িয়ে আছে। সেসব গল্প যমুনারও কানে গিয়েছে। এটা তার প্রতিক্রিয়া কিনা বুঝতে পারে না মহিম। সে যমুনার কপালে হাত ছোঁয়াতেই চমকে উঠল। হঠাৎ আসা জ্বরে থরথর করে কাঁপছে যমুনার, ঠোঁট নড়ছে। অস্বাভাবিক লাল হয়ে উঠেছে সাদা চোখের জমি। চোখের কোনে টলটল করছে অশ্রুকণা। কথা বলার ক্ষমতা নেই তার তবু সে যেন কিছু বলতে চাইছে কড়ি বাঁশের দিকে তাকিয়ে।

॥ আট ॥

বিষণ্ণ সকালে যমুনার অসুস্থতার খবরটা কানে গেল যোগমায়ার। মহিম-ই এসে খবর দিল তাকে। তখনও সূর্যের আলো ভাল মত প্রকাশ হয়নি। মহিম যমুনাকে একা রেখে চলে এল যোগমায়ার কাছে। এত সকালে মহিমকে দেখবে আশা করেনি যোগমায়া। সে গোবরের ছড়া দেওয়া থামিয়ে শুধোল, কী ব্যাপার ঠাকুরপো? কোন দরকার আছে বুঝি?

মহিম কীভাবে কথা শুরু করবে ভেবে পেল না, ভয় তার বাকরুদ্ধ করে দিয়েছে, তার উপর সারারাত ঘুম নেই। যমুনাও দু-চোখের পাতা এক করেনি ভয়ে। মাঝে মাঝেই সে গঁড়াবুড়ার কথা বলেছে বিচিত্র স্বরে। জ্বরে আবোল-তাবোল ভুল বকেছে। এক সাগর চিন্তায় তলিয়ে গেছে মহিম। তার চোখের পাতা কেঁপে উঠেছে বারবার। যমুনার হঠাৎ এই পরিণতি তাকে ভীষণভাবে ভাবিয়েছে, কী করবে কিছু বুঝে উঠতে পারেনি। সে ভেবে রেখেছে—সকাল হলেই যে যমুনাকে গাঁয়ের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে। আগে তো জ্বরের ওষুধ দেওয়া দরকার, তারপর অন্য কিছু ভাববে সে। কিন্তু সবার আগে যোগমায়ার পরামর্শ তার প্রয়োজন। এসব কাজে সে যোগমায়ার মতামতকে গুরুত্ব দেয়।

যোগমায়ার প্রশ্নের জবাবে মহিম বলল, আমার খুব বিপদ বৌদি। কালরাতে আমি যখন এগরা থেকে ফিরলাম—তখনও যমুনা ভালই ছিল, কিন্তু পুকুরে থালা বাসন ধুতে গিয়ে সে ফিট হয়ে পড়ে গেল। তেঁতুলতলায় আমি গিয়ে দেখি সে ভীষণ ঘামছে, ঠিক মতন কথা বলতে পারছে না। কিছু বুঝে ওঠার আগেই সে জ্ঞান হারাল, দাঁতে দাঁত লেগে গেল। ওকে আমি ঘরে আনলাম। ও জ্যাঠার কথা বারবার করে বলছিল। জ্যাঠা নাকি ওকে দেখা দিয়েছে। ঘরের চালায় ও জ্যাঠাকে দেখছে। তারপর থেকে ওর গায়ে ধূম জ্বর। কাল সারারাত আমরা কেউ ঘুমাইনি। খাওয়া-দাওয়াও হয়নি। আমি খুব সমস্যায় পড়েছি বৌদি, কী করব মাথায় ঢুকছে না।

যোগমায়া গোবর জলে ভর্তি হাতটা মুছে নিল খড়গাদায়, চিন্তায় বিষণ্ণ হয়ে উঠল তার মুখখানা, কাল রাতে আমাকে খবর দাওনি কেন? তোমার দাদা তো গাঁ ঘুরতে বেরিয়ে গেল। সে থাকলে একটা কথা ছিল। আমি কি বলব বলতো তোমাকে? আমার মনে হয় যমুনা ভয় পেয়েছে। ভয়ে ওর জ্বর এসেছে। তুমি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও—সব ঠিক হয়ে যাবে।

ডাক্তারের কাছে যমুনার হেঁটে যাওয়ার ক্ষমতা নেই। ও উঠে বসতেও পারছে না।

তাহলে ডাক্তারকে ঘরে ডেকে আনো। ডাক্তার মহাপাত্র ভাল মানুষ। তাকে খবর দিলে সে ঠিক সময় করে চলে আসবে। তুমি ঘাবড়ে যেও না। এখন ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করতে হবে। যোগমায়া বোঝাল, পোয়াতী মেয়েমানুষের একা একা ঐসময়

পুকুরে ঘাটে যাওয়া ঠিক হয়নি। তুমি ওকে যেতে দিলে কেন? সঙ্গে যেতে পারতে।

আমি মানা করে ছিলাম কিন্তু ও জোর করে চলে গেল।

চুল বাঁধা ছিল না খোলা ছিল?

যোগমায়ার প্রশ্নে ভাবল সুদাম, তারপর নিষ্প্রভ গলায় বলল, ছাড়া চুলে ও বাইরে গিয়েছিল। কেননা মাথায় জল দেবার সময় ওর চুলগুলো সব ভিজে যায়। পরে আমি গামছা দিয়ে মাথাটা ভাল করে মুছিয়ে দিয়েছি। মাথায় জলপট্টিও দিয়েছি তবু জ্বর কমছে না।

ঠিক আছে, তুমি এখন ডাক্তারের কাছে যাও। আমি হাতের কাজ সেরে যাচ্ছি। দেরি করো না বৌদি, তোমার একবার যাওয়া দরকার। হয়ত তোমাকে দেখলে ও ঠিক হয়ে যাবে। মহিম গভীর আস্থা ভরা চোখে তাকাল।

সূর্যের আলো এসে পড়েছে উঠোনে, কলাপাতায় নরম রোদ হামাগুড়ি দেয়, কিছু দূরের পথে একটা ছাগল-ছানা ডাকতে ডাকতে চলে যায় মাঠের দিকে। মহিম আর সময় ব্যয় করল না, সোজা চলে এল ঘরে। দূর থেকে সে একবার যমুনার দিকে তাকাল, কিন্তু কথা বলল না। যমুনার সঙ্গে কথা বললেই মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে তার। ঘরে ঢুকে জামাটা গায়ে গলিয়ে নিল সে। মহাপাত্র ডাক্তারের ঘরে তাকে যেতে হবে। যত তাড়াতাড়ি যাওয়া যায় ততই মঙ্গল। দেরি করলেই বিপদ। মহিমের চিন্তার সর্বস্য ঘিরে এখন যমুনা।

মহাপাত্র ডাক্তারের চেম্বারটা মাটির ঘর। একটা টেবিল, কাঠের চেয়ার আর দুটো বেঞ্চি পাতা সামনে, রোগীরা এলে সেই বেঞ্চিতেই বসে। ঘরটায় আলো ঢোকে না ভাল মতন, হাওয়া বাতাসও খেলে না, ফলে পুরো ওষুধের নাক ঝাঝাল গন্ধ। এত সকালে রোগীর সংখ্যা কম, মহিম বেঞ্চিতে না বসে ডাক্তারবাবুর সামনে গিয়ে দাঁড়াল, আমার ঘরে আপনাকে একবার যেতে হবে। বউটার জ্বর কাল রাত থেকে। ভুল বকছে।

ডাক্তার মহাপাত্র চশমা নাকের উপর তুলে তাকালেন, আমি তো এখন ডাক্তারখানা ছেড়ে যেতে পারব না, যদি পারি দুপুরের দিকে যাব। তুমি এখন ওষুধ নিয়ে যাও। এক ডোজ খাইয়ে দিও। ভাল হয়ে যাবে।

মহিম ডাক্তারবাবুর কথায় খুশি হল না তবু সে বলল, একটু তাড়াতাড়ি গেলে ভাল হয়। যমুনার অবস্থা আমি ভাল বুঝছি না।

এত যদি তাড়াহুড়ো তাহলে এগরায় নিয়ে যাও। রোগী ফেলে আমি তো যেতে পারি না। সেটা ভাল দেখায় না।

মহিমের মনে মেঘ ঢেকে এল। সময় খারাপ হলে অনেক কথাই শুনতে হয়। যতটুকু সহানুভূতি সে ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে আশা করে ছিল, তা না পাওয়াতে দুঃখের পাল্লাটা বুকে গেল। যমুনাকে এগরা হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারলে ভাল হোত। কিন্তু এগরা নিয়ে যাওয়া তো মুখের কথা নয়। এত টাকা পয়সা তার কোথায়? মহিমের বাবা মহাদেব যেদিন মারা গেল সেদিনও ঘরে ছিল না সে। কি কাজে যেন

কাঁথি গিয়েছিল। দু'দিন পরে ঘরে এসে শুনল মহাদেবকে বুড়ো বটগাছতলায় ঘোড়ানাগ সাপ কেটেছে। ওঝা গুণিন সব বিফলে গেল। এমন কী ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ থেকে গুণিন এনেছিল পাড়ার লোকে। ময়ূরভঞ্জের গুণিন দেখে শুনে হাতই লাগাল না মহাদেবের শরীরে, দূর থেকে দেখে নিয়ে বলল, এ রোগী অনেক আগেই মারা গেছে। তবু শেষ চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। আমি তিন খানা মন্ত্রপড়া সর্ষে দিচ্ছি। এই তিনটে সর্ষে রোগীর ব্রহ্মতালুতে ফুটো করে ঢুকিয়ে দিতে হবে। যদি জান থাকে তো এই তিন সর্ষের জোরে রোগী খাড়া হয়ে দাঁড়াবে। যদি না দাঁড়ায় জলে ভাসিয়ে দিও নয়ত মাটিতে পুঁতে দিও। আর কিছু করা যাবে না।

ভরত দাঁ দিয়ে মাথার তালু ফুটো করে তিনটে সর্ষে ঢুকিয়ে দিয়েছিল কায়দা করে। ছ' ঘন্টা পরে রোগী যখন চোখ মেলল না তখন আশা ছেড়ে দিল গ্রামের লোকে। সবাই চাইছিল মহিম ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা হোক। কিন্তু ততক্ষণে পচন শুরু হয়েছে মহাদেবের, গন্ধ ছুটছে বাতাসে যা ধূপবাতি জ্বালিয়েও শেষ রক্ষা করা গেল না। কাঁথিতে মহিমের খোঁজে যে গিয়েছিল সেও ফিরে এল না খুঁজে পেয়ে। অগত্যা মাটি খুঁড়ে বিলমাঠে পুঁতে দেওয়া হল মহাদেবকে। মহিম যখন ফিরে এল গাঁয়ে তখন মহাদেবকে কবর দেওয়া দু'দিন হয়ে গেছে। বাপ অন্ত মহিম সেই শোক এখনও ভুলতে পারেনি। কেঁদে-কেটে অস্থির হল সে। বুক চাপড়াল। মূর্চ্ছা গেল ঘন ঘন। রাত গাঢ় হতেই সবাই যখন চলে গেল যে যার ঘরে তখন মহিম একাই চলে গিয়েছিল মহাদেবের নির্জন কবরের ধারে। তার হাতে কোদাল। কবর থেকে মরা বাপকে তুলে সে দেখবে। সেই মত শ্যাকুলের কাঁটা সরিয়ে সে খুঁড়তে লাগল কবর। পাগলের মতো এলোমেলো চলতে লাগল হাত। কোপে-কোপে মাটি ছোটে এদিক-সেদিক। ঘাম ঝরে। হাঁপিয়ে ওঠে মহিম। ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো তার গোঁ, কবর থেকে তুলে মরা বাপকে সে দেখবেই। জ্যোৎস্নায় ধবধব করে ধান মাঠ, মেঠো হাওয়া গায়ের ঘাম শুকাতে পারে না, শুধু ঘনঘন নিঃশ্বাস পড়ে মহিমের। তার পাগল কাণ্ডকারখানা দেখে ছুটে আসে গ্রামের লোক। ভরত তার হাত থেকে জোর করে কেড়ে নেয় কোদাল, ভৎর্সনা করে বলল, তুই কি পাগল হলি মহিম? ভাগ্যে না থাকলে মরার সময় জল পায় না অনেকে। তোর ভাগ্যে ছিল না তাই বাপের মুখ দেখতে পেলি না। বাপ-মা চিরকাল কারোর থাকে না। ডাক আসলে সবাইকে একদিন চলে যেত হয়। বাপের মরা মুখ দেখতে পাসনি বলেই কি কবর থেকে টেনে তুলবি তাকে? যে গিয়েছে সে আর ফিরে আসবে না। তার আত্মা যাতে শান্তি পায় মা শীতলা বুড়ির কাছে সেই কামনা কর। মহিম অবুঝ কান্নায় ভেঙে পড়লে ভরত তার ঘাড়ের উপর আলতো হাত রাখে, সহানুভূতির গলায় বলে, ঘর চল। অবুঝ হোস নে। ঘোড়ানাগ সাপে কামড়ালে সে মানুষ কোনদিন আর বাঁচে না। চল, ঘরে চল।

সেদিনের দৃশ্যগুলো চোখের সামনে ভেসে ওঠে মহিমের, আজও কি সে ভুলতে

পেরেছে সেই মর্মান্তিক দৃশ্য। একলা থাকলে ঘুরে ফিরে মনে পড়ে বাবার কথা, তখন বিষণ্ণতায় ছেয়ে যায় তার হৃদয়-আকাশ। ভেতরে-ভেতরে ফুঁপিয়ে ওঠে মহিম।

ভরত গাঁ ঘুরে ফিরছিল, তার সাথে দেখা হল মহিমের। আজকাল ভরত তাকে এড়িয়ে চলে নানা কারণে। এর একটা কারণ সে গরীব। হঠাৎ করে যদি ধার চেয়ে বসে সে—এইজন্য। তবু মহিম জোর করে বলল, ভরতদা, আমি তোমার ঘরে গিয়েছিলাম সকালে। আমি যাওয়ার আগেই তুমি গাঁ ঘুরতে চলে গেছ। আজ তোমাকে আমার ভীষণ দরকার। ঘর যাওয়ার পথে একবার আমার ঘরে তোমাকে যেতে হবে। যমুনা তোমার বাপের ছায়া দেখছে কাল থেকে। ভয়ে তার গায়ে ধূমজ্বর। আমি একা সামলাতে পারছি না। আমার মনে হয় ওর গায়ে বদ হাওয়া লেগেছে। তুমি একটু ঝাড়-ফুঁক করে দিলে মনে হয় সুস্থ হয়ে যাবে। ভরত এড়িয়ে যেতে চাইল, ক্ষিদেয় আমার পেট জ্বলছে। সেই কোন সকালে মুড়ি আর জল খেয়ে বেরিয়েছি। শরীর আর চলছে না। তবু তুই যখন বলছিস—যেতে তো হবেই।

ঘরের ভেতর যমুনা মৃতবৎ মাদুরের উপর শুয়ে। শক্ত বালিশটার উপর ছড়িয়ে ছিল তার এলো চুল, চোখের তারা চঞ্চল। চোখে-মুখে বিপন্নতার চিহ্ন। ভয় ডানা মেলে শুয়েছিল তার পুরো শরীরের উপর, এলোমেলো কাপড়ে ঝড়ের চিহ্ন। কাল রাতের ঘটনা এখনও মন থেকে মুছতে পারে নি যমুনা। চাহনিতে ধরা পড়ছিল সেই ভয়। মাঝেমাঝে চমকে উঠছিল সে। ঘরের আলো-আঁধারীতে যমুনার শুয়ে থাকার ভঙ্গিটাই এক ভয়াবহ দৃশ্য।

ভরত গিয়ে যমুনার তিন হাত দূরত্বে বসল। গলা খেঁকারি দিয়ে সে বলল, কী হয়েছে তোমার? ভয় বুঝি মানুষে পায় না! উঠে বসো। জ্বরজ্বালা সব ভাল হয়ে যাবে।

যমুনার উঠে বসার চেষ্টা করল কোনমতে, কিন্তু পারল না। তার বসতে অসুবিধা হচ্ছে দেখে মহিম এগিয়ে পিঠে হাত রাখল যমুনার। ভরত যমুনার দিকে বাজপাখির চোখে তাকাল, শাসন করার গলায় বলল, তোমার কিছু হয়নি, তুমি ভাল হয়ে যাবে। মনের জোর হারিও না। মনের জোরটাই হল বড় কথা।

যমুনা শুনছিল, হঠাৎ সে অস্বাভাবিক গলায় চেঁচিয়ে উঠল, তুই এখান থেকে যাবি না লাথ মেরে বের করব তোকে। আমার মরার সময় তুই টাকার জন্য পরীযান নিয়ে দীঘায় গেলি। তোর এত টাকার লোভ? ছ্যা-ছ্যা, তুই আমার ছেলে পরিচয় দিতে ঘেন্না হয়। যা আমার সম্মুখ থেকে পালা। তোর মুখ আমি দেখতে চাই না।

যমুনা হাঁপাচ্ছিল। অবিকল গঁড়া বুড়ার গলায় সে ধমকে উঠল ভরতকে। মহিমকে ভরত ইশারা করতেই বাইরে বেরিয়ে এল সে। জাড়াগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ভরত বলল, এ রোগ আমার ওষুধে সারবে না। তুই এগরার কালু গুণিনকে ডেকে আন। যমুনার অবস্থা আমি ভাল বুঝছি না। যা করার তাড়াতাড়ি করিস। যত সময় যাবে তত খারাপের দিকে চলে যাবে কেসটা। মহিম ঘাবড়ে যাওয়া চোখে তাকাল, পেটে

ছানাপোনা আছে, তার কোন ক্ষতি হবে না তো?

বদ-হাওয়া লেগেছে তাতে ছানা পোনার ক্ষতি হবে কেন? ভরত বলল, তোকে যা বললাম তাই কর। এগরা যদি নিজে না যেতে পারিস তাহলে ভাড়া দিয়ে পাড়ার কাউকে পাঠিয়ে দে। সবাই কালু গুণিনের ঘর চেনে। ঠিক ডেকে আনবে। মহাপাত্র ডাক্তারের ওষুধেও জ্বর ছাড়ল না যমুনার। কালু গুণিন বলল, এ বড় জটিল কেস, আমার দ্বারা হবে না। বড় কেউ থাকলে ডেকে আনো। পারলে ময়ূরভঞ্জ লোক পাঠাও। ওখানে অনেক বড় বড় গুনিন আছে, তারাই পারবে বউটার রোগ সারাতে।

যোগমায়া মহিমের পাশে দাঁড়িয়ে শুনছিল কথাগুলো, বিরক্তিতে ভরে উঠল তার মন, ঠাকুরপো, তোমার কোথাও যাবার দরকার নেই। যমুনাকে তুমি কাঁথি কিংবা এগরা হাসপাতালে নিয়ে যাও। জ্বর ছাড়লে ওর সব অসুখ ভাল হয়ে যাবে। ছ'সাতদিন সময় তো নষ্ট হল। আর দেরি না করে ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করো। যতদিন যাচ্ছে ততই কাহিল হয়ে যাচ্ছে মেয়েটা। এক সময় নাগালের বাইরে চলে গেলে আর কিছু করার থাকবে না।

কালু গুণিন ফিরে যাবার সময় একটা কথা বলে গিয়েছিল, আর সেই কথাটাই মনে গিঁথে গেছে মহিমের। কালু গুণিন পুরো পাড়ার সামনে বলে গেল, ঐ বুড়া তেঁতুল গাছটাই যত নষ্টের গোড়া। ওখানে ভূত-প্রেত্নীর আখড়া। শুধু তাই নয়-একটা জেদী ভূত আছে ওখানে। রাতে আঁধারে যখের গায়ে পা দিয়ে দিয়েছে যমুনা। সে ওকে এত সহজে ছাড়বে না। যখ না হয়ে যদি সাধারণ ভূত হোত আমি তাকে ছেড়ে যেতে বাধ্য করতাম।

দোটানায় পড়ে গেছে মহিম। সে ডাক্তার দেখাবে না গুণিন দেখাবে—এই নিয়ে ভাবতে ভাবতে তার অনেক সময় চলে গেল। যোগমায়া তিতি-বিরক্ত হয়ে মহিমকে বলল, তুমি বউটাকে না মেরে আর দম নেবে না! যমুনা যদি মরে তো তোমার অবহেলার জন্য মরবে। যে পুরুষমানুষ সিদ্ধান্ত নিতে পারে না সে তো স্রোতের মুখে একটা জলোঘাস। তোমার যদি টাকা না থাকে এই চুড়িগুলো স্যাকরা দোকানে বাঁধা রেখে টাকা আন। ভাল ডাক্তার দেখাও। সব ঠিক হয়ে যাবে।

অবশেষে আরও তিন দিন ঘরে রেখে যমুনাকে এগরা হাসপাতালে ভর্তি করাল মহিম। ডাক্তারবাবু যমুনাকে পরীক্ষা করে বললেন, অনেক দেরি হয়ে গেছে। আশা কম। তবু আমরা চেষ্টা করে দেখব।

হাসপাতালে মাত্র দু'দিন থেকে চোখ বুজল যমুনা। সে যখন শেষ নিঃশ্বাস ছাড়ল তখনও তার পাশে ছিল না মহিম। মৃত্যুর আগে যমুনা তাকে বলেছিল, আমি আর থাকব না। আমার মন করছে তোমার বন্ধু জটাদাকে একবার দেখতে। সে আমাকে খু-উ-ব ভালবাসত। তার কতগুলো কথা আমি যে কিছুতে ভুলতে পারছিনে। যদি পার তো তাকে একবার আমার কাছে আনো। তাকে বলো—আমি দেখতে চেয়েছি।

এক রহস্যের মধ্যে মহিম ফিরে এসেছিল গাঁয়ে। জটাকে সব খুলে বলতেই সে

বলেছিল, চল, আমি এখনই যাব। যমুনাকে যে করেই হোক বাঁচাতে হবে। তাতে যত টাকা লাগে আমি দেব। দরকার হলে কাঁথি হাসপাতালে নিয়ে যাব তাকে।

জটা, মহিম কেউ-ই যমুনার মৃত্যুর সময় উপস্থিত ছিল না।

হাসপাতালের দিদিমনি বলল, বউটা মরার সময় দু'জনকে খুব খোঁজ করেছে। জটা কে? তার কথা বারবার করে বলছিল।

জটা জল ভরা চোখে মুখ নীচু করে শুনল দিদিমণির কথাগুলো, তার মুখে কোন কথা নেই, সে থরথর করে কাঁপছিল শোকে। মহিম কান্নায় ভেঙে পড়ল জটার গায়ের উপর, বিলাপের সুরে বলল, বাবাকেও দেখতে পাইনি মরার সময়, যমুনাকেও পেলাম না! কপাল চাপড়ে মহিম বলল, আমার সব চলে গেল! আমি কার জন্য বাঁচব বল তো জটা? যে আমাকে সব চেয়ে বেশি ভালবাসত সেই-ই তো আর থাকল না। গাছও গেল, ফলও গেল! এ শোক আমি ভুলি কেমন করে?

জটা কি সান্ত্বনা দেবে মহিমকে, সে-ও ভেঙে পড়ল শোকে।

গাঁয়ে আনা হল যমুনার মৃতদেহ। তাকে দেখার জন্য ভেঙে পড়েছে গ্রাম। সবার ভয়ার্ত চোখ ঐ বুড়ো তেঁতুলগাছটার দিকে। অনেকেই বলাবলি করল, ঐ তেঁতুল গাছটা নাকি মহাদেবকে খেয়েছে, মহিমের মাকেও খেয়েছে। এত খেয়েও তার পেট ভরেনি। শেষে কী না পোয়াতী বউটাকে খেল!

সবার যতরাগ ঐ তেঁতুলগাছটার উপর।

শ্মশানে দাঁড়িয়ে মহিম শুনছিল অভিশপ্ত তেঁতুলগাছের কাহিনী। পুরনো তেঁতুলগাছটা তার জীবনে শোকের মহাকাল। দপদপ করছিল মহিমের কপাল। সে চিৎকার করে বলল, তোমরা চুপ করো। আমি শুনতে পারছি না।

যমুনাকে ন্যাঙা করে ঘি মাখানো শেষ। এবার তাকে চিতায় তোলা হবে। তখনই জীবন মাস্টার কোথায় থেকে ছুটে এল, হন্তদন্ত হয়ে বিচার পেশ করল, এক চিতায় দু'জনকে দাহ করা নিষেধ আছে।

থেমে গেল শবযাত্রীদের কলবর। এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

ভরত সাহস নিয়ে শুধোল, তাহলে কি করতে হবে?

জীবন মাস্টার নির্দয় ভাবে বলল, মা আর সন্তানকে আলাদা করা প্রয়োজন। যমুনার পেটে সন্তন আছে। ওটাকে কেটে বার কর। তারপর ওকে চিতায় তোল। ক্রিয়াক্রম কর। তার আগে কিছু করা উচিত হবে না।

কথাটা মনে ধরল সবার। এক বাক্যে জীবন মাস্টারের কথা মেনে নিল সবাই। বয়স্ক মানুষকে অমান্য করার সাহস কারোর নেই। অবশেষে ঠিক হল মহিম নয় জটাই পেট কেটে বের করবে যমুনার সন্তান। তারপর তাকে রাখা হবে মাটির হাঁড়িতে। সেই হাঁড়িসমেত কবর দেওয়া হবে ভ্রূণ-শিশুকে।

ধারাল দাঁ হাতে এগিয়ে গেল জটা, ভয়ে তার হাত কাঁপছে থরথরিয়ে। কোনমতে যমুনার পেট কেটে ক্ষত-বিক্ষত ভ্রূণ-শিশুটিকে বের করে আনল সে। দু'হাত এমন

কি বুক-পেট তার রক্তে মাখামাখি। কাজ শেষ করে জটা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। ওকে ধরে ধরে ঘাটে নিয়ে গেল শবযাত্রীরা। কজন লেগে গেল ভ্রূণ-শিশুটিকে কবর দেওয়ার জন্য।

জ্বলে উঠল চিতা দাউদাউ। মাত্র ঘন্টা দেড়েকের মধ্যে পুড়ে ছাই হয়ে গেল যমুনা। তার অস্থি জলে বিসর্জন দিয়ে ডাঙায় উঠে এল মহিম। এ নৃশংস দৃশ্য সে দেখতে পারেনি, চোখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল। তবে দৃশ্যটা কল্পনা করে শিউরে উঠল সে। এমন দৃশ্য তাকে জীবনে দেখতে হবে স্বপ্নেও ভাবেনি। মহিমের কাঁধে হাত রেখে জটা বলল, আজ আমি যা করলাম এ কাজ পৃথিবীতে আর কেউ হয়ত করবে না! আমাকে ক্ষমা করে দে মহিম। আমি তোর সন্তানটাকে ঐ ঢিপি ডাঙায় পুঁতে দিয়ে এসেছি।

মহিম নির্বাক চোখে তাকাল। চোখের যত জল ছিল সব তার ঝরে ঝরে শেষ। শবযাত্রীরা যে যার ঘরে ফিরে গেলে মহিমও ফিরে এল তার ঘরে। ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছটার দিকে তাকিয়ে রাগে সে ফেটে পড়ল। অথচ তার কিছুই করার নেই। তার হাত-পা বাঁধা। কালু গুণিনের কথা বারবার করে মনে পড়ল। যদি কালু গুণিনের কথা সত্যি হয় তাহলে গাছটার একটা বিহিত করা দরকার।

পরের দিন তেঁতুলগাছের মোটা গুড়িতে কুড়ুল পড়ল বারবার। জলের দরে টালি-কারখানার বাবুকে গাছটা বিক্রি করে দিয়েছে মহিম। গাছটা বিক্রি করে সে খানিকটা মনের জ্বালা জুড়িয়েছে। গাছকাটার শব্দে যোগমায়া ছুটে এল তার ঘর থেকে। মহিমকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলল, এটা তোমার মানুষের কাজ হল না ঠাকুরপো! একটা গাছ কী দোষ করতে পারে—আমার মাথায় ঢুকছে না।

তুমি চুপ কর বৌদি, আজ আমি তোমার কথা শুনব না। কেউ-ই যখন থাকল না তখন ঐ গাছটা থেকেই বা কি হবে? আমার টাকার দরকার, বেচে দিলাম। মহিম উন্মাদের গলায় বলল কথাগুলো।

অপমানিত যোগমায়া ফিরে গেল মুখ ঝুকিয়ে।

গাছ বিক্রির টাকায় ভরপেট মদ গিলেছে মহিম, সুদাম টলমল মহিমকে দেখে ভয় পেয়ে ছুটে এল ঘরে, মা, মা। কাকা না মদ খেয়ে পড়ে আছে রাস্তার ধারে। তুমি দেখবে চলো মা—

না, আমি আর যাব না। যোগমায়া মুখ ঘুরিয়ে নিলেও আধ ঘন্টা পরে না থাকতে পেরে সে সুদামকে সঙ্গে নিয়ে মহিমের কাছে গেল। মহিমের কথা বলার ক্ষমতা ছিল না। তাকে কোনমতে উঠিয়ে হাত ধরে ঘরে নিয়ে এল যোগমায়া। তেঁতুলগুলা খাওয়াল। কিছুক্ষণ পরে হড়হড়িয়ে বমি করল মহিম। বিশ্রী গন্ধে ভরে গেল ঘরের উঠোন।

পরদিন সকালে মহিম সুস্থবোধ করতেই যোগমায়াকে বলল, বৌদি, আমি আর এ গাঁয়ে থাকব না। এ গাঁ আমার জন্য নয়। এখানে থাকলে যমুনার কথা আমি এ জীবনে ভুলতে পারব না। ওর শোকে আমি হয়ত পাগল হয়ে যাব।

কোথায় যাবে তুমি? শুধোল যোগমায়া।

মহিম তাচ্ছিল্য ভরে বলল, যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাব। আর আসব না কোনদিন? কেন আসব? যে মাটি আমাকে কাঁদায়, তার সঙ্গে আমার আর কোন বোঝাপড়া নেই।

রাগ করে জন্মভিটে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে?

না গিয়ে উপায় নেই, বৌদি। আমার মন চাইছে—আমি যাবই। এতদিন যমুনার ভালবাসায় আটকা পড়ে গিয়েছিলাম। আর নয়, এবার যাব—

মহিম চলে যাচ্ছে মেঠো আল ধরে। কোথায় যাচ্ছে সে, নিজেও জানে না। হঠাৎ বাস রাস্তার দিকে ঘুরে গেল সে। দ্রুত পায়ে হাঁটতে গিয়ে বাঘ দেখার মতো চমকে উঠল সে। তার রাস্তা আঁকড়ে দাঁড়িয়ে আছে মালার মা অহল্যা। তার ছাড়া চুল, উগ্র চাহনি, প্রতিহিংসায় ধকধক করছে চোখের তারা। শাড়ির আঁচলে মুখ মুছে নিয়ে অহল্যা বমি করার মতো মুখ করে বলল, তোমার খবরটা শুনে আমি না এসে থাকতে পারলাম না। আমাকে, আমার মালাকে তুমি অনেক কাঁদিয়েছ। তার শাস্তি তো তোমাকে পেতেই হোত। এত তাড়াতাড়ি যে শাস্তিটা পাবে বুঝতে পারিনি। উপরে এখনও চাঁদ-সূর্য ওঠে। তারা সব দেখেছে। তারাই বিচার করে দিল। আজ রাতে আমার ভাল ঘুম হবে। আমার মালার আত্মাও শান্তি পাবে। মরা গাছের মতো দাঁড়িয়ে থাকল মহিম। তার দু'চোখে অনুশোচনার অশ্রু। হঠাৎ-ই অহল্যার পায়ে লুটিয়ে পড়ল মহিম, মা, আর তুমি আমাকে শাপ দিও না। যদি পার তো ক্ষমা করে দিও। না পারলে শাপ দাও—আমি যেন ওদের কাছে ফিরে যেতে পারি।

॥ নয় ॥

এগরা থেকে দু ভাগ হয়ে রাস্তা চলে গেছে দু'দিকে। একটা শর্ট রুট কুদি চোরপালিয়া পানিপারুল হয়ে দীঘা। অন্যটা সাতমাইল কাঁথি রামনগর হয়ে দীঘা। দুটো পথ এক হয়েছে রামনগরে। বাস রামনগর না ছুঁয়ে দীঘা যাবে কি করে? এই সামান্য ভূগোলটাও বুঝতে পারে না সুদাম। ভরত রেগে মেগে বলে, তুই কি গাধা ছিলিস আগের জন্মে?

হা করে ভ্যালভেলিয়ে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে সুদাম। তার রোগা প্যাংলা শরীরটায় জোর নেই এক ফোঁটা। যেন তাকাতেও কষ্ট হয় তার। গা-গতরে একটুও মাংস নেই অথচ বেতগাছের মতো একডেলে হয়ে গেছে তার শরীর। ভরত প্রথম প্রথম ভেবেছিল, এই ছেলেও তার গলার মাদুলি হয়ে ঝুলবে সারা জীবন। বয়স যত বাড়ল সুদামের শরীর লম্বাটে চোঙা হল কিন্তু সেই অনুপাতে বুদ্ধি বাড়ল কই! মীরা তো ছোটো থেকেই মাথা মোটা চ্যাং। গ্রামের সবাই তাকে বলে পাগলী।

কিন্তু সুদামকেও পাগল বলে না এই যা রক্ষে। সুদাম মীরার মতো কখোনো টো-টো করে গ্রামে ঘোরে না, সে ঘরেই থাকে, সাত চড়ে রা কাড়ে না। এত নির্জীব মানুষ মৌনতায় পাথর বা গাছকে হারিয়ে দেবে অনায়াসে। হাওয়া বইলে গাছের পাতা নড়ে, শাখা-প্রশাখায় দোল ওঠে—গাছ যে বেঁচে আছে তা অন্তত চোখে দেখে বোঝা যায়। কিন্তু আশ্চর্য সুদাম যেন গাছের থেকেও বোবা। দু-ভাই-বোন ঠিক যেন উলটো ধাতের। মীরা গাঁ-ঘোরে আর হরদম বকরবকর করে। তখন তার পরনের কাপড়-চোপড় ঠিক থাকে না। ভরত কতদিন দেখছে মীরা তেঁতুলতলায় বসে গান গাইছে হাত-পা ছড়িয়ে। গ্রামের ছেলে-মেয়েগুলো তাকে ঘিরে ধরেছে মজা দেখবার জন্য। ভরত কাছে গেলেই পালিয়ে যেত ওরা। টুকরো কথার বর্শা কানে ঢুকতো ভরতের। ডান হাত বাঁ হাত দুটোই যদি পক্ষাঘাতে—মাটি নেয় মানুষ তাহলে ভাত খাবে কি করে? ফুঃ দিয়ে তো ভাত মুখে তোলা যায় না।

ভরত তার নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভাবে। এই চৈত্রে মীরা উনিশ বছরে পড়ল। পাগলী হলেও শরীর-স্বাস্থ্য মন্দ নয়। সে যোগমায়ার গড়ন পেয়েছে। মেয়েটা যেদিন ভূমিষ্ঠ হল তার চাঁদ মুখ দেখে পাড়া-পড়শীর আনন্দ করে বলেছিল, এ মেয়ে তোমার ঘরে লক্ষী হয়ে ঢুকল। এত ফুটফুটে গায়ের রঙ দেখলে চোখে তাক লাগে। এ মেয়ের নাম জ্যোৎস্না না রাখলে ভুল হবে।

বলতে নেই মীরার গায়ের রঙ এই উনিশে ফেটে বেরয়। মরা জ্যোৎস্না বা ঘোলাটে সজনে ফুল নয়, তার গায়ের রঙ যেন টাটকা বক ফুলের। মাথা ভরা চুল পিঠের উপর হাওয়ায় ঢেঁকির পাড় দেয়। একটা ময়লা কাপড়ে মীরার রুপ লাবণ্য কইমাছের মত। যার মাথা ভরা রেশমি চুল, সে কোনদিন মাথায় তেল নেয় না, জোর করে মাথায় তেল ঘষে দিলেও তার বিরক্তি। এখন হাল ছেড়ে দিয়েছে যোগমায়া। সে প্রায়দিন ভরতকে বলে, যে মাটিতে গুচ্ছের কাঁকর মিশে আছে তা দিয়ে কোনদিন হাঁড়িকুঁড়ি হবে না। মীরার বিয়ে দেবার আশা তুমি ছেড়ে দাও। ও যে কটা দিন বাঁচবে সে কটা দিন আমাদের গলার কাঁটা হয়ে বাঁচবে। হাজার চেষ্টা করলেও কাঁটা বেঁধার যন্ত্রনা ভুলতে কোনদিন পারবে না।

মেয়েটা বড় হয়ে গেল ধেই ধেই করে তবু তার বুদ্ধি শুদ্ধি হল না। বাজারের জীবন-মাষ্টার বলেছিল, ভরত, মেয়েটাকে একবার রাঁচি নিয়ে গেলে পারতে। এমন সোনার চাঁদ মেয়েটা শেষে পাগল হয়! এ যেন দুধের কড়াইয়ে এক ফোঁটা গো-চনা!

রাঁচি নিয়ে যাবার ইচ্ছে যে হয়নি ভরতের তা নয়—তবে তার সামর্থ রাঁচি কেন কাঁথি অব্দি যাবার নয়। মেয়েটাকে দেখালে মনে হয় সেরে যেত। ফকির-গুণিনে এ রোগ সারার নয়। যদি সারানো যেত তাহলে কবে ভাল হয়ে যেত মীরা।

মীরা যে কোনদিন ভাল হবে না, সুস্থ জীবন ফিরে পাবে না একথা জেনে গিয়েছে ভরত দশ বছর আগে। মেয়ের আশা ছেড়ে দিয়ে সে এখন সুদামের পিছনে লেগেছে। সাতটা কথা বললে সুদাম এখন একটা কথার জবাব দেয়। না হলে সে চুপচাপ

থাকতে ভালবাসে।

ভরত ছেলেকে উসকে দেবার জন্য বলল, বাপের হোটেলে বসে খাস তোর লাজ লাগে না?

সুদাম শোনে, আর না শোনার ভাণ করে সে চেয়ে থাকে বাঁশঝাড়ের দিকে। কী দেখে সে অমন করে? বাঁশঝাড়ে কি লুকিয়ে আছে তার গুপ্তব্যথা? ভরত অত শত বোঝে না, দুপুরবেলায় চেঁচিয়ে ওঠে রাগের ঘোরে, সারাদিন ঘরে বসে কি সুখ পাস জানি না। যা না একটু বাজার থেকে ঘুরে আয়। হাত-পা না নাড়ালে যে জং ধরে যাবে মনে।

এত বলার পরও কোন কথা সরে না সুদামের মুখে। সে শুধু বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে অপলক। তার টানা চোখ দুটোয় যেন কাজল লেপা। এত সুন্দর চোখমুখ যেন রোগা কৃষ্ণ ভগবান, হাসলেও মন্দ লাগে না। কিন্তু সুদামের হাসি দেখেছে এমন মানুষ এই পাড়া গাঁয়ে খুব কম আছে। সাপের পাঁচ পা দেখা দুর্লভ না হলেও সুদামের হাসি সুলভ নয়। অথচ মন ভাল থাকলে মাঝেমধ্যে হাসত সে। তার সেই দুধমালাই হাসি ভরত নিজেই মুছে দিয়েছে ঠোঁট থেকে। সেদিনের ঘটনাটা এখনও ভুলতে পারে নি সুদাম। ভরতের মনেও অনুশোচনার মেঘ জমেছে এর জন্য। ছেলেকে দুটো কড়া ভাষায় কথা বলা কি তার অন্যায়? বাবা হয়ে ছেলেকে যদি শাসন না করবে তাহলে ওমন বাবা হওয়ার চাইতে না হওয়াই ভাল। সুদামকে মজুর খাটতে যেতে বলেছিল ভরত। পাত্রদের বাগানের কাজে লোক দরকার। সুদাম ঘরে বসে আছে, তাকেই পাঠাতে চেয়েছিল ভরত। সব শুনেও সুদাম গেল না। সে তার মায়ের কাছে মিনমিনে গলায় বলেছিল, পরের দোরে খাটতে যেতে আমার মন সায় দেয় না।

তাহলে নিজের জমিতে চাষ বাস কর। এ প্রস্তাবে সুদাম বলেছিল বিনীত ভাবে, মা, আমার যা শরীরের অবস্থা তাতে মাঠের কাজ করতে গেলে আমি মারা পড়ব। দেখ না একটু হাঁটাচলা করলে আমার কেমন হাঁপু লাগে। বুক ধড়ফড় করে।

সুদামের এই কথাটায় ভরতের মনে বোলতার হুল ঢুকিয়ে দেয়, সে তখনি চিৎকার করে বলে, বসে খেতে পেলে কে আর রোদ মাথায় কাজে যায়? কুঁড়ে মানুষের গা গতরে যে কুঠ বেরয়। দেখি তোর কুঠ বেরিয়েছে কিনা! ভরত রাগের মাথায় সুদামের গায়ে জড়ানো গামছাটা ধরে টান দিতেই সরু বুকটা দিনের আলোয় হাড়খাঁচাটা দেখিয়ে দেয়। দাওয়া থেকে নিচে হুমড়ে পড়ে সুদাম। তার সারা গায়ে লেগে যায় উঠোনের ধুলো। এমন ঘটনার জন্য বুঝি প্রস্তুত ছিল না সে। ফলে সে চোটলাগা ঘুঘুর মতো থরথরিয়ে কাঁপে। ভরত রাগে শুকনো বারুদ বাতির মতো জ্বলে ওঠে তার নাটক দেখে। মুহূর্তে দয়া-মায়া সব উবে যায় মন থেকে। গলা ধাক্কা দিয়ে সে সুদামকে বের করে দেয় আগড় খুলে। পাড়া মাথায় তুলে বলে, মজুর খেটে খা, নাহলে যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যা। আমি আর তোদের নিয়ে পারছি না। যা, দূর হ আমার সামনে থেকে।

সুদাম মাথা নীচু করে হেঁটে আসে পিচ রাস্তায়। মনে ঘৃণার বুদবুদ জমে। ঝড় ওঠে শরীরের কোনায় কোনায়। বাবার ওপর অভিমান জন্মালেও সে রাগ করতেও পারে না। বাইশ-তেইশ বছর বয়স হল তার। এই বয়সে বাপকে-ছেলেরা খেটে খাওয়ায়। সবাই যা পারে, কেন সে পারবে না? তার কমজোরী কোথায়? সবার মত তার দুটো হাত পা চোখ আছে। সে কালা বোবা নয়। খুব যে বুদ্ধি কম তেমনও নয়। সে রেডিও শোনে, গান ভালবাসে। সে আড়বাঁশি বাজাতে পারে, কায়দা মত ফুঁ দিয়ে। তার সুর আছে। সে সাদাকে সাদা দেখে কালোকে কালো দেখে। এত যার দৃষ্টি শক্তি সে কেন পড়ে পড়ে মার খাবে? নানা প্রশ্নে ক্ষত বিক্ষত হয় সুদাম। দুপুরবেলায় রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে সে ভেবে নেয়—এই মাটির পৃথিবীটা তার জন্য নয়। সে আর কাউকে কষ্ট দেবে না। নিজেকেও কষ্ট দেওয়ার কোন অধিকার নেই। ফলে সে চলে যাবে এই পৃথিবী ছেড়ে। তার আর কারোর জন্য কষ্ট হবে না। শুধু মীরার জন্য সে কিছুক্ষণ ঝিম ধরে থাকে। সে যদি গলায় দড়ি নেয় তাহলে মীরাকে কে গ্রাম থেকে খুঁজে আনবে সন্ধে- বেলায়? খাওয়ার সময় কোনোদিনও সময় মত ঘরে আসে না বোনটা। সুদামই তাকে হাত ধরে নিয়ে আসে ঘরের দাওয়ায়। এক সাথে খেতে বসে ভাই-বোন। মীরাকে ছেড়ে সে যদি গলায় দড়ি নেয় তাহলে বোনটা না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরে যাবে। তার জন্য এ সংসারে কেউ ভাবে না। শুধুমাত্র মীরার মুখের দিকে তাকিয়ে সুদাম আত্মহত্যার বাসনাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দেয়।

মাথার উপর টং-টং করে সূর্য। বড় গাছগুলোর ছায়ায় সূর্যের গরম থাবা। খিদেয় সুদামের পেট গুলায়। দু চোখে হলুদ আলোর ফুলঝুরি। পেট গুলালে তার মাথা কেমন ঘোরে। রোগা হাত-পাগুলো ঝিনঝিন করে। চারপাশ কেমন ঝাপসা দেখায়। তবু তার ঘরে ফিরতে মন চায় না। বাবা তার কাছে এখন জহ্লাদ। মা তারকা রাক্ষসী। ওদের কারোর মনে দয়া-মায়া নেই। ওরা শুধু চায় টাকা। টাকা ছাড়া ওদের জগৎ অচল। পুব বিলে দশ কাঠা জমি আছে তার বাবার। দশ কাঠা জমিতে চার প্রাণীর ভাত হয় না। চাষের সময়টুকু বাদ দিলে গ্রামে বড় কাজের আকাল। কাজ থাকলেও পোষায় না। বাবুরা মুখের উপর বলে দেয়, এই টাকায় পোষালে করো, না পোষালে পথ দেখ। তোমাদের পুরো গুষ্টির ঠিকা নিইনি আমরা।

ভরত চাষের কাজ মিটে গেলে জাত ব্যবসায় হাত লাগায়। সপ্তাহে দু'দিন হাট বসে। গাঁ-ভেঙে মানুষ আসে হাট করতে। ভরতের হাতের তৈরী কুলোর বড় সুনাম। পুরো হপ্তায় শিল্পকর্ম নামমাত্র মূল্যে বিকোয়। একাজেও সুদামের কোন আগ্রহ নেই। বাতা ছিলতে গিয়ে সে তার আঙুলের মাংস অনেকটা কেটে ফেলল অসাবধানে। পাকা তরলা বাঁশের বাতায় মিশে গেল তার রক্ত। হায়-হায় করে ছুটে এল বাবা মা। সুদামের হাত থেকে ধারালো দা-টা কেড়ে নিয়ে সে ভৎর্সনা করে বলল, তোকে দিয়ে কোন কাজটাই ভাল মতন করার জো নেই। এত অমনযোগী হলে কি আর হাতের কাজ হয় রে! হাতের কাজের জন্য আসল মূলধন হল ধৈর্য। ধৈর্য নেই যার,

পোড়া কপাল তার। তোর যে কি হবে সুদাম, আমি অষ্টপ্রহর ভেবে মরি। ভগবান যেন তোর সুমতি দেয়।

মায়ের কথাগুলো রাস্তায় দাঁড়িয়ে মনে পড়ে সুদামের। হু হু করে ওঠে মনটা। আঙুলের কাটা দাগটা জুড়ে গেছে কবে, তবু মায়ের কথা গুলো মন থেকে মুছল না। প্রায়ই মনে পড়ে হাজার কথা। কথার তীর বিঁধতে থাকে হৃদয়ে। ঝাঁঝরা হয়ে যায় ইচ্ছাশক্তির দেওয়াল। পতন ঘাসের মত মুখ করে সে জীবন মাষ্টারের টেলারিং দোকানটার দিকে তাকায়। ওই ছোট্ট দশ হাত বাই বার হাত মাপের অগোছাল দোকানে বুঝিবা জীবনীশক্তির সালসা লুকিয়ে আছে। বাজারের মধ্যে সব থেকে ভালো লাগে জীবন মাষ্টারের খোলামেলা ব্যবহার। মানুষটা সমুদ্রের পাশে না থাকলেও তার মন হৃদয় সমুদ্রের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। মানুষ সমুদ্র হয়ে গেলে সেখানে ডুবতে বড় মন চায় সুদামের।

এখনও দোকান বন্ধ হয়নি জীবন-মাষ্টারের। সারাদিন তার যেন কত কাজ। আসলে কাজের চাইতে অকাজই বেশি করে জীবন মাষ্টার। পায়জামা, সায়া, ফতুয়া আর বালিশের খোলা বানানো ছাড়া-সে বুঝি কোন কাজই তেমন ভাবে শেখার সুযোগ পাইনি।

বাজারের মধ্যে একটাই টেলারিং-এর দোকান। জীবনমাষ্টার সেই দোকানের হর্তাকর্তা বিধাতা। তার দোকানে নতুন কাপড়ের সেলাই ফোঁড়াই কম হয়। নতুন কাপড়ের কাটিং হয় না বললেই চলে। তবে হাট বার বলে আলাদা কথা। সেদিন উষা কোম্পানীর পুরোনো মডেলের মেশিনটা বাইরে বের করে আনে জীবনমাষ্টার। রিবনে সুতো লাগিয়ে সে অপেক্ষা করে কখন ফাটাফুটো সারাতে লোক আসবে। সব হাটে এক রকম কামাই হয় না। যেদিন পরতা ভাল হয় সেদিন অন্তত সে দুটো পায়জামা, একটা ফতুয়া অথবা একটা সায়া সেলাই করবে। নতুন কাজে মোটা পয়সা। ছেঁড়া সেলাই আর রিপু করায় মনের মতো পয়সা পায় সে না। অথচ তার কাজে কোনো খুঁত নেই, ফাঁকি নেই। সে খদ্দেরকে ঠকিয়ে পয়সা নেয় না। মাথার উপর বিরাজ করছে গণেশ ভগবান। কাউকে ঠকিয়ে নিলে তাঁর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। মন বেজায় খারাপ থাকলে সুদামের একমাত্র আশ্রয়স্থল হল এই টেলারিং-এর দোকানটা। জীবনমাষ্টার বাপের বয়সী হলেও তার সাথে বন্ধুর মত কথা বলে সুদাম। সে বলে, আঠারো ছাড়ালে বাপ আর ছেলের মধ্যে কোনো দেওয়াল থাকা উচিত নয়। তোর যদি ইচ্ছে হয় বিড়ি খেতে তাহলে আমার সামনে খেতে পারিস। আমরা যদি একসাথে ভাত খেতে পারি তাহলে একসাথে বিড়ি খেলে কি দোষের হয় আমি তা বুঝিনে!

দুপুরের বাসটা দীঘার দিকে চলে যেতেই এক রাশ ধুলো আছড়ে পড়ল সুদামের মুখের উপর। বাসের চলতি হাওয়ায় এলোমেলো হয়ে গেল তার মাথার চুল। ঠোঁটে জিভ বোলাতেই বালির স্পর্শে রি-রি করে উঠল তার সর্ব শরীর। অমনি কেরাদের দিকে তাকাল সুদাম। ছায়াগুলো ঝুলে আছে গাছের পাতায়। রোদের রঙ বুঝি সোনাকেও

হার মানায় এখন। মাথার উপর জ্বলতে থাকে সূর্য। ঘাস পোড়ার গন্ধে কুঁকড়ে ওঠে সুদামের গা-গতর। রোদ অগ্রাহ্য করে সে হাঁটতে থাকে দোকানের দিকে। ঘরের যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল জীবনমাষ্টার। ঠিক সেই সময় সুদাম গিয়ে হাজির হল তার সামনে। মাথা নীচু করে দাঁড়াতেই জীবনমাষ্টার ছোটো টুলটা এগিয়ে দিয়ে বলল, বল। তারপর সে সুদামের মুখের দিকে তাকাল, কী ব্যাপার মুখটাকে যে একেবারে জল ঢাকলা ভাতের মত করে আছিস? ঘরে অশান্তি হয়েছি বুঝি?

সুদাম অনেকক্ষণ পরে ঘাড় নাড়ল, বাবা চায় না আমি আর ঘরে থাকি। মায়েরও সেই একমত। আমার হয়েছে যত জ্বালা—আমার আর যাওয়ার মত জায়গা নেই। ভেবেছিলাম কোথাও পালিয়ে যাব কিন্তু মীরার জন্য যেতে পারি না। ওকে একটা বেলা না দেখলে আমার মাথায় ঘুঘরো পোকা নড়ে ওঠে। আসলে এটা কেন হয় জান কাকা? বোনটা কারোর স্নেহ-ভালবাসা পাইনি। আমি চলে গেলে ওকে আর দেখার কেউ থাকবে না। গ্রামের কুকুরগুলো ওকে ছিঁড়ে খাবে। আমি আছি বলে কুকুরের দল দূরে থাকে।

জীবনমাষ্টার চটের থলিতে টুকরো ছিটকাপড় ভরে তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী চোখে সুদামের চোখের দিকে তাকাল, তোর সব কথা আমি মেনে নিচ্ছি। আর এও বলছি তোর মত ছেলে এগাঁয়ে আর কেউ নেই। তোর সব ভালো শুধু একটা জিনিস খারাপ। জীবন মাষ্টার বলা ঠিক হবে কিনা ভেবে চুপ করে গেল।

অস্থির সুদাম বলল, আমার দোষটা যদি বলে দাও তাহলে শুধরে নিতে পারি। তুমি যা বলবে আমি মেনে নেব।

মানা-না-মানা তোর নিজের ব্যাপার। তবে একটা কথা বলি—মন দিয়ে শোন। তোর এবার কিছু করার দরকার। আর কতদিন বাবার ঘাড়ে বসে খাবি? সেটা ভাল দেখায় না। তোর বাবা এসে আমার কাছে নালিশ করে। আমি তার কথাও ঠেলতে পারি না। সে যা বলে অন্যায় কিছু বলে না। আমি তোর বাবা হলে ঠিক একই কথা বলতাম। জীবন মাষ্টার কথাগুলো বলে সুদামের দিকে তাকাল।

সুদাম ঢোক গিলল, সব কাজ কি সবার দ্বারা হয়? গরু দিয়ে যে কাজ হয়, সেই কাজ কি ছাগল দিয়ে হতে পারে? অসম্ভব।

অসম্ভবকেই সম্ভব করা মানুষের ধর্ম। সেই ধর্ম থেকে হড়কে গেলে পাপ করা হয়।

আমি জীবনে কোনদিন পাপ করিনি।

পাপ না করলেও কাজের কাজ কিছু করিসনি। এবার মনে হয় তোর নিজেকে নিয়ে ভাববার সময় হয়েছে। জীবন মাষ্টার বুঝিয়ে বলল, যে কোন একটা কাজে লেগে পড়। তখন দেখবি কত শান্তি মনে ভিড় করে আসে। তুই শান্তির জলে সাঁতার কাটবি তখন। নিজেকে খুঁজে পাবি নতুন ভাবে।

জীবন মাষ্টারের মুখের দিকে তাকিয়ে সুদাম যেন নিজেকে বদলে ফেলার স্বপ্ন দেখে।

॥ দশ ॥

স্বপ্ন অলকলতার মূল, পুটপুট ভেঙে যায় সুদামের। রোদ ঝলমলে দিনের বেলায় জলবাহী মেঘেরা উড়ে আসে স্বপ্ন হয়ে। সুদাম মাথা নিচু করে বসে থাকে কাঠের টুলে। সেলাই মেশিন ঝেড়েঝুড়ে সাফ সুতরো করে জীবন মাষ্টার। এটা তার রোজকার অভ্যাস। দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করার আগে মেশিনের এই সম্মান টুকু যেন প্রাপ্য। জীবন মাষ্টার মন দিয়ে নারকেল তেল দিচ্ছিল মেসিনের ভেতরের অংশে। রোজ একবার যথাযথ তেল না দিলে আওয়াজ উঠবে। ঘ্যাড়ঘ্যাড় শব্দে কাজের মনোযোগ নষ্ট হবে তার। যে যন্ত্র ভাত—রুটি দেয় তাকে অবহেলা করা যায় না।

হঠাৎ রোদ সরে গেল স্কুল মাঠের সামনে থেকে। মেঘের ছায়ায় সবুজ ঘাস কালচে হয়ে উঠল চোখের নিমেষে। সামান্য গতি বেড়ে গেল হাওয়ার। দুলে উঠল গাছের শাখা-প্রশাখা। চারদিকে কেমন যেন বদলে যাওয়া চেহারা। জীবন-মাষ্টার ঘাড় তুলে একবার বাইরের দিকে তাকাল, মেঘের কালো রঙ ব্যস্ততা ফুটালো তার চেহারায়। ভারী চশমার কাছ মুছে তাকাল সুদামের দিকে, যে ভাবে মেঘ উঠেছে মনে হচ্চে আজ বৃষ্টি হতে পারে। তাড়াতাড়ি ঘর না গেলে পথে যেতে যেতে ভিজে যাব। চটের থলিটা গুটিয়ে নিয়ে জীবনমাষ্টার যাওয়ার জন্য তৈরী হল। নীল রবারের চপ্পলটা পায়ে গলিয়ে সে আর একবার সুদামের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকাল। সুদামের যাওয়ার মন নেই। কোথায় যাবে সে, কার কাছে যাবে? বাড়ি ফিরে গেলে দুমুঠো খেতে পাবে ঠিকই কিন্তু সে ভাত তার গলা দিয়ে নামবে না। আসার সময় মীরার গলা পেয়েছিল তেঁতুলতলায়। আজকাল মীরার তেঁতুলতলাতেই সময় কাটে। পুব পাড়ার গোবিন্দ তার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে। মীরাকে সে ফুঁসলিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিল বাঁধের ধারে। মীরা যায়নি, তার লোমশ হাত কামড়ে দিয়ে পালিয়ে এসেছে। খবরটা গ্রামে জানাজানি না হলেও সুদাম বুঝতে পেরেছে। ঘেন্নায় সে আর কোনদিন গোবিন্দর সাথে কথা বলেনি। আর মীরাও ভয়ে পুব পাড়ার ছায়া মাড়ায়নি। বাবা-মা তাকে আড়ালে ডেকে বুঝিয়েছে। মীরা কথা না বলে শুনেছে সব। গোবিন্দর কু মতলবের অর্থ সে পাগলী হয়েও বুঝতে পেরেছে। সেই থেকে রাগে ফুঁসছে মীরা। রাতে ঘুমের ঘোরে সে চেঁচিয়ে ওঠে। যোগমায়াকে বুকের কাছে টেনে এনে থরথরিয়ে কাঁপতে থাকে। ভরতের ঘুম ভেঙে গেলে সে ডিবা থেকে বিড়ি বের করে আগুন ধরায়। সে এসবের কিছু জানে না। মেয়ের ঘর্মাক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে সে বলেছিল, সুদামের মা, মেয়েটাকে আর একবার গুণিনের কাছে নিয়ে যেও। মনে হয় ভয় পেয়েছে মেয়েটা, ওর রকম-সকম আমার ভাল লাগছে না।

যোগমায়া মীরাকে গুণিনের কাছে নিয়ে যায়নি, ঠাস ঠাস গালে চড় মেরে বলেছিল, ঘরে থাকবি মুখপুড়ী, বাইরে বেরলে তোর এই গতরটা যে কাল হবে।

ঘরছেড়ে কি একেবারের জন্য চলে এসেছিস?

সুদাম মাথা চুলকে বলল, তা নয়, আজ আর দুপুরে বাড়ি যাব না।

তাহলে যাবিটা কোথায় শুনি?

সুদাম না ভেবেই বলল, ইস্কুলের বারান্দায় দুপুরটা কাটিয়ে দেব। গাছপালার ছায়ার জায়গাটা ভীষণ ঠাণ্ডা। শুলেই ঘুম এসে যাবে।

খাবি না?

রোজ খাই, একদিন না খেলে কোন ক্ষতি হবে না। সুদাম মুখ ঘুরিয়ে নিল অভিমানে। বাইরে তখন ঝোড়ো হাওয়ার তাণ্ডব। গাছের শাখা-প্রশাখা দুলছে হাওয়ার তালে। ধুলো বালি খড়কুটো উড়ে যাচ্ছে হাওয়ার স্রোতে। দোকান বন্ধ করে এক পা এগিয়ে গেল জীবন মাষ্টার, তারপর কি মনে করে আবার ফিরে এল সুদামের কাছে, আমার সাথে চল। যা হয়েছে আমার ওখানে খেয়ে নিবি।

সুদাম কাউকে বিব্রত করতে চায় না, সে যেন পালিয়ে যেতে পারলে বাঁচে, এমন স্বরে বলল, না কাকা, আমার খাওয়ার জন্য ভেব না। আমি এরকম প্রায়ই না খেয়ে থাকি। আমার অভ্যাস আছে।

জীবন মাষ্টার এবার পুত্র স্নেহ সুদামের হাত ধরে বলল, চল। আর দেরি করিস না, আমার বেজায় খিদে পেয়েছে। তাছাড়া মেয়েটাও ভাত নিয়ে বসে থাকবে। চল, তাড়াতাড়ি চল। আমাকে আবার খেয়ে দেয়ে আসতে হবে দোকানে। কটা নতুন জামার অর্ডার আছে। সময় মত দিতে হবে।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে সুদামের মনে পড়ে গেল ফুড়কুনীর কথা। ওর সাথে অনেকদিন দেখা হয়নি তার। ফুড়কুনীর সাথে দেখা হলে সুদামের মনে জোয়ার লাগে ভাললাগার। আসলে ফুড়কুনীর সরলস্নিগ্ধ চাহুনিতে ভাল লাগার রেণুগুলো সোনার কুঁচির মত ছড়িয়ে আছে। ওকে দেখলে সহসা চোখ ফেরাতে পারে না সে। বুকের ভিতর গুড়গুড় মেঘ ডাকার ধ্বনি হয়, মনে হয় তুমুল বৃষ্টি নামবে ভালবাসার, সে ভিজে যাবে, তার আর কিছু করার থাকবে না। একদম ছোট থেকেই ফুড়কুনীকে দেখেছে সুদাম। ওর জীবনটা ছকে বাঁধা নয়, ঘোলাটে ইতিহাসে ভরা। জীবন মাষ্টার তাকে যদি ঠাঁই না দিত তাহলে খড়কুটোর মত হারিয়ে যেত হোত তাকে। ফুড়কুনীর মা-বাবা কে তা সে নিজেও জানে না। ভোরবেলায় একদিন দোকান খুলতে এসে ফুড়কুনীর কান্না শুনতে পেয়েছিল জীবন মাষ্টার। ইস্কুলের বারান্দা থেকে কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছিল ঘন ঘন। দুটো কুকুর ঘিরে রেখেছিল সেই সদ্যাজাত শিশু কন্যাকে। জীবন মাস্টার এমন অভাবনীয়, অতি নাটকীয় দৃশ্য দেখবে স্বপ্নেও ভাবেনি। কাঁপা হাতে সে তুলে নিয়েছিল বাচ্চাটাকে। ধীর ধীরে প্রখর সূর্যের আলো এসে বাজারকে জাগিয়ে তুললে জীবন মাষ্টারের টেলারিং দোকানে মেলার ভিড় জমে গেল। সবার চোখে কৌতূহল আর বিস্ময়ের শেষ নেই। শিশু কন্যাটি এল কোথা থেকে— এই গবেষণায় মাতল বাজারের লোক। জীবন মাষ্টার চা-দোকান থেকে দুধ এনে তুলোয় ভিজিয়ে খাওয়াল। নিঃসন্তান জীবন মাষ্টারের বেঁচে থাকার ছক পাল্টে গেল সেদিন থেকে। সুধাময়ী ফুড়কুনীকে পেয়ে বেজায় খুশি। তার বন্ধ্যা শরীরে আবার

মাতৃত্বের জোয়ার এল। গ্রামে গ্রামে রটে গেল ফুড়কুনীর কথা। কেউ বলল, শহরের দীঘা ফেরত বাবুরা ফেলে গেছে ফুড়কুনীকে। কেউ বলল, এটা নির্ঘাত কোনো আইবুড়ো মেয়ের কাজ। ক'মাস ফুড়কুনীকে নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা চলল বাজারের দোকানগুলোয়। তারা জীবন মাষ্টারকে রসিকতা করে বলল, টেলার মাষ্টার, এবার তোমার দোকান চলবে ভাল। মা লক্ষ্মী এসেছ তোমার ঘরে, এবার সব অভাব তোমার দূর হবে। তুমি এখন পৃথিবীর সব চাইতে সুখী মানুষ।

রাখে হরি তো মারে কে? ফুড়কুনীর জীবন এখন এই প্রবাদের উপর দাঁড়িয়ে আছে। যারা তাকে জন্মের পরে শেষ করে দিতে চেয়েছিল, ভাগ্যের বিচিত্র লীলা-খেলায় সেই ফুড়কুনী এখন আঠারো বছরের তরুণী। সে প্রতিদিন সকালে জল খাবার নিয়ে আসে তার পালিত পিতাকে দেবার জন্য। যে দিন দোকানে বেশী কাজের চাপ থাকে সেদিন ভাত নিয়ে আসে ফুড়কুনী। নিজে সামনে বসিয়ে খাওয়ায় জীবন মাষ্টারকে। খাওয়া শেষ হলে থালা বাটি ধুয়ে আনে স্কুলের পুকুর থেকে। বাজারের প্রায় সব দোকানদাররা তাকে খুব স্নেহের চোখে দেখে। কার কখন কি দরকার সব যেন ফুড়কুনীর নখদর্পণে। সে শুধু জীবনমাষ্টারের নয় এ বাজারের সবার মেয়ে। কোন কাজে তার 'না' নেই কোনদিন। ঠোঁটে লেগে থাকা মধুর হাসি তার সারা শরীরে রক্ত সঞ্চালনের মত ছড়িয়ে পড়ে। পাতলা লেবুকোয়া ঠোঁট নাড়িয়ে ফুড়কুনী যখন কথা বলে তখন তার কালো কুচকুচে চোখের তারায় হাজার সূর্যরশ্মির দ্যুতিময় আলো খেলা করে। চোখের সাদা জমিতে ফুটে থাকে নিষ্পাপ টগর ফুলের পাপড়ি।

ধানখেতগুলো পেরিয়ে এসে জীবন মাষ্টার পিছন ফিরে তাকাল। একটু আগের ধুমসা ভয়াবহ মেঘগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে হাওয়ার রাখাল। এখন আবার ঝলমলে রোদ ঠিকরে নামছে পৃথিবীর ধুলোয়। তোলা জলে ধান চাষ হচ্ছে সারা মাঠে। অসময়ের ধানগাছ সবুজ হয়ে আছে চারপাশে। ধানের গোড়ায় থিকথিক করে চার আঙুল জল। কয়েকটা কানা বক পোকা খাওয়ার লোভে দাঁড়িয়ে আছে এক পায়ে। জীবনমাষ্টার সেই বকগুলোর দিকে তাকাতেই ভয়ে ডানা ঝাঁপটিয়ে উড়ে গেল চারটি বক। কিছুটা জ্ঞান দেবার মত করে বলল, জীবনে দাঁড়াতে গেলে প্রতিটা মানুষের দরকার বকের ধৈর্য। ধৈর্য আর পরিশ্রম ছাড়া জীবনে কারোর সাফল্য আসে না।

সুদাম কোন কথা না বলে চুপচাপ হাঁটছিল। সে আশা করেছিল হয়ত ঝেঁপে বৃষ্টি আসবে: এই দাবাদহ থেকে মুক্তি পাবে পৃথিবী। কিন্তু মেঘগুলো দীঘার দিকে উড়ে যেতেই তার মন খারাপ। তার মনের কোণে যে মেঘ জমেছে সেখানেও বৃষ্টির বড় প্রয়োজন। এই গুমোট তাকে ভীষণ কোনঠাসা করে দিল। কিন্তু মনের কথা সে কার কাছে বলবে? কে শুনবে তার মনের ইতিকথা।

জীবন মাষ্টার হাঁটতে হাঁটতে বলল, মন খারাপ করিস না, মানুষের চিরদিন একইরকম যায় না। দুঃখের পরে সুখ আসে, রাতের অধিকার শেষ হলে আলো ফোটে জগতে। এটাই নিয়ম। কোনদিন এই নিয়মের নড়চড় হয় না। তুই আমার কথা ধর। ভাব তো আগে আমার দিনই চলত না, শুধু অভাব আর অভাব। চাল থাকলে নুন

থাকত না, এমন দশা। তোর কাকিমাকে একা রেখে আমি ভাগ্য বদলাতে কলকাতায় চলে গেলাম। সেখানে কোথায় খাব, কোথায় শুবো তার কোন ঠিক নেই। শেষে ঘুরতে ঘুরতে ভগবান একটা ঠাঁই জুটিয়ে দিল। ওখানকার একটা টেলারিং দোকানে ফাই ফরমাশ খাটার চাকরি পেয়ে গেলাম। তখনও সেলাই মেশিন ছুঁয়ে দেখিনি। ছুঁতে ভয় করত। যদি বাবু ধমক দেয়—এই ভয়ে গুটিয়ে থাকতাম। ধীরে ধীরে ভয়ে কেটে গেল। আমি বিশ্বাসের দ্বারা বাবুর কাছের লোক হয়ে গেলাম। মেশিন চালান শিখলাম। ফিরে আসার সময় মাষ্টার বলল, বেটা, এই পুরোনো উষা মেশিনটা নিয়ে যা। এটা থাকলে তোর ভাত কাপড়ের কোনদিন অভাব হবে না। মাষ্টার মিথ্যে বলেনি আজ তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি।

ধানমাঠ শেষ হলে শুরু হয় গ্রামের সীমানা। শালের খুঁটিতে বিদ্যুৎ গিয়েছে গ্রামের ভেতর। ডিপ-টিউবওয়েলের ভটভট আওয়াজ ভেসে আসে বাতাসে। নালী দিয়ে ফিটকিরি রঙের জল যাচ্ছে হরদম। এই পাতলা ছেঁচা জলে কোন জীবাণু নেই। এই জল বুঝি ফুড়কুনীর মন। সুদাম সহসা বেড়ার কাছে এসে থেমে গেল। তার নজরে পড়ল ইলেকট্রিক তারে বসা ফিঙে পাখিটাকে। পাখিটা দোল খাচ্ছিল হাওয়ায়। নীল আকাশের নিচে তার বুঝি শিকার ধরতে কোন ক্লান্তি নেই। একটা সামান্য ফিঙে পাখি যা পারে সুদাম কেন তা পারবে না। শরীর সবসময় বাধা নয়। শরীরের ভেতর লুকিয়ে থাকা মনটাই হল আসল কথা। সুদাম তার মনের জোর হারিয়ে ফেলেছে। ঘরে গেলে সে যেন কুঁড়ে হয়ে যায় আরও। তার বিচার বুদ্ধি তখন কমে আসে। ন্যালাখ্যাপার মত হয়ে যায় দু'চোখ। কেন এমন হয় সুদামের তা জানা নেই। গোবিন্দ তাকে প্রায়দিন বলে, মন সতেজ রাখতে গেলে মেয়ে মানুষের সান্নিধ্য থাকা দরকার। একমাত্র মেয়েরাই পারে জীবনের শুকনো গাছে নতুন করে ফুল ফোটাতে। কিন্তু কোথায় সেই কন্যে যে দুবলা-পাতলা কমজোরী যুবকটিকে একটু প্রেমের উত্তাপ দেবে, ভালবাসায় আবার উজ্জীবিত করে তুলবে ; তেমন কোন আলো সুদামের চোখের তারায় ঝিলিক দেয় না।

জীবনমাষ্টার আগড় খুলে ডাকল, আয়, দাঁড়িয়ে আছিস কেন? যেন ঘুম ভেঙে হঠাৎ জেগে উঠল সুদাম। জীবনমাষ্টারের মাটির ঘরখানা গোবর লেপা, মসৃণ দেওয়াল। দেওয়ালের গায়ে আতপ চাল গুঁড়োর আলপনা। পাখি পালকি প্রজাপতির ছবি আঁকা। কে এঁকেছে ছবিগুলো? নিশ্চয় অসুস্থ সুধাময়ী নয়। এগুলো নিশ্চয় ফুড়কুনীর হাতের শিল্প। সুদাম বিস্ফারিত চোখে দেখছিল ছবিগুলো। মুহূর্তে পালকি প্রজাপতি দেখে তার মাথায় বিয়ের ভাবনা এল। গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল নিমেষে। যার খাওয়া জোটে না, সে ভাবছে বিয়ের কথা! সুদাম যেন থাপ্পড় খেল বিবেকের কাছে। হেসে উঠল মনে মনে।

বাড়ি লাগোয়া পুকুরের পাড়ে পাতিহাঁস গুগলি খায় নিশ্চিন্তে। বাড়ির সামনে যে বাগান আছে সেখানে লতিয়ে বাড়ছে চৈত্রের কুমড়ো গাছ। জল ঢেলে ঢেলে এই খরাতেও সতেজ রেখেছে পুঁই গাছ। ধানী লঙ্কার গাছ চেয়ে আছে আকাশের

দিকে। ছোট লঙ্কা কিন্তু এতে ঝাল বেশি। তাদের পাড়ার ঝুমা এই ধানী লঙ্কার মত, সে বড় চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলে অকারণে। হেসে হেসে ঢলিয়ে পড়তে চায় বুকের উপর। খোঁচা মেরে বলে, এক বিঘোৎ যার বুকের বহর সে কোনদিন বুঝবে না ভালবাসার কদর। ভালবাসতে গেলে পুরুষমানুষের বুক ধান ক্ষেতের আলের মত সরু হলে হয় না, ফুটবল খেলার মাঠের মত লম্বা-চওড়া হতে হয়। কথাটা ঝুমা তাকেই বলেছে-এ নিয়ে সুদামের মনে সন্দেহ নেই। অমন গায়ে পড়া মেয়ের সাথে সে নিজেও ভালবাসার খেলা খেলতে চায় না। তাকে সতর্ক করে দিয়েছে, হেলেঞ্চা শাক তেতো হলেও নিমপাতার গুণ থাকে না। চোখে যা দেখবে সেটাই সব দেখা নয়। মন যা বলতে চায় তাই করো। আসল নকলের ফারাক না বুঝলে মানুষ ঠকে যায়।

ধাঁধা লাগা এই কথার অর্থ বুঝতে পারেনি সুদাম। দেওয়ালের ছবিগুলো তেমনই যেন অর্থহীন তার জীবনে। শুধু স্বপ্ন দেখায় কিন্তু বাস্তবের মাটিতে কোন দাগ কেটে যায় না। সুদাম তবু চেয়ে থাকে ছবিগুলোর দিকে। মন কেমন করে ওঠে তার। নিজেকে প্রশ্ন করতে মনে হয়—এমন মানুষজীবনের কি প্রয়োজন যেখানে জীবনের কোন শেকড় নেই, মাটি নেই। এক রাশ হতাশা সুদামের মনে বিছিয়ে গেল ধীরে ধীরে। চোখের নিচের চামড়া কুঁচকে গেল। গলার ভেতরটা চ্যাটচ্যাটে হয়ে উঠল সহসা। তার যেন এখন ঢোক গিলতে কষ্ট। এখানে না এলে বুঝি ভাল হত। দুঃখ-ভার লাঘব করতে এসে আবার দুঃখের দেশে তলিয়ে যেতে কারই বা মন চায়? সে তবু জোর করে ঢোক গিলল। রোগা শরীরটায় কাঁপুনি উঠল হঠাৎ। মৌরালা মাছের সাঁতার কাটার মত ক্ষুদ্র ঢেউ উঠল হৃদয় জুড়ে। সুদাম আকাশের দিকে তাকাল। একটা একলা চিল আকাশে উড়ছে স্থির হয়ে। কত ছোট দেখায় তাকে। অত উপরে থেকে চিলটা কি ইঁদুর কিংবা মুরগীর বাচ্চা দেখতে পায়? উপরে উঠে গেলে অনেকেই তো নীচের জিনিস দেখতে পায় না। চিলের মত নয় পোষা কাকাতুয়ার মত সামনে এসে দাঁড়াল ফুড়কুনী। কে যে ওর বিদ্‌ঘুটে নাম রেখেছিল, এর ব্যাখ্যা এখন জীবন মাষ্টার দিতে পারে না। সুদাম পায়ের শব্দে চমকে উঠে তাকাল। একি দেখছে সে? মরুভূমির কাছে কি এগিয়ে এসেছে জলাশয় নাকি জলাশয়ের কাছে ছুটে এসেছে মরুভূমি! তার চোখের পলক পড়ে না। বর্ষাধোয়া পদ্মপাতার মত গোল মুখশ্রী নিয়ে তার সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে সে কি ফুড়কুনী নাকি কুমোর বাড়ির দেবী-প্রতিমা? কতদিন পরে ফুড়কুনীকে দেখছে সে। এর আগেও দেখেছে তবে আজকের এই দেখা সব দেখাকে ছাপিয়ে যায়। তাঁতের শাড়ির চওড়া পাড় বুকের উপর ফেলে টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে যে মেয়েটা তাকে কি এর আগে সুদাম দেখেছে? মেয়েরা দিনে দিনে বড় হয়। তাদের বড় হওয়া নদীর জলস্ফীতির মতন। সুদাম নির্নিমেষে চেয়ে আছে সেই লাবণ্যময়ী মুখের দিকে যে মুখ সদ্য বেরনো কচি পাতার চেয়েও কোমল। মানুষের চোখে যাদু থাকে, চুম্বক থাকে—সেই অসামান্য শক্তি এই অনাথ মেয়েটি পেল কোথা থেকে? এ যেন অপরাজিতা ফুলের মত গোপনে নিজেকে বড় করে

তুলেছে সবাইকে চমকে দেবে বলে। ফুড়কুনীর দু হাত ভর্তি কাচের চুড়ি, দুই ভ্রূ'র মাঝখানে ছোট লাল টিপ তার গোল মুখটাকে উচ্চ-ফলনশীল ধানমাঠের চেয়েও আরও ধনী করে তুলেছে। ফুটফুটে রোদে একি দেখছে সুদাম? তার চোখের তারা টনটনিয়ে ওঠে ফুড়কুনীর টিপটার দিকে তাকাতে গিয়ে। সে যেন হারিয়ে ফেলেছে কথা। তার যাবতীয় দুঃখ ব্যথার অবসান ঘটে গেছে। অনেক হালকা আর প্রফুল্ল মনে হচ্ছে নিজেকে। আকাশের চাঁদ যদি সামনে এসে দাঁড়ায় তাহলে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া যায় অনাদরে? সুদাম কি বলবে কথা হাতড়াল। তার আগেই বাতাসে বেজে উঠল আড়বাঁশি, লেবু কোয়া পাতলা ঠোঁট নাড়িয়ে অষ্টাদশী ফুড়কুনী বলল, দেওয়ালের আলপনাগুলো কোজাগরী লক্ষ্মী পূজোয় দিয়েছিলাম সুদাম দেখল ফুড়কুনীর দু-চোখে আকাশের রঙ। সে নিজেই হয়ে গেছে অসীম আকাশ।

॥ এগার ॥

আকাশের ঠিকানা যে জানে তার অন্য কোন ঠিকানা না জানলেও জীবন জলে ভাসা ছোট্ট ডিঙার মত তরতরিয়ে চলে যাবে। ফুড়কুনীর দু চোখের দিকে তাকিয়ে সুদাম মনে মনে ভাবল কথাগুলো। তার ভাবনাগুলো ফুঃ দেওয়া শিমুল তুলোর মত উড়িয়ে দিল ফুড়কুনী। সুদামের কাছে দাঁড়িয়ে সে বলল, বেলা অনেক হল, মা তোমাকে বলেছে স্নান করে আসতে। তুমি পুকুরে নাইতে পারো, নাহলে ডিপ-টিউবওয়েলের কাছে চলে যাও। ডিপ-টিউবওয়েলের জল খুব ঠাণ্ডা। স্নান করে মজা পাবে সেখানে। জান, আমারও খুব ইচ্ছে করে ওই ফর্সা ধবধবে জলে চান করি, কিন্তু মেয়ে বলে পারি না। মাঠে তো সবসময় লোক থাকে, লুকিয়ে চান করলে বাবা দেখলে বকবে। মেয়েদের কত অসুবিধা বল তো?

সুদাম গামছা আর তেলের বাটিটা নিয়ে চলে গেল ফিটকিরি-রঙ তরল-জ্যোৎস্না জলের কাছে। উদ্গত জলে হাত ছোঁয়াতেই তার মনে হল সে যেন ফুড়কুনীর মসৃণ দেহলতায় হাত দিয়েছে। একটা শীতল অনুভূতি মুহূর্তে মিশে গেল তার রক্তে। একি ভাবছে সে ফুড়কুনীকে নিয়ে। ফুড়কুনী এখন জীবন মাষ্টারের মেয়ে। একটা ভিন্ন পরিবেশে সে বড় হচ্ছে, পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকা কাঁঠালীচাঁপা ফুলের মত তার যৌবন লাবণ্য, যেন সুগন্ধ ছড়াচ্ছে দিকে দিকে। সেখানে নিজেকে ভ্রমর ভাবতে সুদামের লজ্জা বোধহয়। কোথায় ফুড়কুনী আর কোথায় সে! বামন হয়ে এতো চাঁদে হাত দেওয়া। ভরত বলত, পড়া লিখা শিখে কি হবে তোর? তার চেয়ে জাত ব্যবসাটা ভাল করে শিখে নে। সবাই ধোকা দিলেও হাতের কাজ কোনদিন ধোকা দেবে না।

সুদাম জেদ ধরত ছোটবেলায়, আর রেগে যেত ভরত। রেগে গিয়ে সে বলত, বাপের পেছনে কাপড় নেই, ছেলের যত সাহেবপনা। কি হবে দু-কলম লেখা পড়া শিখে? তাতে কি আমার দশ কাঠা জমি দশ বিঘা হয়ে যাবে? তেমন ভাগ্য করে

আমরা কেউ আসিনি। আমাদের ফুটো কপাল। ঝামা দিয়ে ঘষলেও তা ঝকঝকে হবে না কোনদিনও।

স্নান সেরে মুখ নীচু করে দাওয়ায় উঠে এল সুদাম। ভাতের থালা সাজিয়ে ফুড়কুনী অবাক চোখে কি দেখছে তাকে। কি দেখছে সে? ঝুমার মত মনে মনে কি মাপছে বুকের বহর? খেতে বসে গলায় ভাত আটকে গেল সুদামের। ঢকঢক জল খেয়ে তবে গিয়ে শান্তি। পাশে রাখা গামছাটা সে বাঁ-হাত দিয়ে তুলে নিল গায়ে। ভাল করে ঢাকল শরীর। জীবন মাষ্টার বলল, গামছা গায়ে দিয়ে খেতে নেই রে! বাবা-মা বেঁচে থাকতে কেউ কি গামছা গায়ে দিয়ে খায়? খুলে ফেল ওটা। ভেজা গামছাটা ফুড়কুনীকে দিয়ে দে, ও বেড়াতে শুকোতে দিয়ে আসুক।

গামছা অনিচ্ছা সত্ত্বেও দিয়ে দিল সুদাম। ফুড়কুনী ভেজা গামছা মেলে দিয়ে এল বেড়ার উপর। চিতেকচার বেড়ায় রোদ পড়েছে হুমড়ে। হাত-মুখ ধুয়ে এসে সুদাম ভাবছিল-এরপর তার কি করণীয়? কোথায় কার অন্ন লেখা থাকে কেউ জানে না। ফুড়কুনী পুকুরের ধারে এসেছে গামছা নিয়ে। সুদামকে বলল, হাত মুছে নাও। আমি তক্তাপোষে মাদুর আর বালিশ পেতে দিয়ে এসেছি। একটু গড়িয়ে নাও, তারপর বিকেল হলে যেও।

এ কী শুনছে সুদাম, তার নিজের কানকে বিশ্বাস হয় না। ফুড়কুনী সরস চোখে তাকাল, খালি গায়ে থাকতে তোমার খুব লজ্জা লাগে তাই না? তবে তোমার লজ্জা পাওয়ার কোন কারণ নেই। চেহারায় শকুন বড় হলেও আমি টিয়া পাখি ভালবাসি। কথাগুলো ছুঁড়ে দিয়ে ফুড়কুনী আর দাঁড়াল না, সোজা চলে গেল হেঁসেল ঘরে।

রোদ চলে গেলে ফুড়কুনীর মুখখানা যেন গ্রামের মুখের মত করুণ হয়ে যায়। ছায়া ঢাকা পথে তখন ছায়া থাকে আমপাতার। অর্জুনের মসৃণ ডালে বসে ঘুঘু ডাকে এক নাগাড়ে। ঘুঘু এই ডাক কাকে শোনায়? তারও কি ফুড়কুনী আছে, আছে পদ্মাদীঘির মত বিশাল মনের মেয়ে-ঘুঘু। সুদাম আশ্চর্য হয়, পাখিরা জোড়া বেঁধে থাকে সবসময় তবু ওরা ডাকে, কেন ডাকে?

আগড় সরিয়ে পথে এসে দাঁড়াল সুদাম। দিনের প্রখর রৌদ্রতাপে ঝিমিয়ে গিয়েছে গাছগুলো। নানা চিন্তায় পরিশ্রান্ত শরীর নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। জীবন মাষ্টার দোকানে যাওয়ার আগে ডাকেনি। সে শুধু বলে গিয়েছে, ওকে কাঁচা ঘুম থেকে ডেকে তুলিস না। যখন ঘুম থেকে উঠবে তখন দোকানে পাঠিয়ে দিবি। দেখি ওর জন্য কিছু করা যায় কিনা।

পথে এসে পিছন ফিরে তাকাল সুদাম। ফুড়কুনী প্রজাপতি হয়ে উড়ে এল তার কাছে, নীচু গলায় বলল, আবার এসো। তুমি এলে আমার ভাল লাগবে।

সে এলে কেন ফুড়কুনীর ভাল লাগবে? কেন? সুদাম ভাবল। শেষে জড়োসড়ো হয়ে এল তার চোখ-মুখের চেহারা। লজ্জা তার কয়লা রঙের শরীরে আগুন ধরিয়ে দিল। সে মুখ নীচু করে হেঁটে এল আলের কাছে। তখনও দেখল বকগুলো এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে পোকা খুঁটে খাওয়ার জন্য। এমন ধৈর্য যদি তার থাকত? তাহলে

সে বিশ্বজয় করে ফেলত।

স্বপ্নবিলাসী সুদাম স্বপ্নের ঘোরে হাঁটে। পথে তার সাথে দেখা হয় ঝুমার। ঝুমা গিয়েছিল পাশের গ্রামে কুটুমঘরে। সুদামকে সে একা এমনভাবে পেয়ে যাবে কল্পনাও করেনি। ঝুমা হি-হি করে হাসল বাতাসে ঢেউ তুলে। সুদামের দিকে তাকাল অর্থপূর্ণ চোখ মেলে। তারপর ঠোঁট কামড়ে বলল, ঐ দর্জির মেয়েটা তোমার জন্য আগড় ধরে দাড়িয়ে আছে দেখলাম। কী ব্যাপার, হঠাৎ যে জীবন মাষ্টারের বাড়ি এলে?

কেন আসতে নেই বুঝি? সুদাম বিরক্ত হল। তার এই বিরক্তি হাসির কারণ হল ঝুমার কাছে, সে বেঁকিয়ে-পেঁচিয়ে বলল, মাষ্টারের কুড়িয়ে পাওয়া মেয়েটা খাসা দেখতে হয়েছে! হবে না কেন, বাবুঘরের মেয়ে মনে হয়? গায়ের রঙ দেখেই বোঝা যায় এ জিনিস গাঁয়ে-ঘরে জন্মাবে না। তা সুদামদা, ফুড়কুনী কি জানে সে বেহায়া মায়ের বাচ্চা!

তুমি চুপ করবে? ধমকে উঠল সুদাম। তার চোখে-মুখে কষ্টের রেখাগুলো ফুটে উঠতেই আবার বাঁধনছাড়া হেসে উঠল ঝুমা, গায়ে বড্ড লাগল বুঝি? লাগলেও আমার কিছু করার নেই। তুমি নিজে চ্যাং-মাছ হয়ে গভীর জলের ইলিশ মাছের সাথে সম্পর্ক গড়তে যাচ্ছ। যেদিন গভীর জলে থৈ পাবে না, সেদিন পুকুরের বৈষ্ণবীমাছ ঝুমাকে মনে পড়বে। সেদিন তুমি আর আমাকে পাবে না। আমি তখন অন্য খাঁচায় বন্দী হয়ে যাব।

ঝুমার উৎশৃঙ্খল হাসি আর কথা শুনে যেন শুঁয়োপোকা ছেড়ে দিল সুদামের গায়ে। সে কানে আঙুল দিয়ে পিচ রাস্তার দিকে তাকাল। বড় ট্রাকে কনক্রীটের স্লিপার যাচ্ছে দীঘার দিকে। রেল লাইন পাতার কাজ চলছে পুরো দমে। ভারী ভারী ট্রাকের অত্যাচারে নিরীহ পিচ রাস্তার প্রাণ যাই-যাই দশা। ঐ বিশাল চেহারার ট্রাকগুলোর দিকে তাকিয়ে আবার স্বপ্ন দেখা শুরু হল সুদামের। সেদিন এক ফড়ে এসেছিল মজুরের খোঁজে। নতুন রেল-লাইন পাততে গেলে কয়েক শ' মজুর দরকার। গোবিন্দ তাকে চা-দোকানে নিয়ে গিয়ে টোষ্ট খাওয়াল। ফড়ের সাথে দীর্ঘ আলোচনা হল নীচু গলায়। দূরে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ্য করছিল সুদাম। গোবিন্দ এগিয়ে এসে বলল, কিরে মজুর হবি? রোজ ভাল টাকা দেবে। হালকা কাজ।

সুদাম রাজি হয়নি গোবিন্দের কথায়। অসহায় মীরাকে যে ভোগ করতে চায় তার সাথে কোন বোঝাপড়া নয়। সময় আসলে সে এর বদলা নিয়ে ছাড়বে। ফলে গোবিন্দ ফিরে গেল রামনগর। সেই থেকে পাড়ায় হীরো হয়ে গেল মাথা মোটা গোবিন্দ। সে মাথা পিছু পঁচিশ টাকা করে অগ্রিম নেয়। কাজ পাওয়ার লোভে লোক দেয়ও তাকে। অথচ ঘেন্নায় মরে সুদাম। সে জীবনে কোনদিন ঠকিয়ে বাঁচবে না। তাতে উপোস দিতে হলেও সে পিছপা হবে না।

পাকা রাস্তায় উঠে এসে সম্পূর্ণ বদলে গেল ঝুমা। গলায় শুয়ে থাকা রূপোর হারটা আঙুলে জড়াতে জড়াতে বলল, আজ পুব পাড়ায় ভিডিও দেখতে যাব। যদি তোমার ইচ্ছে হয় তবে এস। আর যদি না আসো তবে ধরে নেব তুমি ইলিশের

দিকে ঝুঁকেছ? ঝুমা শাড়ির আঁচলটা বুকের উপর লেপটে কোমর দুলিয়ে চলে গেল। তার চলে যাওয়ার দেহ-ভঙ্গিটা বড় উগ্রধরনের। সুদামের গা গুলিয়ে উঠল হঠাৎ। সে নিজেকে শান্ত সংযত রাখার জন্য দূরের দিকে তাকিয়ে থাকল অপলক। সন্ধ্যা উড়িয়ে দিয়েছে চুমকি বসানো কালো ওড়না বাতাসে। পৃথিবী যেন বোরখা পরবে আর একটু পরে। বাতাস বয়ে আনে সেই আগমন বার্তা। সুদাম আর দেরি না করে দ্রুত পায়ে হেঁটে এল জীবন মাষ্টারের দোকানে। ফুড়কুনী আসার সময় বলে দিয়েছে দেখা করতে।

ঘরের মাঝখানে তারে ঝোলানো একটা শ'পাওয়ারের বাল্ব। আলোয় ভরে গেছে জীবন মাষ্টারের দোকান। সুদাম গিয়ে মেসিনের সামনে দাঁড়াতেই সেলাই করা থামিয়ে তাকাল জীবন মাষ্টার। নাকের উপর ঝুলে পড়া চশমাটা ঠিক করে সে গুরুগম্ভীর স্বরে বলল, তোর জন্য একটা কাজের ব্যবস্থা করেছি। তুই রাজি আছিস তো?

সুদাম ভাবল রেল-লাইন পাতার কাজে যেতে হবে তাকে। সে সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নাড়ল, যেখানে গোবিন্দ আছে সেখানে আমি যাব না।

আকাশ থেকে পড়ল জীবন মাষ্টার, তুই ঘোরের মধ্যে আছিস নাকি? আমি বললাম হাত, আর তুই শুনলি হাতি! ঠোঁট ভরিয়ে হেসে উঠল জীবন মাষ্টার, পাঁচুর সাইকেল দোকানে তুই কাজে লেগে যা। ওর একজন ছেলের দরকার।

কিন্তু আমি যে সাইকেলের কাজ জানি না। নিষ্প্রভ চোখে তাকাল সুদাম।

জানিস না যখন শিখে নিবি। জীবন মাষ্টার জোর গলায় বলল, টিউব লিক সারাতে শিখতে হয় নাকি। দু' একবার দেখলেই তুই করতে পারবি। যা, পাঁচুর সাথে দেখা করে আয়। বলবি আমি পাঠিয়েছি।

দেখা করতেই পাকা হয়ে গেল কাজ। পাঁচু সল্যুউশনের কৌটা হাতে নিয়ে বলল, কাজ আমি শিখিয়ে নেব তবে কামাই করলে চলবে না। প্রথম দু-মাস আমি তোর কাজ দেখব তারপর মাইনের কথা ভাবা যাবে। তবে যেদিন কাজে আসবি চা-জলখাবার ফ্রি পাবি। পয়সা মারলে ভাগিয়ে দেব। আমি কোন চোরকে দোকানে রাখব না।

পরের দিন থেকে নতুন উদ্যমে কাজে লেগে গেল সুদাম। সাইকেল দোকানের কাজ তেমন কোন পাথর ভাঙা কাজ নয়। টায়ার-লিভারে কি ভাবে টায়ার খুলতে হয় মাত্র তিনদিনেই সড়গড় হয়ে গেল সুদাম। পাঁচু তার কাজ শেখার আগ্রহ দেখে বলল, এই আগ্রহটা যেন শেষ পর্যন্ত থাকে। যা, হাতের তেল-কালি ধুয়ে নিমাইয়ের মায়ের তেলে ভাজা নিয়ে আয়। মুড়ির সাথে তেলেভাজা খেলে স্বাস্থ্য ফুলে যাবে।

নিমাইয়ের মায়ের তেলে-ভাজা এ বাজারে নাম-করা। দামে সস্তা, সাইজেও বড়। বেশ কড়া করে ভাজে। খেতে গেলে পোড়া তেল জড়িয়ে যায় পুরো ঠোঁটে। তেলে ভাজার দোকানে গিয়ে সুদামের সাথে দেখা হয় ফুড়কুনীর। সেও চপ কিনতে এসেছে। ঠোঁটে হাসি ছড়িয়ে ফুড়কুনী শুধায়, ভাল আছো?

সুদাম বোকার মত তাকাল। ফুড়কুনীকে দেখামাত্রই তার বুকের বাগানে ঝড় উঠল। ফড়কুনী কাছে সরে এসে বলল, বাবার মুখে তোমার কাজের খবর পেয়েছি। শুনে

খুব ভাল লাগল। ছেলেরা নিজের পায়ে না দাঁড়ালে তাদের বুদ্ধি খোলে না। তুমি দেখছি কাজ পেয়ে আরও বোকা হয়ে গেলে!

বেলুন চুপসান মুখ করে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সুদাম, তার সব ভাষা মুখ থেকে বুকের খোদলে লুকিয়ে গিয়েছে। ফুড়কুনী চপের ঠোঙাটা হাতে ধরে বলল, আঃ, কি গরম! দেখ, ঠোঙাটা কেমন তেলে ভিজে গেল! আমি যাই। অন্ধকার নেমে আসছে। সে দু-পা এগিয়ে গিয়ে হাতের ইশারায় ডাকল সুদামকে, তুমি একটু আমাকে এগিয়ে দেবে? রাস্তা ফাঁকা। একা যেতে ভয় করছে।

সুদাম অনেকক্ষণ পরে বলল, আমি গেলে তোমার ভয় কাটবে? পথে কেউ যদি তোমাকে ধরে আমার ক্ষমতা কি যে তোমাকে বাঁচাব। তবে বলছ-যখন যাবো। একটু দাঁড়াও, তেলে ভাজাটা দিয়ে আসি।

সুদাম ছুটে গেল সাইকেল দোকানের দিকে। ফিরে এল হাঁপাতে হাঁপাতে। ফুড়কুনী লাইট-পোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে ছিল মুখ নীচু করে। সুদাম কাছে যেতেই সে কোন কথা না বলে আগে আগে হেঁটে গেল। বাজারের আলো যেখানে পৌছায় না, সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, মিষ্টি করে বলল, যাক বাঁচা গেল বাবা। আলোকে আমার খুব ভয় লাগে। বরং এই অন্ধকারই ভাল। আঁধারে অনেক কথা বলা যায় সহজে। সুদাম শুনল কিন্তু কোন উত্তর দিল না। তার বেশ গর্ব হচ্ছিল ফুড়কুনীর পাশাপাশি হাঁটতে। এর আগে সে কি কোনদিন কোন যৌবনবতীর পাশাপাশি হেঁটেছে? মন বলল, না। হঠাৎ ফুড়কুনী তার উপর কেন এত সদয় হল সে ঠিক বুঝতে পারল না। একটা ধোঁয়াশা সম্পর্ক দানা বেঁধে উঠল তার মনের ভেতর। ভয় পেল সে। বালিয়াড়িতে ঘর বাঁধা সহজ কাজ নয়। বালি ঝড়ে উড়ে যেতে পারে স্বপ্নমিনার। টায়ার ফুটো হলে সে জুড়তে পারে কিন্তু মন ফুটো হলে? আবার ভয়টা ঠেলে ওঠে সুদামের রক্তে। সে ইচ্ছে করেই একটু দূরত্ব রেখে হাঁটছে। ফুড়কুনী বুঝতে পেরে বলল, আমার কোন ছোঁয়াচে রোগ নেই। তুমি কাছে সরে এসো। ক্ষতি হবে না। আলের শেষ কিনারে চলে গেলে ধান ক্ষেতে যে পড়ে যাবে।

লজ্জা পেল সুদাম। জোর করে হাসতে গিয়ে আবার ধরা পড়ে গেল সে। ফুড়কুনী আলোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল সহসা, রাগ দেখিয়ে বলল, তুমি চলে যাও। আমি বোবার সাথে হাঁটতে শিখিনি।

সুদাম বলল, তোমার পাশে হাঁটতে গেলে আমার সব কথা শেষ হয়ে যায়। আমি কি বলব বুঝে পাই না। চোখ দুটো আমার কথা শোনে না। তুমি এলে আমার চোখ দুটো তোমার মধ্যে মিশে যায়। কেন যায় তাও আমি জানি না। রাতে বিছানায় শুয়ে তোমার মুখটা মনে ভাসে। দুধের সরের চেয়েও নরম সেই মুখ আমাকে সারা রাত ঘুমাতে দেয় না। আমি জেগে জেগে তখন স্বপ্ন দেখতে শুরু করি। আমি জানি তোমাকে নিয়ে ভাবা আমার অন্যায়। এটাও এক ধরনের পাপ। তাই তুমি কাছে এলে আমি ভাবি—আমার সামনে ফুলের গাছ। কখনও ভাবি তুমি মন্দির। সবাই কি মন্দিরে ঢোকার অনুমতি পায়?

ফুড়কুনী স্তব্ধ চোখে সুদামের কাঁপা ঠোঁটের দিকে তাকাল, আমি মানুষ, তোমার কাছের মানুষ—এমনটা কেন ভাব না? আমার মনটা ইঁট-পাথরের নয়। আমি ঘাসফুল ভালবাসি। বাগানের ফুল আমাকে টানে না। কেন টানে না জান? যখন ভাবি এই পৃথিবীতে আমার আপন বলতে কেউ নেই, তখন আমার নজর চলে আসে ঘাসের দিকে। ঐ ঘাসগুলো আমার মা, তারা আমার আপনজন। নিজেকে বাড়িয়ে ভাবার মেয়ে আমি নই। যার শেকড় নেই, পায়ের তলায় মাটি নেই—সেই-ই তো খোঁজ করে তার মতন আরেকজনকে। আমি এতদিন পরে খুঁজে পেয়েছি নিজের মানুষ যে অন্তত আমার পুরনো ইতিহাসকে ভুলে আমাকে আপন করে নেবে।

তারায় ঝকমক করে সন্ধ্যা রাত। ফুড়কুনীর চোখের তারায় জ্বলে ওঠে হাজার মোতির অশ্রু। সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে পারে, শুধু মুখ ঘুরিয়ে অপলক চেয়ে থাকে ধানমাঠের দিকে। একটা লক্ষ্মী পেঁচা উড়ে এসেছে ইলেকট্রিকের তারে, দূর থেকে মনে হয় যেন আটকে গেছে সাদা উলের গোলা। ফুড়কুনী চোখের জল মুছে নিল শাড়ির আঁচলে, চুড়ির রিনঝিন শব্দে মুখরিত হল বাতাস। সুদাম কান পেতে শুনল এই মায়ারী শব্দ। নীরবে হাঁটতে হাঁটতে তার হাত স্পর্শ পেল ফুড়কুনীর। চমকে উঠল দুজনে। থেমে গেল চলার গতি। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হেসে উঠল ওরা অকারণে। বাতাসে আছড়ে পড়েছে ফুড়কুনীর কানের দু পাশের ফোলান চুল, হাওয়ায় ফুলে উঠছে চুলের ঢেউ। ফুড়কুনী কি ভাবে তারায় ভরা রাত হয়ে গেল সুদামের চোখে। মুগ্ধ-বিস্ময়ে সুদাম বলল, শাপলাফুলের সুগন্ধ আসে তোমার শরীর থেকে। তুমি যে সুগন্ধ ছড়াও—তাতে সবাই পাগল হবে। তখন সেই পাগলের ভিড়ে তুমি কি আমাকে চিনতে পারবে? আমার কিছুই নেই যে তোমাকে দেব তবু তোমাকে কাছে পেলে ভাবি—তুমি আমার অনেক দিনের চেনা। তুমি হারিয়ে যাবে জেনেও আগুনপোকার মত ছুটে আসি। যদি মন চায় পোড়াও আমাকে, দুঃখ পাব না। যাকে মন চায় তার জন্য হৃদয় উপড়ে দিতেও কষ্ট হয় না।

পায়ে পায়ে ফুরিয়ে আসে পথ। সুদাম উদাস হয়ে ওঠে আলোর মাঝখানে এসে। সে খুব ভাল করে দেখে ফুড়কুনীকে। তার মনে হয় ফুড়কুনী পরীর দেশের মেয়ে। এ মেয়েকে স্বপ্নে দেখা যায় কিন্তু ধানখেতের আলের উপর হাতে হাত রেখে হাঁটা যায় না। ফুড়কুনী নিঃস্তব্ধতা ভাঙল। লতার মত ছুঁয়ে দিল সে সুদামের হাত, তোমাকে দেখার পর আমিও মরছি। আমি জানি না—এ আমার পাপ কিনা তবে আমি হারব না, এর শেষ দেখে ছাড়ব।

সুদাম বলল, আমাকে হারিয়ে দিলেও আমি কষ্ট পাব না। আমার শূন্য জীবনে তুমি ফুল গুঁজে দিয়েছ ভালবাসার। আমি চেষ্টা করব যাতে ফুলটা শুকিয়ে না ঝরে পড়ে।

আগড় খুলে ঘরের দিকে এগিয়ে গেল ফুড়কুনী। দেওয়ালে জ্বলজ্বল করছে পাখি-পালকি আর প্রজাপতি। ফুড়কুনী হাত বাড়িয়ে ছুঁয়ে দিতে চায় স্বপ্নকে। দেওয়াল থেকে ঝরে ঝরে পড়ে মাটি। ইলেকট্রিক তারের লক্ষ্মী-পেঁচা ভয় পেয়ে উড়ে যায় নিকষ আঁধারে। তারা খসে পড়া আকাশ তখন ধ্যানমগ্ন সেবিকা।

॥ বার ॥

আকাশ যখন ধ্যানে মগ্ন তখন মাটি থেকে সুবাস বেরয় ভুরভুরিয়ে। ফুড়কুনী চলে যাবার পরেও কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল সুদাম। আঁধার ছুঁয়ে দিল তাকে। বাতাস বলল, ঘর যাও। দীঘার ট্যুরিষ্ট বাসগুলো রাতের দিকে শহরের মাটি কাঁপিয়ে চলে যায়। কত যে যানবাহন চলে এই পিচ রাস্তায় সুদাম তার সঠিক খবর জানেনা। তবে তার মন বলে ওঠে, এই গ্রাম ছেড়ে, গ্রামের গাছপালা খানাডোবা বাঁশবন ছেড়ে পালিয়ে যেতে চায় অন্যত্র। শহরের মানুষ কত ফিটফাট থাকে, তাদের কথাবার্তা চালচলন কত মার্জিত যা দেখলে নিজেকে কেঁচোর চেয়ে হীন মনে হয় সুদামের। গ্রামের ইস্কুলে যে নতুন মাষ্টার এসেছেন তার বাড়িও কলকাতায়। বাংলা মাষ্টার পাশের বাড়িতে নামমাত্র টাকায় ভাড়া থাকে। সুদামের সঙ্গে আলাপ হয়েছে ভদ্রলোকের। তিনি সব শুনে সুদামকে বললেন, গ্রামে পড়ে থাকলে ভবিষ্যত গড়ে ওঠবে না। নিজেকে তৈরী করতে হলে গ্রামের মায়া ছাড়তে হবে। বেরিয়ে পড়তে হবে ঘর ছেড়ে। এখানে কলকারখানা কিছু নেই। চাকরিরও কোন সুযোগ নেই। তাপসবাবুর কথাগুলো খুব মন দিয়ে শুনেছিল সুদাম। তার মনে তখন একটাই প্রশ্ন—সে যদি এখান থেকে চলে যায় তাহলে মীরাকে কে আগলে রাখবে। গ্রামে গোবিন্দর সংখ্যা নেহাত কম নেই। তাছাড়া পার্টি-পলিটিকস বাড়ছে। মারিমারি কাটাকাটি তো লেগেই আছে। খরার আগুনের চেয়ে এই আগুন আরও তীব্র। ফুড়কুনীও চায় না সুদাম গ্রাম ছেড়ে চলে যাক অন্য কোথাও। কেন যাবে সে? গ্রামের মানুষ কি খেয়ে-পরে বেঁচে নেই? টাকাই জীবনের সব কথা নয়। টাকার বাইরেও মানুষের জীবন আছে যাকে অর্থ বা অন্য কিছু দিয়ে মাপা যায় না। তাপসবাবুর কথায় সাময়িক ঘাড় নাড়লেও সুদাম পরক্ষণে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় তাকে, শহরের এত চাকরি, সুযোগ-সুবিধা ছেড়ে আপনি কেন গ্রামে এলেন? এখানে আপনি হাতের কাছে ডাক্তার পাবেন না, ভাল জামা-কাপড় কিনতে হলে আপনাকে রামনগর কিম্বা এগরা যেতে হবে।

তাপস সহসা একথার কোন উত্তর দিতে পারেনি। কলকাতা ছেড়ে আসার তার একটাই কারণ, মানসী। মানসী তাকে মন থেকে ছুঁড়ে না দিলে তিনি হয়ত কোনদিনও কলকাতা ছাড়তেন না। কলেজ জীবনের বান্ধবী একদিন তার প্রেমিকা হয়ে গেল। জীবনের অনেকটা সময় মানসী কেড়ে নিয়েছে। এম-এ পড়ার সময়ই বিয়ে করার কথা বলেছিল মানসী। তখন গুরুত্ব দেয়নি তাপস। তিনি মানসীকে বুঝিয়ে বলেছিলেন, এখন বিয়ের ঝামেলায় জড়িয়ে গেলে দুজনেরই পড়াশোনা মার খাবে। আগে এম-এ পাশ করি, চাকরি পাই তারপর ঘর বাঁধব দুজনে। তাছাড়া এত তাড়াহুড়োর বা কি আছে? আমরা কেউই আলদা হয়ে বাঁচতে পারব না। আমাদের সম্পর্কের শিকড় অনেক গভীরে ছড়িয়ে গেছে। আমি মনে করি লাল ডাঁটাগাছের মত আমাদের ভালবাসা নয়, আমাদের ভালবাসা হল বোটানিক্যাল গার্ডেনসের সেই প্রাচীন বট গাছ—যে কিনা ঝুরি নামিয়েছে চতুর্দিকে। এরপরে আর ফিরে তাকানো যায় না।

দুজনের ছায়ায় আমরা দুজনে বাঁচব। পৃথিবীর কোন অশুভ শক্তিই আমাদের আলাদা করতে পারবে না।

মানসী তাপসের আবেগমথিত কথাকে আমল দেয় নি সেদিন, শুধু মলিন হেসে বলেছিল, বাড়ি থেকে খুব চাপ আসছে। বাবা রিটেয়ার করেছে। তার উপর চেষ্ট-পেইন, হাই-ব্লাড সুগার। সঙ্গে হাই-প্রেসার। বাবার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। বাবা চায় আমার বিয়ে দিয়ে শান্তিতে মরতে। আমি বাবার মুখের উপর কিছু বলতে পারি না। বাবাকে আমার ভীষণ ভয় লাগে। যদি আমাদের এই সম্পর্কের কথা শুনে সে হার্ট-ফেল করে তাহলে যতদিন বাঁচব মাথা তুলতে পারব না। তাই তুমি যদি একবার আমাদের বাড়িতে যেতে, সবাইকে বুঝিয়ে বলতে তাহলে মনে হয় অনেক প্রবলেম সমাধান হয়ে যেত। আমিও নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারতাম।

মানসীর অনুরোধে তাপস এক রবিবারে মুখোমুখি হয়েছিল হবু-শ্বশুরের। মানসীর হতাশাগ্রস্ত অসুস্থ বাবা তার চাকরি নেই জেনে মুখের উপর প্রস্তাব নাকচ করে দিলেন। তাপস অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি সফল হলেন না। মানসীর বাবা রেগে মেগে উত্তেজিত হয়ে বলেছিলেন, এযুগে চাকরি না থাকলে তার এক পয়সাও দাম নেই। তুমি মানসীকে বিয়ে করে খাওয়াবে কি, রাখবে কোথায়? জান, মানসী আমার একমাত্র মেয়ে। মরার আগে আমি তাকে সুখী দেখে যেতে চাই। আমার শেষ স্বপ্ন ভেঙে দেবে না, এটাই অনুরোধ। প্লীজ, এবার তুমি যেতে পার। তুমি থাকলে আমি অসুস্থবোধ করছি।

এ ঘটনার পরে পাকা তিন মাস মানসী গৃহবন্দী হল, সে আর ইউনিভারসিটি আসত না। একদিন গড়িয়াহাটের মার্কেটে মানসীর সঙ্গে দেখা হল তাপসের। মানসী পাশ কাটিয়ে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যেতে চেয়েছিল কিন্তু তাপস তা হতে দিলেন না। তিনি ছুটে গিয়ে মানসীর হাত ধরলেন পিছন থেকে, রাগে জ্বলে উঠল তার বুকের হৃৎপিণ্ড, অবশেষে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, কী ব্যাপার আর ক্লাসে আসছ না কেন? আমি তোমার জন্য কফি-হাউসে বসে থাকি। রাত আটটা পর্যন্ত বসে-বসে বোর হয়ে চলে যাই। তুমি কি আমার উপর রাগ করে আছ মানসী? সেদিনের বিয়ের প্রস্তাবের কথা আমি আবার ভেবেছি। ভেবে দেখেছি তুমিই ঠিক কথা বলেছ। প্রেম করলে অপেক্ষার ফল অনেক সময় তেতো হয়ে যায়। কালই চলো, আমরা কালীঘাটে গিয়ে বিয়ে করে নিই। মানসী চুপচাপ স্ট্যাচুর মত দাঁড়িয়ে থাকে। হঠাৎ তাপসের নজরে পড়ে বিগ-সপার চটের ব্যাগটার দিকে। বেনারসীর সুদৃশ্য প্যাকেটটা জ্বলজ্বল করছে তার ভেতরে। তাপস অবাক হয়ে শুধোলেন, বেনারসী কিনেছ কার জন্য? মানসীর চোখ নুয়ে এল রোদে ঝলসান ফুলের পাপড়ির মত, সে ঢোক গিলে ছলছলে চোখে বলল, আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। পনেরই শ্রাবণ আমার বিয়ের ডেট। বাবার এক বন্ধুর ছেলে কুশাল, যে যাদবপুর থেকে পাশ করে এখন ক্যালিফোর্নিয়ায় আর্কিটেক্ট ইঞ্জিনীয়ার। বেশ মোটা টাকা মাইনে পায়। আমি বিয়ের পরেই কুশালের সাথে ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে যাব। সরি তাপস, আমাকে ক্ষমা

করে দিও।

মানসী ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে গেছে, তার ইঞ্জিনীয়ার স্বামী তাকে বেশ সুখে রেখেছে, মানসী এখন মন থেকে মুছে গেছে তাপসের। কলকাতার আকর্ষণ এখন তাপসের কাছে ফিউজ বাল্ব। সে দেবদাস হতে চায়নি তাই কফি-হাউস যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। একজন স্বপ্ন ভঙ্গ মানুষের মানসিক শক্তি শূন্যে গিয়ে ঠেকে। তখন সে চারিদিকে অন্ধকার দেখে, চেনা-জানা ঘর-বাড়ি মানুষ পরিবেশ ছেড়ে যেন পালিয়ে গিয়ে বাঁচতে চায়, তাপসও বাঁচতে চেয়েছে মানসীর যন্ত্রণা থেকে। গ্রাম তার জীবনে এই প্রথম। গ্রামের মানুষ শ্রদ্ধা-ভালবাসা দিয়েছে তাপসকে, দিয়েছে নতুন জীবন। তিনি কাজের মধ্যে ডুবে থাকেন মানসীর স্মৃতিকে ভুলে থাকার জন্য। চোট খাওয়া মানুষ বুকের গভীরে যে বেদনা লুকিয়ে রাখে, গ্রামের শ্যামলী প্রকৃতি সেখানে ব্যথার মলম লাগিয়ে দেয় সঙ্গোপনে। কলকাতায় থাকতে কতদিন হাসেনি তাপস, এখানে এসে আবার হারিয়ে যাওয়া হাসি ফেরে এসেছে তার ঠোঁটে।

সুদাম এই বাংলার মাষ্টারের কাছে কৃতজ্ঞ। পাঁচুর সাইকেল দোকানে তাপস বাবুর নতুন সাইকেলটা লিক সারাতে দিয়ে গেলেন। যাওয়ার সময় বলে গেলেন, আমি দীঘায় যাচ্ছি। সন্ধ্যাবেলায় ফিরে এসে সাইকেলটা নেব।

এই সুযোগ হাতছাড়া করেনি সুদাম। ফুড়কুনীর সাথে কথা হয়েছিল পাশের গ্রামে শীতলা মায়ের মেলা দেখতে যাবে। প্রতি বছরের মত এবারের মেলাও নাকি সাতদিন থাকবে। ম্যাজিক-সার্কাস-নাগরদোলা সব এসেছে শীতলা মেলায়। সারিবদ্ধ মানুষের যাতায়াত সুদামকে অমনযোগী করে তোলে কাজে। জীবন মাষ্টারের জল খাবার দিতে এসে ফুড়কুনী ঘুরে যায় পাঁচুর সাইকেল দোকান থেকে। চুপিচুপি সে বলে যায়, আজ মেলায় যাব, তুমি আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। আমি রাস্তার ধারের লাইট-পোষ্টটার সামনে দাঁড়িয়ে থাকব সন্ধ্যাবেলায়। তুমি এসো কিন্তু, ভুল যেন না হয়।

তাপসবাবুর সাইকেলে চেপে ফুড়কুনীকে নিয়ে মেলায় যাওয়ার ভাগ্য সুদামের জীবনে যে কোনদিন আসবে এমনটা সে স্বপ্নেও ভাবে নি। স্বপ্ন সফল হতেই শীতলা মায়ের প্রতি মনে মনে কৃতজ্ঞ থাকল সে।

ফুড়কুনী নির্দিষ্ট সময়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়েছিল। আজ মেলায় যাবে বলে তার সাজ-পোষাক সম্পূর্ণ আলাদা। সে পরেছে সুধাময়ীর চওড়া পাড়ের তাঁতের শাড়ি। সুধাময়ী তাকে জোর করে এই শাড়িটা দিল, আর হাসি মুখে বলল, শীতলথানে যাচ্ছিস, ভাল করে শীতলাবুড়িকে বলবি তোর যেন ভাল ঘরে বিয়ে হয়। তোর জন্য আমার খুব চিন্তা হয় রে! যতদিন না বিয়ে হচ্ছে ততদিন আমার চিন্তার শেষ নেই।

সুধাময়ীর স্নেহ ফুড়কুনীকে গঙ্গার পবিত্রধারা হয়ে ভিজিয়ে দেয়। মায়ের চিন্তার স্পর্শ পায় ফুড়কুনী। সে একদিন নিজের কানে শুনেছে মা-বাবার আলোচনা। তার জন্মরহস্য নিয়ে এ গ্রামে ছড়িয়ে আছে নানা গল্প। আজকাল বিয়েতে শুধু পণ দিলেই সমস্যা মিটে যায় না। পাত্রপক্ষ মেয়ের মামার বাড়ির খোঁজ করে। বংশ মর্যাদা না

থাকলে চট করে কেউ নতুন সম্পর্ক গড়তে আগ্রহ প্রকাশ করে না। ফুড়কুনীর বিয়ের ব্যাপারে বংশ-মর্যাদা এবং মাতুলালয়ের প্রশ্নটা উঠেছে। ইতিমধ্যে তিনটে ভাল সম্বন্ধ নাকচ হয়ে গিয়েছে ফুড়কুনীর জন্মবৃত্তান্ত শুনে। তারা মুখের উপর বলে গেছে, না-না, ওভাবে বিয়ের মত পবিত্র সম্পর্ক হয় না। গাছ যদি ভাল না হয় তার ফলও ভাল হবে না। কাঁটা-বাঁশঝাড়ে তরলা বাঁশ পাওয়া যাবে—এটা আশা করা ভুল। জীবনমাষ্টার হতাশ হয়ে গেছে এই প্রত্যাখ্যানে। সে মনে মনে ভেবে নিয়েছে কোন কিছু গোপন করে ফুড়কুনীর বিয়ে দেবে না। গোপনীয়তা শুধু অন্যায় নয়, বড় ধরনের পাপ। ফুড়কুনীকে সে তার হাতেই তুলে দেবে যে সব শুনে রাজি হবে বিয়েতে। দেনা-পাওনার বিষয়টা যতটা পারে করবে জীবন মাষ্টার। তার ছেলে-মেয়ে নেই, এই ফুড়কুনীই হল তাদের জীবনের ধ্রুবতারা। মেয়েকে সৎ-পাত্রের হাতে তুলে দেবার জন্য যদি জমি বিক্রি করতে হয় তবু সে পিছ-পা হবে না।

অন্ধকারে তাপস মাষ্টারের সাইকেলে চড়ে স্ফূর্তিতে ব্রেক কষে দাঁড়াল সুদাম। এত খুশি সে জীবনে এর আগে কোনদিন হয়নি। ফুড়কুনী অবাক চোখে তাকিয়ে আছে সেই লাল-সাইকেলটার দিকে। তার চোখের পাতা পড়ছে না, শরীর ছুঁয়ে সুগন্ধ ভাসছে বাতাসে। সুদাম সাইকেল থেকে নেমে ফুড়কুনীর হাত ধরল, কি মেখেছো তুমি এত সুগন্ধ আসছে।

নরম হাসিতে ঠোঁট নড়ে উঠল ফুড়কুনীর, কি আর মাখব, মেলায় যাব বলে স্নো-পাউডার মেখেছি। মা এই শাড়িটা জোর করে পরতে দিল। দেখ তো এই শাড়িটা পরে আমাকে মানাচ্ছে কিনা।

দারুন লাগছে। সুদাম মুখ ফসকে বলে ফেলল, ন্যাপথলিনের গন্ধ আমার ভাল লাগে। ভাল লাগে কেউ যদি আলতা পরে পায়ে। যারা গুঁড়ো সিন্দুরের টিপ পরে কাপলে তাদেরও দিকেও চেয়ে থাকতে মন চায়।

ফুড়কুনী চিমটি কাটল সুদামের হাতে, গালে টোল ফেলে বলল, গুঁড়ো সিন্দুরের টিপ আমিও পরব খুব তাড়াতাড়ি। জান, বাবা আমার বিয়ের খুব চেষ্টা করছে। আমার ভয় করছে কেউ যদি আমার সব কথা শুনে পছন্দ করে নেয়!

তোমাকে কারোর অপছন্দ হবে না। সুদাম উদাস হয়ে গেল, তুমি হলে পদ্মপুকুরের পদ্মফুল। এখন ভ্রমর আসবে শয়ে-শয়ে। ফুল ফুটলে ভ্রমর না এসে থাকতে পারে?

আমার আর কাউকে চাই না। শুধু তুমি থেকো তাহলে সব পাওয়া হয়ে যাবে।

আমি আছি, আমি থাকব। সুদাম নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে তাকাল, তোমাকে নিয়ে আমার সব সময় একটা ভয় খেলা করে। তুমি আমার ছন্নছাড়া জীবনটাকে গুছিয়ে দিয়েছ। যদি এলমেলো করে দাও তাহলে আমি পাগল হয়ে যাব। সেদিন মরা ছাড়া আমার কোন গতি থাকবে না। জান তো যে ভালবাসার কাঙাল সে যদি হঠাৎ ভালবাসার খনি পেয়ে যায় তাহলে সে কি করবে কিছু বুঝতে পারে না। তোমাকে পেয়ে এখন আমার অবস্থা এখন অনেকটা সেইরকম। রোজ রাতে আমি তোমার

স্বপ্ন দেখি। শীতলা মাকে বলি, মাগো, আমার ফুড়কুনীকে সুখে রাখো। ওর অনেক দুঃখ, ওর সব দুঃখ আমাকে দিয়ে দাও।

ফুড়কুনীর চোখ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে, দোলা লাগা ধানগাছের মত সহসা সে নড়ে ওঠে, চুড়ি ভর্তি হাতটা বাড়িয়ে দেয় সুদামের দিকে, শক্ত করে চেপে ধরে সুদামের হাত, তারপর বিড়বিড়িয়ে ওঠে, তোমার কাছ থেকে আমাকে মৃত্যু ছাড়া আর কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। আজই আমি বাবাকে বলব তোমার কথা। বাবা-মা দুজনেই তোমাকে ভালবাসে, ওরা এ বিয়েতে রাজি হয়ে যাবে।

নতুন সাইকেলের কেরিয়ারে ফুড়কুনী বসেছে পা ঝুলিয়ে, তাকে সতর্ক করে দিল সুদাম, সাবধানে বসো। পা যেন ঢুকে যায় না চাকায়। তাহলে স্পোকে পা কেটে যাবে। ফুড়কুনী আধো স্বরে বলল, কাটতে দাও। আমার এই শরীর তোমার সমস্ত সুখচিহ্ন এঁকে নিতে চায়। সাইকেলে পা ছড়ে গেল ভাবব—কিছু তো পেলাম। চিহ্নহীন ভালবাসার কোন দাম নেই বুঝলে ন্যাকারাম?

হাসল সুদাম, সাইকেলটা আমার নয়। নতুন যে মাষ্টার এসেছে তার। লিক সারাতে দিয়ে গেল, বলল রাতে নেবে। তাই নিয়ে চলে এলাম।

ফুড়কুনীর মুখে কোন কথা নেই, নতুন মাষ্টারের কথা শুনে গলা ছাপান ঘামে ভিজে গেল তার বুকের চারপাশ। অজানা ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেল তার গোলাপী মুখখানা। অনেকক্ষণ পরে সে বলল, মাষ্টারের সাইকেলটা এনে তুমি ভাল কাজ করোনি। আগে জানলে আমি এই সাইকেলে চাপতাম না।

সুদাম আকাশ থেকে পড়ল, সাইকেলের আবার কি দোষ হল?

সাইকেলের দোষ নয়, দোষ সাইকেলের মালিকের। মাষ্টারের চাহনি আমার ভাল লাগে না। সে আমাকে গিলে খেতে চায়। লোকটা সুবিধের নয়। ফুড়কুনী আঁচল দিয়ে ঘাম মুছে নিয়ে বলল, ওকে দেখলে আমার ভয় করে। বুক শুকিয়ে যায়।

সুদাম পাত্তা দিল না ফুড়কুনীর কথায়, মেয়েরা একটু বাড়িয়ে ভাবতে ভালবাসে। ওরা অল্পতে বেশি ঘাবড়ে যায়। সুদাম বলল, আমি তাপস মাষ্টারের সাথে কথা বলেছি। কলকাতার মানুষটাকে আমার ভাল লেগেছে। জান, মাষ্টার বলেছে—আমার জন্য চাকরির চেষ্টা করবে।

মেলার মুখে এসে থেমে গেল সুদামের সাইকেল। ভিড়ে থিকথিক করছে মেলা। গোরুর গাড়ি, অটো-রিকসা, ম্যাটাডোর আর মোটর-সাইকেল ভরে আছে মেলার এক পাশে। সুদাম গিয়ে চেনা-জানা একটা মিষ্টির দোকানে সাইকেলটা রেখে এল। তারপর ফুড়কুনীর হাত ধরে বলল, চলো, মেলা দেখার আগে হাত-মুখ ধুয়ে আসি মন্দিরের পুকুর থেকে। শীতলা মায়ের পূজো দিয়ে তারপর মেলায় ঘুরব।

ওরা পাশাপাশি নেমে এল ঘাট-বাঁধন পুকুরে। শাড়ি গোড়ালির উপর উঠিয়ে ফর্সা পা ধুল্রো ফুড়কুনী। ওর রূপোর তোড়াটা জলের স্পর্শে চিকচিকিয়ে উঠল রুপাটিয়া মাছের মতন। সুদাম দেখে আর চোখ ফেরাতে পারে না। তার বুক ঢিসঢিস

করে উত্তেজনায়। চোখে-মুখে জল ছিটিয়ে নিজেকে সংযত করে সে। ফুড়কুনী ভেজা পায়ে উঠে এল পাড়ে। বাতাসা, ফুল আর নারকেল কিনল সামনের দোকান থেকে। ভিড় ঠেলে সে এগিয়ে গেল মন্দিরে। মায়ের কথা মনে পড়ল তার। হাসি পেল। ঠাকুরের কাছে কেউ কি নিজের বিয়ের কথা বলে নাকি? পূজো দিয়ে হাতজোড় করে প্রণাম করল ফুড়কুনী। প্রসাদের ডালিটা নিয়ে ফিরে যাওয়ার সময় সে দেখতে পেল মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছেন তাপসবাবু। লজ্জায়, সংকোচে আরও গোলাপী হয়ে উঠল তার মুখমণ্ডল। লাল সাইকেলের কথা ভেবে ঘামতে লাগল সে। এই প্রথম তার সুদামের উপর রাগ হল। প্রগাঢ় অভিমানে তার চোখের তারায় বিন্দু বিন্দু হয়ে বিছিয়ে গেল অশ্রুকণা। সুদাম তাকে একা ফেলে এই ভিড়ের মধ্যে কোথায় হারাল? ফুড়কুনীর ব্যাকুল দু চোখ সুদামকেই খুঁজছিল। সে ভিড় ঠেলে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে তাপসমাষ্টার হাত বাড়িয়ে দিলেন তার সামনে, অদ্ভুত গলায় শব্দ তুলে বললেন, আমাকে প্রসাদ দেবে না?

ফুড়কুনীর সারা শরীর জুড়ে কাঁপুনি উঠল। প্রসাদ দিতে গিয়ে তার মনে হল সে যেন নিজেকেই তুলে দিয়েছে মাষ্টারের হাতে। হ্যাজাকের আলোয় জলে ভরে গেল ফুড়কুনীর দু চোখ।

॥ তের ॥

মেলায় মানুষ আসে হারিয়ে যেতে।

এতক্ষণ ফুড়কুনী কোথায় যে হারিয়ে গেছে তা নিজেও জানে না। সুদাম আসছি বলে সেই যে গেল আর কোন দেখা নেই। এই গাদাগাদি ভিড়ে ফুড়কুনী কোথায় খুঁজবে সুদামকে। সে কি সত্যি সত্যি হারিয়ে গেল এই মেলায়। শুধু মুখ নয় দুঃশ্চিন্তায় সপসপে ভিজে গেল ফুড়কুনীর শরীর। সে হা করে দেখছিল অবিরত মানুষের যাতায়াত। এত মানুষের মিছিল তবু সে চেনা কাউকে দেখতে পেল না। রাশি রাশি আনন্দের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অসহায় ফুড়কুনী দুঃখের সাগরে হারিয়ে গেল। নানা ধরনের চিৎকার চেঁচামেচি অসহ্য লাগল। সে পালিয়ে গিয়ে বাঁচতে চাইল। কিন্তু এই ভিড় ঠেলে ঠেলে সে উদ্দেশ্যহীন ভাবে কোথায়? গন্তব্যহীন মাঝ দরিয়ার নৌকার মত মনে হল নিজেকে। ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে এল। গ্রাম এখান থেকে হাঁটা পথে আড়াই মাইলের কম হবে না। জমাটা বাঁধা অন্ধকার পথে সে একা যাবেই বা কি করে? পথে ভয় লুকিয়ে আছে পদে পদে। সাপ বা কুকুর-শেয়ালের ভয় নয়, তার ভয় মানুষকে নিয়ে। গ্রামে এখন বদ-হাওয়া ঘুরে বেড়ায়। গ্রামের অনেক যুবকই তাকে কাছে পাবার জন্য লুলিয়ে ওঠে। সেদিন বাজারে গোবিন্দ কু প্রস্তাব দিল। শুনে কান লাল হয়ে গিয়েছিল ফুড়কুনীর। অসহ্য রাগে নিজেকে ধরে রাখতে পারেনি

সে। পাশাপাশি হাঁটতে থাকা গোবিন্দর মুখের উপর সে বলেছিল, এবার যদি বাড়াবাড়ি কর তাহলে আমি চেঁচিয়ে লোক জড়ো করব। ভেব না আমি তোমার হাতের পুতুল, যা বলবে তাই আমি মাথা পেতে মেনে নেব। এর পরে গোবিন্দ আর দাঁড়ায়নি, সুড়সুড় করে চলে গেল বাজারের দিকে। সেদিন গোবিন্দর চোখে যে প্রতিহিংসার আগুন দেখেছিল ফুড়কুনী-তা সে এখনও ভুলতে পারেনি। গোবিন্দর চরম রাগ আছে সুদামের উপর। কেন যে এত রাগ তা জানা নেই ফুড়কুনীর। তবে সে ভয় পেয়েছে ভীষণ। অনেক রাত পর্যন্ত সে ভাল করে ঘুমাতে পারেনি। বড় অস্থির মনে হয়েছে নিজেকে। গোবিন্দকে বিশ্বাস নেই, সে খেলার ছলে সুদামকে শেষ করে দিতে পারে। ভয়ে মেলার মধ্যে গা কাঁটা দিয়ে উঠল ফুড়কুনীর। তার অসহায় চোখ খুঁজতে লাগল সুদামকে। কিন্তু ভিড়ের মধ্যে তার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। দু-চোখে ভেসে উঠল ভীষণ শূন্যতা। কপালের দু পাশে দপদপিয়ে উঠতেই নিজেকে বড় অসহায় আর একাকী মনে হল তার। বাঁশি-ভেঁপু আর ইলেকট্রিক নাগরদোলার শব্দ ছাপিয়ে সে শুনতে চাইল সুদামের গলা। কিন্তু আধঘন্টার উপর হয়ে গেল তবু সুদাম এল না। ফুড়কুনী বাধ্য হয়ে তাকাল তাপস মাষ্টারের দিকে। প্যান্ট-শার্ট পরা ভদ্রলোকটি সিগারেট ফুঁকছিলেন একটু দূরে দাঁড়িয়ে, হয়ত তিনি লক্ষ্য করছিলেন ফুড়কুনী তাকে ডাকে কিনা। ফুড়কুনী নিরুপায় হয়ে এগিয়ে গেল তাপস মাষ্টারের কাছে, খুব ঘাবড়ে যাওয়া স্বরে বলল, আপনি কি এখন ফিরবেন? দেখুন না, আমার সঙ্গে যে এসেছিল সে যে কোথায় গেল, তাকে আর খুঁজে পাচ্ছি না!

একটু মজা পেয়ে তাপসমাষ্টার বললেন, সাথী হারিয়ে গেছে বুঝি? তুমি কার সাথে মেলায় এসেছিলে, কি নাম তার?

নাম বললে আপনি কি তাকে চিনতে পারবেন? ফুড়কুনী তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল, সুদাম, সাইকেল দোকানে কাজ করে। তাকে কি আপনি চেনেন?

চিনি না মানে ভাল করে চিনি। তাপস মাষ্টার হাতের সিগারেটটা ফেলে দিয়ে জুতোর চাপ দিয়ে আগুন নিভিয়ে দিলেন, চলো দেখি খুঁজে পাওয়া যায় কিনা। সে তো দায়িত্ববান ছেলে। এই ভিড়ের মধ্যে সে তোমাকে একা রেখে পালিয়ে যাবে না। আমি যতদূর জানি—সে খুব সরল আর পরিস্কার মনের ছেলে। ওর সাথে তোমার আলাপ হল কি করে?

ফুড়কুনী বিরক্তি হল এমন প্রশ্ন শুনে, একই গ্রামে থাকি, ছোট থেকে দেখছি, তার সাথে আলাপ হবার কোন দরকার হয় না। গ্রামে সবাই সবাইকে চেনে। এখানে মানুষ দূরত্ব রেখে মেশে না।

ফুড়কুনীর চিবুকের কালো তিলটা ভিজে গেছে ঘামে, সাপের চোখের মত চকচক করে সেই মহাতিল। তাপস মাষ্টারের চোখ আটকে যায় সেখানে। মেলার ভিড়ের আওয়াজ ছাপিয়ে তিনি বলে ওঠেন, তোমার চিবুকের তিলটা তোমাকে আরও সুন্দরী করেছে। জান আমি যাকে ভালবাসতাম সেই মানসীরও বাঁ-গালে এরকম একটা তিল ছিল। আমি প্রায়ই ছুঁয়ে দিতাম সেই তিলটা। ও ভীষণ রেগে যেত। ফুড়কুনীর কোন

কথা কানে ঢুকছিল না, অসহ্য গরমে তার ঘাড়ের কাছে চুল লেপটে গিয়েছে ঘামে। আপনার কথা শোনার ধৈর্য এখন আমার নেই। দয়া করে একটু চুপ করুন। আমার প্রচণ্ড মাথা ধরেছে।

চা খাবে? আগ্রহ নিয়ে ঝুঁকে পড়ল তাপস মাষ্টার, সামনেই চায়ের দোকান, চলো এক কাপ খেয়ে আসি।

আমি চা খাই না। মাটির দিকে মুখ নামিয়ে নিল ফুড়কুনী। এক ফোঁটা ঘাম তার ঠোঁটের মাঝখানে গড়িয়ে পড়তেই রি-রি করে উঠল তার সারা শরীর। তাপস মাষ্টার খুব অবাক গলায় বললেন, এত বড় মেয়ে আবার চা খায় না, এই প্রথম শুনলাম। জানো মানসী শুধু চা-ই-নয় ড্রিঙ্কসও করত। একবার ডায়মণ্ডহারবার বেড়াতে গিয়ে আমরা দু-জনে ভরপেট মদ খেয়েছিলাম। হোটেলে মানসীর সে কি চিৎকার চেঁচামেচি! সারারাত বমি করল। আমি ওর মাথার পাশে জেগে বসে থাকলাম।

আপনি মাষ্টার, কখন কাকে কি বলতে হয় জানেন না বুঝি? ফুড়কুনীর গলা ফুঁড়ে বেরিয়ে এল ঝাঁঝ, আমার সঙ্গে এই ভাবে কথা বলবেন না। আমি গ্রামের মেয়ে। আপনার শহুরী কথার মারপ্যাঁচ বুঝি না। সোজা কথা সহজ করে বলতে আমি ভালবাসি। আপনি এখন যেতে পারেন, আমি ঠিক সুদামকে খুঁজে নেব। আপনার সাহায্য আমার আর চাই না। ফুড়কুনী ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল সামনের দিকে। বাচাল মানুষ তার দু চোখের বিষ। এত পড়াশুনা করে যে মানুষ পরিবেশ, পরিস্থিতি বুঝতে চায় না তাকে প্রথম থেকেই এড়িয়ে যাওয়া ভাল। ফুড়কুনী কিছুটা বড় করে নিঃশ্বাস ছেড়ে দাঁড়াল। এখন কি করবে সে? রাত বাড়ছে। সে কি ফিরে যাবে? এসব ভাবছিল যখন তখনই অপরাধীর মত মাথা নিচু করে দাঁড়াল তাপস মাষ্টার, সরি। আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমি একটু বেশি মাত্রায় ইমোশোনাল হয়ে পড়েছিলাম। তোমার সমস্যাটা ভুলেই গিয়েছি। আসলে কি জান মানুষ নিজেকে নিয়ে ভাবতে ভালবাসে। মানুষ বড় স্বার্থপর জীব। চলো আর ভুল হবে না। এবার ঠিক সুদামকে খুঁজে বের করব।

মাইকে বাউলগানের সুর, তারই পাশাপাশি ডাইনোমোর ভটভট আওয়াজ, পুতুল নাচের বিজ্ঞাপন—সব ছাপিয়ে ফুড়কুনী শুনতে চাইছিল সুদামের ব্যাকুল কণ্ঠস্বর, কিন্তু এত ভিড়ে অজস্র কণ্ঠস্বরের ব্যস্ত মিছিলের শব্দ লহরীতে সব হারিয়ে গেল। সে যখন আশা ছেড়ে দিয়েছে সুদাম ফিরবে না, তাকে কারো না কারোর সাহায্য নিয়ে ঘরে ফিরতে হবে তখনই তাপস মাষ্টার ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলেন তার কাছে।

সুদামের দেখা পেয়েছি। চলো।

কোথায় সে? ফুড়কুনী অস্থির হয়ে উঠল।

তাপস মাষ্টার তর্জনী তুলে দেখাল, ঐ তো বুড়ো বটগাছের কাছে। আমি দেখে এলাম সুদাম গালে হাত দিয়ে বসে আছে।

হাওয়ার বেগে ছুটে গেল ফুড়কুনী, সুদামের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে ভেঙে পড়ল

অবুঝ কান্নায়, সেই কখন থেকে তোমায় খুঁজছি, কোথায় গিয়েছিলে তুমি? মন্দির থেকে ফিরে এসে আমি আর তোমাকে দেখতে পেলাম না! কি হয়েছে তোমার, অমন ঝিম ধরে বসে আছ কেন? তোমার কি শরীর খারাপ?

ক্লান্ত বিষন্ন কিংবা পরাজিত চোখ তুলে তাকাল সুদাম, বার দুয়েক ঢোক গিলে সে বলল, তোমার দেরি দেখে আমি পান খাব বলে গিয়েছিলাম দোকানে। দোকান থেকে আর ফিরতে পারিনি। অসহ্য পেটের যন্ত্রনা এমন যন্ত্রনা, যে আমি কাটা পাঁঠার মত ছটফট করছিলাম। মেলা কমিটির ছেলেগুলো আমাকে ধরে এনে বটতলায় বসিয়ে দেয়। তারাই কোথা থেকে ওষুধ জোগাড় করে খাওয়ায়। প্রায় ঘন্টা খানিক আমি দাঁড়াতে পারিনি, ঝিম ধরে বসে আছি। আর বসে বসে ভাবছি— তোমার কি হলো? তুমি কোথায় গেলে, তোমাকে কি ভাবে খুঁজে পাব? ফুড়কুনী হাঁটু মুড়ে বসল সুদামের পাশে, তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল অনবরত। সুদাম ফুড়কুনীর বিব্রত মুখের দিকে তাকিয়ে নিজেই ব্যথিত হল, এখন আমার আর কোন ব্যথা নেই। আমি হাঁটতে পারছি। জানো একসময় আমার মনে হয়েছিল আমি আর বাঁচব না। তোমার সাথে আমার আর দেখা হবে না। মা শীতলাবুড়ির অশেষ দয়ায় আবার ভাল হয়ে গেছি। চলো এবার মেলা ঘোরা যাক। আমার জন্য তোমার অনেক কষ্ট হল।

ফুড়কুনী কষ্টের মধ্যেও হাসল, আমার জন্য ভেবো না। এবার থেকে নিজের শরীরের উপর যত্ন নিও। সময় মত খাওয়া দাওয়া করো। আর বেশি রোদে রোদে ঘুরবে না। অনেক রাত হল। চল আমরা এবার ফিরে যাই। ফুড়কুনী তাপস মাষ্টারকে খুঁজছিল। কিন্তু ধারে কাছে তার দেখা পেল না। সুদামের কাছে ফুড়কুনীকে পৌছে দিয়ে তাপস মাষ্টার ইচ্ছে করেই হারিয়ে গেছে মেলায়। মেয়েটার জেদ, কাটকাট কথাবার্তা তার মনে দাগ কেটেছে। কলকাতা থেকে দূরের এক অখ্যাত গ্রামে সে যে এমন ব্যক্তিত্বসম্পন্না যুবতীর দেখা পাবে এটা তার ধারণার বাইরে ছিল। তার এতদিনের ধারণা ছিল শুধু বুঝি শহরের মেয়েরা নিজেদের ব্যক্তিত্ব গাম্ভীর্যকে সযত্নে ধরে রাখে, তার সেই ভুল প্রমাণিত হতে মনে মনে লজ্জা পেয়েছেন তাপস মাষ্টার। মেলায়-খেলায় সবাই একটু চকচকে হতে চায়। হয়ত নিজের অজান্তে তাপস মাষ্টারও চেয়েছিলেন নিজেকে একটু বেশি জাহির করতে। ফুড়কুনী তার ডানা ছেঁটে দিয়েছে। আত্মসম্মান বাঁচানোর জন্য তিনি হয়ত গা ঢাকা দিয়েছেন ভিড়ের মধ্যে।

মেলা ঘোরা আর হল না ওদের। বারটার পর শুরু হবে কলকাতার যাত্রা। যাত্রা কোম্পানীর বাসটা পৌছাতেই হৈ-চৈ বেঁধে গেল মেলার মধ্যে। অতিরিক্ত প্রাণের স্পন্দনে জেগে উঠল মেলা। সাইকেল নিয়ে ফুড়কুনীর কাছে এল বিনীত সুদাম।

তার হাতে মিষ্টির ঠোঙা। ঠোঙাটা ফুড়কুনীর হাতে দিয়ে বলল, এটা আমার কামাইয়ের পয়সায় কেনা। তুমি খেলে আমি খুব খুশি হব।

তুমি খাবে না? প্রতিমার মত টানা চোখ মেলে তাকাল ফুড়কুনী, একটা অন্তত খাও। তুমি না খেলে আমি খাব কি করে? একটা রসগোল্লা ফুড়কুনী সুদামের মুখে

ঢুকিয়ে দিল। এত ভালবাসা সুদামের জীবনে প্রথম। তার যা ফাটা কপাল এই সমুদ্র সমান ভালবাসা সে কি করে ধরে রাখতে পারবে এই ক্ষুদ্র বুকের ভেতর? ভয়ে ঘেমে উঠল সুদাম। ফুড়কুনী আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিল তার মুখের ঘাম, কাঁপা কাঁপা গলায় সে বলল, আমি যা পেয়েছি তা নিয়ে তারায় ভরা আকাশকেও হারিয়ে দেব। তুমি তাড়াতাড়ি করো। আমি আর আলাদা থাকতে পারব না। খুব মন খারাপ করে গো, কী যে কষ্ট হয় তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারব না।

সুদাম চুপ করে থাকল, ফুড়কুনীকে আশ্বাস দেবার ভাষা তার নেই। একটু পায়ের তলায় মাটি পেলেই ফুড়কুনীকে সে ঘরে আনবে। চাঁদ খেলা করবে তাদের মাটির ঘরের ভেতর। বাবা মা নিশ্চয় দু হাত ভরে আশীর্বাদ করবে ফুড়কুনীকে। সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে। ফুড়কুনীর গুণের শেষ নেই, সে সবাইকে আপন করে নেবে নিজের মিষ্টি ব্যবহারে।

কাঁচা পথ পেরিয়ে পিচ রাস্তায় উঠে এল সুদাম। অন্ধকারে ফুড়কুনী লতার মত জড়িয়ে ধরেছে সুদামের কোমর। সুদাম ঘেমে উঠেছে বিপরীত তাপে। শ্যালো মাঠের কাঁচা রাস্তার কাছে সাইকেল থামাল সুদাম। ফুড়কুনী অবাক হয়ে শুধালো, থেমে গেলে যে, কেউ যদি ধরে নেয় আমাকে! কথা শেষ না হতেই খিলখিল ঝর্ণা হাসিতে সুদামের বুকের উপর লুটিয়ে পড়ল সে। সুদাম সাহসে ভর দিয়ে তার রুগ্ন হাত বাড়িয়ে ফুড়কুনীকে টেনে আনল নিঃশ্বাসের আওতায়। অনেকক্ষণ গাছের মত দাঁড়িয়ে থাকল ওরা। দূর থেকে হ্যারিকেনের আলো দেখে ওরা ছিটকে গেল পরস্পরে। কাঁচা পথে নেমে এসে সুদাম বলল, তোমার জন্য মেলা থেকে একটা জিনিস কিনেছি। জানিনা কেনাটা ঠিক হল কিনা তবে মন বলল তাই কিনেই ফেললাম।

কি জিনিস? ফুড়কুনী চড়াই পাখির মত ছটফটিয়ে উঠল, এতক্ষণ দেখাওনি কেন?

মেলায় অত আলোয় তোমাকে এই সামান্য জিনিস দিতে খারাপ লাগল তাই ইচ্ছে করেই বলিনি। সুদাম পকেট থেকে বের করে আনল কাগজে মোড়ান একটা স্টিলের সিন্দুর কৌটা, এটা এখন তোমার কোন কাজে লাগবে না। যখন বিয়ে করব তখন রোজ এই কৌটো থেকে সিঁন্দুর পরো। আমি কাছে থাকি বা না থাকি এই সিঁন্দুরের কৌটোটা তোমাকে আমার কথা মনে করিয়ে দেবে। তুমি আমাকে ভুলে থাকতে পারবে না। বলো কেমন সাজা দিলাম তোমাকে?

ফুড়কুনীর ঠোঁট কেঁপে উঠল ঘনঘন, কথা জড়িয়ে গেল গলার ভেতর, সে শুধু পূর্ণতার চোখ মেলে ফসল ঘরে তোলার আনন্দে মশগুল হয়ে গেল। সুদামের হাতটা ধরে আলতো আদর করে বলল, আমি যেন না হেরে যাই, তুমি আমাকে মনের জোর জুগিও।

ওরা হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গেল ঘরে। এসময় জীবন মাষ্টারের ঘরে আলো এত উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে না। অথচ ঘর থেকে আলোর রশ্মি ছিটকে এসে পড়েছে বাগানে। আলোর পোকারা ফড়ফড়িয়ে উড়ছে সেই আলোর টানে। এত রাতে সুধাময়ী কার

সাথে কথা বলছে বড় ঘরে বসে? তাহলে কি কোন আত্মীয়স্বজন এল কাঁথি কিংবা এগরা থেকে। অসময়ে কেউ এলে ফুড়কুনীর কাজ বেড়ে যাবে। আবার নতুন করে হেঁসেল ঘরে ঢুকতে হবে তাকে। একটা চাপা বিরক্তির ঢেউ খেলা করে গেল ফুড়কুনীর চোখে-মুখে। সে দোনো মোনো মন নিয়ে ঘরে ঢুকেই চমকে গেল। কাঁঠাল কাঠের চেয়ারে গা-এলিয়ে বসেছিলেন তাপস মাষ্টার। সুধাময়ী তাকে নারকেলের নাড়ু আর মুড়ি খেতে দিয়েছে। ফুড়কুনীকে দেখে চোখে চোখ ফেলে হেসে উঠল তাপস মাষ্টার, এই এলে বুঝি? আমি আগে চলে এলাম। এসেই তোমার খবরটা দিয়ে গেলাম মাসীমাকে। তিনি আমাকে না খাইয়ে ছাড়লেন না। সত্যি এরাই হল প্রকৃত মায়ের জাত।

তাপস মাষ্টার সুদামকে দেখে কিছুটা অপ্রস্তুত বোধ করলেন নিজেকে, তার আগেই সুদাম বলল, আপনি আমাদের ফেলে চলে এলেন যে! কেন এক সাথে কি ফেরা যেত না?

ঠোঁট বেঁকিয়ে গোঁফের ফাঁকে ফাঁকে হেসে উঠলেন তাপসমাষ্টার, আসা যেত কিন্তু ইচ্ছে করেই আসিনি। আমি কোনদিন চালের মধ্যে কাঁকর হতে ভালবাসি না। জীবনে হেরেছি বহুবার, এবার তাই খেলার ধরণটা একটু পাল্টে নেব। চক্ষু-লজ্জা থাকলে মানুষের আশা কোন দিন পূরণ হবে না।

আপনার কি আশা তা তো আমার জানা নেই, জানা থাকলে পূরণ করার চেষ্টা করতাম। সুদাম তক্তাপোষে গিয়ে বসল। সুধাময়ীকে শুধাল, কাকা আসেনি?

সুধাময়ী না বলতেই মনে মনে উৎসাহিত হল সুদাম। হতাশ তাপসমাষ্টার ফুড়কুনীর দিকে তাকালেন, কথা বলার কোন উৎস খুঁজে না পেয়ে গলা শুকিয়ে বললেন, আমাকে এক গ্লাস জল দাও তো?

ফুড়কুনী চোখ পাকিয়ে চলে গেল জল আনতে।

তাপসমাষ্টার জলের গ্লাসটা নেবার সময় ইচ্ছে করেই ছুঁয়ে দিলেন ফুড়কুনীর হাত, তার হাতের ছোঁয়ায় সরে গেল কাচের চুড়ি। ফুড়কুনী পাথর চোখ করে তাকাল। ভ্রুক্ষেপহীন তাপসমাষ্টার অন্য কথা ভাবছিলেন। ঢকঢক করে জল খেয়ে তিনি ফুড়কুনীকে বললেন, আমি আজ আসি। আবার আসব। পাশাপাশি ঘর যখন তখন রোজ দেখা হবেই হবে।

ফুড়কুনীর মুখ নয় যেন পুরো শরীর শুকিয়ে গেল তাপসমাষ্টারের কথায়। সুদামকে এগিয়ে দিতে এসে সে চাপা গলায় বলল, আর দেরি করো না। কৌটোর সিঁদুর যাতে আমি পরতে পারি সেই ব্যবস্থা করো।

॥ চৌদ্দ ॥

গুঁড়ো সিঁদুর ঘষা দিলে উঠে যায় যদি না তা চামড়া ভেদ করে রক্তে মেশে।

যোগমায়ার কথাগুলো সুদামকে ভাবিয়ে তুলেছে ইদানিং। ফুড়কুনীর ইচ্ছের কথা মাকে সে না জানিয়ে পারে নি। সব জানার পরে ভয়ে মরছে যোগমায়া, তার জোড়া

চোখ লাফিয়ে উঠছে বারবার। তবু ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে মা হিসাবে কিছুই বলতেই হয়, তাই অনেক ভেবে-চিন্তে সে বলল, জীবন মাষ্টারের মেয়েটাকে অনেকদিন দেখিনি। তুই ওকে বলিস একবার দেখা করতে। মেয়েটাকে দেখলে বলে দেব সে তোর ঘর করবে কিনা।

মায়ের কথা শুনে কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছে সুদাম। খড়গুলো পচে গিয়েছে, চালের ওগুলো বদলে ফেলে সে। দু-তিন তার ব্যস্ততার শেষ নেই। জীবন মাষ্টারকে এখনও আসল কথাটা বলা হয়নি। সব শুনে তার কি প্রতিক্রিয়া হবে তা ভগবানই জানেন। তবু মনে মনে সাহস এবং শক্তি সঞ্চয় করে সুদাম। তার বন্ধু নকুলকে সে সব কথা বলেছে। সব শোনার পর ক' মুহূর্তে চুপ করে ছিল নকুল। পরে সে বন্ধুর মুখ চেয়ে বলল, ভগবান যা করে মঙ্গলের জন্য! তোর একটা ভাল মেয়ের দরকার ছিল। জীবন মাষ্টারের মেয়ের কোন তুলনা হয় না। সে শুধু দেখতে ভাল নয়, তার মনটাও সাদা ধবধবে। আমার সাথে দেখা হলে মুখ নীচু করে কথা বলে। অমন ভদ্র মার্জিত ব্যবহার আজকালকার দিনে মেয়েদের খুব কম হয়। আমি তো রোজ কম ছেলে-মেয়ে দেখি না দীঘার পাড়ে। ওদের চালচলন, পোষাক-আষাক দেখলে আমার ঘেন্না হয়। গা কিরকির করে। আমি বুঝতে পারি না ওরা বউ না বাজারের মেয়েছেলে। তবে সবাই যে খারাপ তা আমি বলছি না।

নকুলের সমুদ্রমাছের ব্যবসা, সে দীঘা থেকে মাছ কিনে এনে হাটে-হাটে বেচে। তার একটা মান্ধতার আমলের মার্ড-গার্ড খোলা সাইকেল আছে। নকুল বলে—এই সাইকেলটা নাকি তার দাদুর আমলের। শুধু ক্যারিয়ার ছাড়া আর সব কিছু পুরনো দিনের। সংসার চলত না, অভাব লেগে থাকত চামএঁটুলির মতো। মাছের ব্যবসা করার পর থেকে অনেক চালাক-চতুর হয়ে গেছে নকুল, সে এখন একা একা সাইকেল ঠেঙ্গিয়ে দীঘা যেতে ভয় পায় না। খুব ভোরে উঠে খাওয়া-দাওয়া সেরে সে বেরিয়ে পড়ে দীঘার দিকে। মেনকা ভোরবেলায় উঠে তার জন্য আটটা রুটি আর আলু ভেজে দেয়। প্লাসটিক মোড়ান সেই রুটি আর আলু ভাজা দীঘার ঝাউবনে বসে ফুরসত মত খেয়ে নেয় নকুল। এতে হোটেল খরচা কিছুটা বাঁচে। নকুল মাছের ব্যবসা করে টালির চাল দেওয়া ঘর করেছে। সে কারোর সাতে-পাঁচে থাকে না। নিজের ভবিষ্যত তৈরির খেলায় সে এখন একরোখা তীর। শুধু ছুটছে আর ছুটছে।

জীবন মাষ্টারের দোকান থেকে বিষণ্ন মনে ফিরে এল সুদাম, ফুড়কুনীর সংবাদ শুধাতে গিয়ে তার মুখে কথা আটকে গেল। আজ নিয়ে পরপর সাতদিন ফুড়কুনীর সাথে দেখা হয়নি তার। সাইকেল দোকানের কাজে আটকে গেলে অন্য কথা সে ভুলে যায়। সন্ধেবেলায় ঘরে গিয়ে নানান কাজে জড়িয়ে পড়তে হয় তাকে। ভরত এই সময় খোল বাজাতে যায় পুব পাড়ায়, সে ফেরে রাত করে। সে না ফেরা পর্যন্ত যোগমায়ার পাশে বসে গল্প করে সুদাম। আজ নিয়ে দু দিন দু রাত্রি হল মীরা ঘরে ফেরেনি, সে যে কোথায় চলে গিয়েছে কেউ জানে না। এই নিয়ে ভরতের মনে সুখ নেই।

যোগমায়াও ঝিমিয়ে গিয়েছে মীরার চিন্তায়। যাকে নিয়ে টালমাটল সংসার-তার খোঁজ কেউ দিতে পারল না দু দিন ধরে। সুদাম পানিপারুল আর দীঘা ঘুরে এসেছে, সেখানে মীরার দেখা পায় নি। সারাদিন ঘুরে ঘুরে তার পা ফুলে গেছে ব্যথায়। যোগমায়া নুন-পুঁটলির সেঁক দেয় ছেলের পায়ে। হঠাৎ একসময় সে ফুঁপিয়ে ওঠে, মেয়েটাকে নিয়ে আর পারি না। ভগবান কেন যে ওকে নেয় না জানি না। টপটপ করে ঝরে পড়ে যোগমায়ার চোখের জল। সুদাম তাকে সান্তনা দিয়ে বলে, মা, আমি মীরাকে খুঁজে আনব। সেবার তো দীঘা থেকে ধরে আনলাম ওকে। ও কিছুতেই আসবে না, শেষে জোর খাটাতে হল। এবার যদি খুঁজে পাই তাহলে শেকল দিয়ে ঘরে বেঁধে রাখব।

ও কি গোরু-ছাগল যে বেঁধে রাখবি? যোগমায়ার ঝাঁঝাল প্রশ্নে আহত চোখে তাকাল সুদাম, তুমি রাগ করো না মা। আমি অনেক দুঃখে কথাটা বলেছি। ওর কোন বড় ধরনের ক্ষতি হোক আমি কি চাই? ওর তো বুদ্ধি শুদ্ধি নেই, কে যে কখন ওর ক্ষতি করে দেবে—এই ভয়ে আমি সিঁটিয়ে থাকি সবসময়। রাত নটার পরে ঘরে ফেরে নকুল। সুদাম ভাবল—তার কাছে একবার যাওয়া দরকার। যোগমায়াকে বলে সে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। পাকা রাস্তায় এসে দেখল তাপস মাষ্টার দাঁড়িয়ে আছে জীবন মাষ্টারের দোকানের সামনে। দোকান বন্ধ করে জীবনমাষ্টার বলল, তোমার এত কষ্ট না করলেই হত। আমি তো রোজ একাই হেঁটে হেঁটে ঘর যাই। একলা হাঁটলে চেনা পথ বড়ই আরামদায়ক মনে হয়।

তাপস মাষ্টার জোর খাটিয়ে বলল, আপনার বয়স হচ্ছে, এখন এত পরিশ্রম আপনার শরীরে সইবে না। ক'দিন দোকান বন্ধ করে ঘরে বসে আরাম করুন। সারা জীবন তো খাটলেন, আরামের সময় আরাম না করলে শরীর যে ভেঙে যাবে।

শরীর ভাঙতে আর বাকি কি আছে? হাইতুলে জীবনমাষ্টার পথের দিকে তাকালেন, হ্যারিকেনের বাতিটা উসকে দিয়ে তিনি বললেন, তোমাদের মত বয়সে ভাল খেতে পরতে পাইনি। তখন অকাল চলছে দেশে। সেই সময় অনাহারে অপুষ্টিতে শরীরটায় ধস নামল। এত বছর পরেও তা আর ঠিক হল কই?

তাপস মাষ্টার পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বললেন, হ্যারিকেনটা আমাকে দিন। আপনি ফ্রি হয়ে হাঁটুন। কাল থেকে আপনি হ্যারিকেন আনবেন না, আমি কাঁথি থেকে একটা ভাল টর্চলাইট কিনে এনেছি। আপনাকে গিফট্ দিতে চাই।

আমার ওসবে কি দরকার? জীবন মাষ্টার কেমন সন্দেহের চোখে তাকালেন, শুধু টর্চ হলে তো চলবে না, তার জন্য ব্যাটারি চাই। আমার দোকানের যা অবস্থা তাতে যে পয়সায় ব্যাটারি কিনব তাতে লিটার দুয়েক কেরোসিন তেল হয়ে যাবে।

তাপস মাষ্টার জোর করে টর্চ লাইটটা ধরিয়ে দিল জীবনমাষ্টারের হাতে, আপনি গুরুজন, আমাকে আশীর্বাদ করুন যাতে আমার মনোবাসনা পূর্ণ হয়।

আমাকে টর্চ লাইট না দিলেও তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হবে। জীবন মাষ্টার ঘাড় তুলে তাকালেন তারায় ভরা আকাশের দিকে, তুমি গ্রামের মাষ্টার মশাই। অতি অল্প বয়সে তুমি গুরুদায়িত্ব পেয়েছ। এই সম্মান অনেকের ভাগ্যে জোটে না। তাই তোমাকে বলি—

তুমি এমন কিছু করবে না যাতে দশ লোক তোমার দিকে আঙুল তুলে কথা বলতে পারে। মনে রেখো সব জিনিস বারবার পাওয়া যায়, কিন্তু সম্মান হারিয়ে তা আর আগের চেহারায় ফেরে না।

নকুল ঘরে ছিল। রাতের স্নান সেরে গায়ে পাউডার মেখে বসেছিল দোলনায়। মেনকা চা-দিয়ে গেছে তাকে। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে নকুল অবাক স্বরে বলল, এত রাতে এলি যে কি ব্যাপার?

সুদাম বলল, মীরাকে দু দিন ধরে পাওয়া যাচ্ছে না। আমি পানিপারুল রামনগর থেকে ঘুরে এসেছি। তুই দীঘায় একটু খোঁজ রাখিস। দেখা হলে বুঝিয়ে সুজিয়ে ঘর আনিস। ওর কথা ভেবে আমার খুব ভয় করছে।

ভয় কিসের, সব ঠিক হয়ে যাবে। নকুল অভয় দিয়ে বলল, খুঁজতে বেশি সময় লাগবে না। মীরা ঝাউগাছের মত লম্বা হয়ে গেছে। আমি দূর থেকে দেখলে ঠিক চিনতে পারব ওকে।

সুদাম নকুলের হাত চেপে ধরল, তুই আমাকে বাঁচা, আমার আর কিছু ভাল লাগছে না।

ঘরে যা, কাল আমি তোর সঙ্গে দেখা করব। নকুলের কথা মেনে নিল সুদাম। মাথা নিচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল সে। বাইরের অন্ধকারের থাবা গাছপালা ঘরবাড়ি খানাখন্দ পুকুর-ডোবায় বিস্তার করেছে আধিপত্য। একটা কুকুর কান্নার মত কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল। কুকুরের এই বিদীর্ণ কান্না অসহ্য। এতে নাকি গ্রামে মানুষের অমঙ্গল লুকিয়ে থাকে। কি অমঙ্গল, কিসের অমঙ্গল, কেন অমঙ্গল এ সব ভাবতে গিয়ে কপালের দু পাশের শিরাটা দপদপ করে সুদামের। ফুড়কুনী তার মন জুড়ে বসে আছে। অথচ খবর পাঠান সত্ত্বেও সে এসে দেখা করে গেল না। এতে মনোক্ষুন্ন হয়েছে যোগমায়া। জীবন মাষ্টারের মেয়ের আচার ব্যবহার যে কেমন হবে এসব তাকে ভাবিয়ে তুলেছে। তবু তাকে নিয়ে সে কোন মন্তব্য করেনি। সুদাম হাঁটতে হাঁটতে অন্য কোথায়ও হারিয়ে যায়। কাল গোবিন্দর সঙ্গে দেখা হয়েছিল ইস্কুল মাঠে। গোবিন্দ গাছের ছায়ায় বসে সিগারেটের মশলা ফেলে তাতে গাঁজা ঢুকিয়ে খাচ্ছিল। গাঁজা পোড়া গন্ধটা একদম সহ্য করতে পারেনি সুদাম। সে তাকে বুঝিয়ে বলেছিল, এসব কেন করিস গোবিন্দ? তোর তো কোন কিছুর অভাব নেই তবু নিজেকে কেন ভিখারী করে রাখিস? তোর জন্য আমার কষ্ট হয়।

গোবিন্দ জানত সুদামের মত সৎ চরিত্রের ছেলে হয় না, তার মত নষ্ট চরিত্রের যুবকের জন্য শ্রদ্ধা ভালবাসা এবং প্রীতির অনুপম ছোঁয়া জেগে আছে। গোবিন্দ গাঁজা ঢোকান সিগারেটটা ফেলল না ঠিকই, ভসভস করে টান দিয়ে বলল, সিগারেটে আজকাল মজা পাই না। যার পেটে একবার পলিথিন প্যাকেটের কানট্রি পড়েছে তার আর সিগারেট বিড়িতে কিছু হবে না। তার জন্য চাই গাঁজার মত কড়া জিনিস। গোবিন্দর গোঁফ নাচান হাসির আড়ালে লুকিয়েছিল তার কিছু ব্যক্তিগত দুঃখ কথা যা সে মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত ভুলতে পারবে না। সিগারেটে আয়েসী একটা দম মেরে গোবিন্দ ঘাসে থুতু ফেলল,

গাঁজা টানলে মাইরি মুখ তেতো হয়ে যায়। বল তুই কিসের জন্য এসেছিলি? আমার কোন সাহায্যের দরকার হলে বলবি। আমি সবসময় তোর পাশে থাকব।

জানিস, মীরাকে পাওয়া যাচ্ছে না দু দিন থেকে। বোনটা যে কোথায় গেল, এই চিন্তায় স্নান-খাওয়া সবাই ভুলে গেছে। তুই কি ওকে দেখেছিস? সুদামের ব্যাকুল প্রশ্ন গোবিন্দকে নাড়িয়ে দিল, লাষ্ট মীরার সাথে আমার দেখা হয়েছিল বাজারে। আমাকে দেখেই সে আধলা ইঁট নিয়ে মারতে এল। আমি চায়ের দোকানে লুকিয়ে যাই। আজকাল দেখছি তোর বোনটা পাগলামী আরও বেশি করে করছে। ওকে একবার রাঁচী কিংবা কলকাতায় নিয়ে যা। টাকা না থাকলে আমি টাকার ব্যবস্থা করে দেব। কত সুন্দর মেয়েটা অথচ দিনে দিনে কেমন হয়ে যাচ্ছে! গোবিন্দর এই দুঃখ প্রকাশ আন্তরিক না মনগড়া কিছুই বুঝতে পারেনি সুদাম। তবে সে ভাবল মীরাকে কলকাতায় নিয়ে যাবে যে করেই হোক। এ ব্যাপারে তাপস মাষ্টারের সাহায্য দরকার। প্রাথমিক কথাবার্তা সে বলে রেখেছে। তাপসমাষ্টার আশ্বাস দিয়েছে তাকে, তোমার কোন চিন্তা নেই সুদাম। মীরাকে নিয়ে তুমি আর আমি যাব দমদম উন্মাদ আশ্রমে। আমি শুনেছি ওখানে অনেক নামকরা ডাক্তাররা নিয়মিত আসেন। আমি আগে থেকে ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলে রাখব। ফলে কোন অসুবিধাই হবে না।

রাত তার নিজস্ব নিয়মে বাড়িয়ে নেয় বয়স। মানকচু গাছের চওড়া পাতায় পাগল জোনাকী খেলা করে। বাঁশঝাড়ের কাছ থেকে ভেসে আসে কাঠব্যাঙের ডাক। মীরা যদি ঘরে থাকত এইসময় চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে গান গাইত 'রূপবান' পালার। তবে বাংলা গানেই তার ঝোঁক বেশি, হিন্দি উচ্চারণে তার কেমন অস্বচ্ছন্দবোধ হয়। ঘরে এলেই চিন্তিত যোগমায়া বলল, কোথায় গেছিলি এত দেরি হল যে? মীরার খবর পেলি?—পাইনি তবে পেয়ে যাব।

ভরত ফিরে এসেছে কীর্তন সমাজ থেকে। ওদের সমাজে নানা জাতের নানা শ্রেণীর মানুষ আসে। তাদেরই একজন বলেছে সে নাকি মীরাকে দেখেছে বেলদাতে। খবরটা শোনার পর থেকে অস্থির ওরা। বেলদা বেশি দূর নয়। রাতে যদি বাস থাকত তবে সে চলে যেত। ভরতের মনোভাব বুঝতে পেরে সুদাম বলল, বাবা তোমার যাওয়ার দরকার নেই। আমি কাল ভোরে বেলদা যাচ্ছি। মীরাকে ধরে আনব বিকালের মধ্যে। ও যাবে কোথায়, ঐ তো অতটুকু জায়গা, আমি ঠিক ওকে খুঁজে পাবো। তবে তুমি একবার সাইকেল দোকানে খবর দিয়ে দিও, আমি কাল যেতে পারব না বলে।

ভোরের বাসে বেলদা গিয়ে দশটার আগে মীরাকে সঙ্গে ফিরে এল সুদাম। এত সহজে যে মীরাকে খুঁজে পাবে সে ভাবেনি। বাস স্ট্যাণ্ডের বিশ্রামগারে মীরা শুয়েছিল কুঁকড়ে-মুকড়ে। তার পরনের কাপড় চোপড় ঠিক ছিল না। গায়ে থোক থোক ময়লা। চোখের কোন হলুদ হয়ে যাওয়া পিঁটুটি। মীরা তাকে দূর থেকে দেখেই পালিয়ে যেতে চাইল নাগালের বাইরে। সুদামও ছুট লাগল তার পিছনে। একটা রিকশাওয়ালা সাহায্য করল তাকে। ধরা পড়ে যাওয়ার পরে সে কি কান্না মীরার, কিরে আমাকে কি মেরে ফেলবি তোরা? গাঁয়ে আমার আর ভাল লাগছে না, গাঁয়ে বড় শুঁয়োপোকা। জোঁক রক্ত চুষে

চুষে খায়, আমি কেন গাঁয়ে যাব? ওখানে কেউ আমাকে খেতে দেয় না, সবাই মারে। মীরা ফুঁপিয়ে ওঠে সশব্দে। অনেক বুঝিয়ে বাসে তোলে সুদাম। বাসের কনড্রাক্টর ভাড়া নেয় না মীরার, শুধু আক্ষেপ করে, ভগবান কেন যে মানুষকে পাগল বানায়? ওর চেয়ে মেরে ফেলা ঢের ভাল। মেয়েরা পাগল হলে পথের ছেলেরা সুযোগ খোঁজে। খড়গপুরে একটা মারাত্মক ঘটনা হয়ে গেছে। একটা পাগলী ন' মাসের পেট নিয়ে ঘুরছে রাস্তায় রাস্তায়। অথচ ওর বিয়ে হয়নি, হাতে শাঁখা বা সিঁন্দুর নেই। কী আশ্চর্য! পাগলীটাকে দেখলেই আমার মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে। সেক্সের জন্য মানুষ কত যে নিচে নামতে পারে এটা তার জ্বলন্ত ঘটনা। এরপরে সে কলকাতার আর একটা ঘটনার উল্লেখ করতে যাচ্ছিল, ভয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল সুদাম। জানালার ধারে বসে ঘামতে লাগল সে। মীরার কোন ক্ষতি হয়ে গেলে সে পাগল হয়ে যাবে। সুদামের মাথা ছিঁড়ে পড়ছে চিন্তায়। সে নিজেকে অসুস্থ বোধ করে। তার চোখের উপর ভেসে ওঠে মীরা যেন ন'মাসের গর্ভাবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছে গ্রামের পথে। নিজের অজান্তে সুদামের বুক ছুঁয়ে গড়িয়ে নামে তপ্ত দীর্ঘশ্বাস। বাড়ি ফিরে সে আর কোথাও বেরয় না। পুকুরে ডুব দিয়ে এসে তক্তাপোষে মাদুর বিছিয়ে চোখ বুজে শুয়ে থাকে চালা ঘরের দিকে তাকিয়ে।

রাত নটার পর নকুল এল সাইকেল নিয়ে। তার লছঝড় সাইকেলটা আতাগাছে ঠেস দিয়ে সুদামকে বলল, চল, একটু ইস্কুলের মাঠ থেকে ঘুরে আসি। ঘরে আর ভাললাগছে না। চারদিক কেমন গুমোট হয়ে আছে তাই-না।

সুদাম যেতে যেতে মীরার খবর দিল নকুলকে। নকুল আশ্বস্ত হয়ে নিঃশ্বাস ছাড়ল। তার নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পেল সুদাম। মুখোমুখি ইস্কুলের মাঠে বসে একটা বিড়ি ধরাল নকুল, তারপর ঘাড় উঁচু করে আকাশের দিকে মুখ করে বলল, তোকে একটা কথা বলছি, খারাপ ভাবে নিবি না। আমি তোর বন্ধু বলেই বলছি। আমাকে ভুল বুঝিস না। আমি যা দেখেছি তাই বলছি। নকুল বিড়িটা দ্রুত ফুঁক ফুঁক করে টান মেরে দূরে ঘাসের উপর ফেলে দিল, তারপর তিতকুঁড়ো ঢোক গিলে বলল, আজ দীঘার ঝাউবনে তাপসমাষ্টার আর ফুড়কুনীকে দেখলাম মুখোমুখি বসে আছে। ফুড়কুনী দেখলাম মাষ্টারের গায়ের উপর হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ছিল। এটা আমার ভাল লাগেনি। তাই তোকে বলে ফেললাম। কথাটা শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল সুদাম। তারা খসে পড়ল আকাশ থেকে।

॥ পনের ॥

ঠিকরে পড়া তারা অশুভ।

সারা রাত ঘুম হল না সুদামের, নকুলের কথাগুলো জাবর কাটছিল সে। নকুল যেন বর্শা ঢুকিয়ে পালিয়ে গেছে ঘরে। এক রাশ অন্ধকার হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়েছে সুদামের মনে। এত অন্ধকার কোথায় লুকিয়ে ছিল এতদিন। ফুড়কুনী তার কাছে আলোকস্তম্ভের মত। তার কাছে চাওয়ার কিছু নেই সুদামের। না চাইতেও যে জল তুলে দেয়, সে কেন

বিষ তুলে দেবে হাতে? জীবন তো আর যাদুকরের হাতের পায়রা নয় যে যখন খুশি উড়িয়ে দেওয়া যাবে? নকুলের কথার সত্যতা যাচাই করা দরকার। চিলে কান নিয়ে গিয়েছে শুনে চিলের পেছনে ছোটা মূর্খের কাজ হবে।

ভোরবেলায় ছেঁড়া ছেঁড়া ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখল সুদাম। ফুড়কুনী এসেছে তাদের ঘরে। যোগমায়ার পায়ে হাত দিয়ে সে বলল, মা, আমি এসেছি। আমাকে তাড়িয়ে দিও না।

অত বদমেজাজী ভরত সে-ও কেমন স্তব্ধ হয়ে গেছে ফুড়কুনীর আবির্ভাবে। হাতের ধোঁয়া ওঠা বিড়িটা নিভিয়ে দিয়ে সে বলল, আমার ভাঙা ঘরে চাঁদ এসেছে, এই চাঁদের খবর আমি ঘরে ঘরে গিয়ে দিয়ে আসব। আজ আমার বড় আনন্দের দিন।

মীরা হাত ধরে টানছে ফুড়কুনীর, তার চোখে-মুখে খুশির উচ্ছ্বাস। সে যে কি বলছে কিছু বোঝা গেল না। তার মুখ থেকে গড়িয়ে পড়ল লালা। ফুড়কুনী তার নতুন শাড়ির আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিল তার মুখ। মাথায় ভরসার হাত ঝুলিয়ে দিয়ে বলল, চিন্তা করো না সব ঠিক হয়ে যাবে।

ভোরবেলায় বাঁশবাগানের কাকগুলো কা-কা করে চেঁচিয়ে উঠতেই আচমকা ঘুমটা ভেঙে গেল সুদামের। চোখে মুখে জল দিয়ে সে ছুটে গেল জীবন মাষ্টারের দোকানে। সকালের আলো সোনাঝুরি ফলের মত ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। বাজারের সব দোকান তখনও খোলেনি, শুধু চায়ের দোকানের ধোঁয়া উঠছে আঁচের। জীবন মাষ্টার পূজো পাঠ সেরে মেসিন মুছে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে, সকালের রোদ গায়ে মেখে নিয়ে সে আবার চলে যাবে দোকানে। এটা তার প্রতিদিনের অভ্যাস। খালি পায়ে ঘাসে দাঁড়াতে ভাল লাগে তার। সুদামের আর ধৈর্য সইছে না, সে গিয়ে মুখোমুখি দাঁড়াল। জড়তা কাটিয়ে সুদাম বলল, কাকা, তোমার সাথে আমার কিছু কথা আছে।

কি কথা?

দোকানে চল, বলছি।

সুদাম আগে আগে এগিয়ে এল দোকানে। কী একটা ধূপ জ্বলছিল গণেশ ঠাকুরের সামনে, সেই সুগন্ধটা খেলা করছিল সারা ঘরে। হাওয়ায় নড়ছিল ক্যালেণ্ডারের টিনের পাত বিশ্রী একটা ক্যারক্যার শব্দ তুলে। বিচলিত কিছুটা অবাক জীবন মাষ্টার কিছু না বলে উঠে এল দোকান ঘরে। সুদাম কাঠের টুলটা টেনে নিয়ে বসল জীবন মাষ্টারের মুখেমুখি। তাকে খুব অস্থির আর চঞ্চল দেখাচ্ছিল। দুঃশ্চিন্তার ছাপ ধরা পড়ল চোখের নিচে। অপ্রস্তুত জীবনমাষ্টার শুধোলেন, কি হল সুদাম, তোর বাড়ির সব্বাই ভাল আছে তো?

হ্যাঁ, বাড়ির সবাই ভাল আছে। কাল মীরাকে ধরে এনেছি বেলদা থেকে। কিন্তু আমি ভাল নেই। সুদাম ঠোঁট কামড়ে ধরল উত্তেজনায়।

জীবন মাষ্টার উঠে দাঁড়াতেই হাত ধরে বসিয়ে দিল সুদাম। তার অস্বাভাবিক আচরণে খুবই অবাক হল জীবন মাষ্টার। কপালে ভাঁজ ফেলে কিছুটা বিরক্তির সুরে সে বলল, তোর কি এমন কথা যার জন্য অমন হড়বড় করছিস? সুদাম কাশল বার কয়েক, তারপর কিছুটা চড়া গলায় শুধোল, কাল কি ফুড়কুনী দীঘায় গিয়েছিল?

হ্যাঁ গিয়েছিল তো। কেন কি হয়েছে?

না, কিছু হয়নি, এমনি শুধালাম। সুদামের কণ্ঠস্বর বুজে এল, কার সাথে গিয়েছিল, কে নিয়ে গেল ওকে?

কেন তাপস মাষ্টার নিয়ে গেল, আমিই বলেছি ওকে নিয়ে যেতে।

ফুড়কুনী গেল?

যাবে না কেন? জীবন মাষ্টার দীর্ঘস্থায়ী ভাবলেন, মেয়েটা কোথাও যেতে পারে না, সারাদিন তো ঘরে থাকে। তাপস মাষ্টার আমাকে এসে বলতেই আমি রাজি হয়ে গেলাম। তোর কাকিমারও যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু বাতের ব্যথাটা বাড়তেই সে আর যেতে পারেনি। কথাগুলো শুনে সুদাম আস্তে করে উঠে দাঁড়াল, বাইরে এত আলো তবু অন্ধকার নেমে এল দু-চোখে। বুকের ভেতর ভালবাসার পাখিটা চোট খেয়ে গোঙানী ভাসিয়ে দিল বাতাসে। ঝিমিয়ে গেল টগবগে রক্ত। এই কথাগুলো যদি মিথ্যে হত তাহলে বুঝি ভাল হত। সুদাম নিজের কপাল টিপে ধরল অসহ্য যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পেতে। জীবন মাষ্টার তার এই পরিবর্তনের অর্থ কিছু বুঝতে পারল না। এইটুকু বুঝতে পারল সুদামের ভেতর ঝড় বয়ে যাচ্ছে কোন কারণে। সে চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে সুদামের হাত ধরল। খুবই স্নেহভরা স্বরে শুধালো, হঠাৎ তোর কি হল, অমন যে দরদরিয়ে ঘেমে যাচ্ছিস? একটু বসে যা। শরীর সুস্থ বোধ করলে তারপর চলে যাস।

আমার এ শরীর আর ভাল হবে না। দু-চোখ বহু কষ্টে রগড়ে নিয়ে সুদাম উদাসী গলায় বলল কথাগুলো, জান কাকা, আমাকে কালরোগে ধরেছে। এ রোগ কোন ডাক্তার ভাল করতে পারবে না।

সে কি রে তুই এত অসুস্থ আগে বলিসনি তো?

আগে বলার দরকার হয়নি। এখন দরকার হল তাই বললাম। সুদাম এড়িয়ে যেতে চাইল জীবন মাষ্টারের সান্নিধ্য, আমি যাই। আজ আর সাইকেল দোকানে আসব না। মাথাটা সেই কাল রাত থেকে ধরেছে। তাকাতে পারছি না, তাকাতে গেলেই চোখে জল আসছে।

এসব ভাল লক্ষণ নয়, তুই বরং কাঁথি বা রামনগর থেকে ডাক্তার দেখিয়ে আয়। টাকা পয়সার অসুবিধা থাকলে আমার কাছ থেকে নিয়ে যা।

তার আর দরকার হবে না। টাকা আছে। সুদাম মাথা নিচু করে বেরিয়ে এল দোকান থেকে। ভার হয়ে আসছে দু-চোখ, লাল হয়ে উঠছে চোখের জমি। হাঁটতে গেলেই কেঁপে উঠছে পা, টলে উঠছে দেহ। তবু কোন ক্রমে পাকা রাস্তা পর্যন্ত হেঁটে গেল সুদাম। ফুড়কুনীর মুখটার বারবার করে মনে পড়ল তার। দু-চোখ ভরে উঠল জলে। ঝাপসা হয়ে গেল সুদাম। ফুড়কুনীর মুখটা বারবার করে মনে পড়ল তার। দু-চোখ ভরে উঠল জলে। ঝাপসা হয়ে গেল পৃথিবী। হারিয়ে গেল পায়ের তলার মাটি। সে এখন কোথায় যাবে, কোথায় গিয়ে স্থিতু হবে? টলমল পায়ে সে হেঁটে গেল ফুড়কুনীদের ঘরের দিকে। ধানমাঠ এখন ফাঁকা। ফসল ঠাঁই পেয়েছে খামারে। সুদামের মনে পড়ে গেল ফুড়কুনীর আধো কথা। হাসি ভরা মুখ আর পদ্মদিঘির চাহুনী। সুদাম আলতো হাতে ছুঁড়ে দিল তার হারিয়ে যাওয়া স্বপ্ন। কেঁপে উঠল ঠোঁট, চোখ থেকে ঝরে দুঃখ ভার।

সুধাময়ী এসে পাশে দাঁড়িয়েছে সে টেরই পায়নি, উজ্জ্বল রোদে সুধাময়ী দাঁড়িয়ে আছে একা একা। হঠাৎ প্রশ্ন ভেসে এল বাতাসে, সুদাম, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কি করছ? ঘরে চল।

আজ আর বসব না, একটু তাড়া আছে। ফুড়কুনীর সাথে দেখা করই চলে যাব। কাতর গলায় সুদাম বলল।

ফুড়কুনী তো ঘরে নেই। বিচলিত বোধ করল সুধাময়ী, সে মাষ্টারের ঘরে গিয়েছে আমিই তাকে পাঠিয়েছি। আসলে ছেলেমানুষ মাস্টার। রান্নাবান্না করতে পারে না। আমিই ফুড়কুনীকে বলেছি যা রান্নাবান্না করে দিয়ে আয়।

সুদাম শূন্য চোখে তাকাল, তার মনে হল সবাই যেন তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে নেমেছে। সে একা কী করবে? তার সামর্থই বা কতটুকু? তবু এত দূর যখন এসেছে, সে দেখা করেই যাবে। দগ্ধে দগ্ধে মরার চেয়ে একেবারে মরে যাওয়া ঢের ভাল।

কাকিমা, ফুড়ুকুনীকে একটু ডেকে দিন না? একটা কথা বলেই চলে যাব।

সুধাময়ী গুরুত্ব দিল না তার কথায়, দায়সারা গোছের তাকাল। সুদাম দাঁড়িয়ে আছে বলে কিছুটা বিরক্ত হল সে। গলা নামিয়ে বলল, তুমি যাও গিয়ে দেখা করে এস।

আমার ওখানে যাওয়া উচিত হবে? সুদাম নিরুপায় হয়ে বলল, আমি বেশি সময় নষ্ট করব না। শুধু একটা কথা জিজ্ঞেস করে চলে যাব।

তোমার কথাটা কি আমি শুনতে পারি?

না ওকথা আপনাকে বলা যাবে না।

কি এমন কথা, যা আমি শুনতে পারি না। সুধাময়ী অসন্তুষ্ট হয়ে উঠল।

সুদাম সহজ গলায় বলল, সব কথা সবাইকে বলা যায় না। আমি যা বলতে এসেছি তা আমার জীবনের কথা।

দাঁড়াও তাহলে, দেখি সে আসে কিনা। সুধামায়ী গলা উঁচিয়ে ডাকল, ফুড়কুনী, একবার আয় তো মা। সুদাম এসেছে, তোর সঙ্গে দেখা করতে চায়।

সুধাময়ী ঘরের ভেতরে ঢুকে গেল। তার প্রায় মিনিট দশেক পরে পাশের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল ফুড়কুনী। তাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন মাষ্টার। সুদামকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন তাড়াতাড়ি এস, নাহলে তরকারি পুড়ে যাবে।

ফুড়কুনী পিছন ফিরে তাকাল, তার ঠোঁটে খেলে গেল নিখুঁত হাসি।

সুদাম ফুড়কুনীর ছায়ায় দাঁড়িয়ে দেখছিল তাকে। সাত সকালে স্নান সেরে ফুড়কুনী যেন রানীর মত সেজেছে। পরনে তার দামি শাড়ি, গায়ে উগ্র প্রসাধনের চিহ্ন। কড়া গন্ধে নাক ঝালাপালা করে উঠল সুদামের। ফুড়কুনী অস্থির, বিব্রত চোখের দিকে তাকিয়ে সে যেন খুঁজতে চাইল তার চেনা পাখিটাকে। খুঁজে পেল না সুদাম। বুক ভাঙা যন্ত্রণা নিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকল সে।

ফুড়কুনী আঁচলটা তর্জনীতে জড়াতে জড়াতে বলল, আমি জানতাম তুমি আসবে। এসে ভালই করেছ। আমাকে আর তোমার কাছে যেতে হল না। যাক, কিসের জন্য এসেছ বলে ফেল। শুনলে তো আমি তরকারি বসিয়ে এসেছি, পুড়ে গেলে ও খেতে পারবেনা। সুদাম কি বলবে, গলায় হারিয়ে গেল শব্দ। সে ফ্যালফ্যাল করে তাকাল।

ফুড়কুনী অস্থির হয়ে বলল, আমি ভুল করেছিলাম। আমাকে ক্ষমা করো।

চোখ নামিয়ে নিল সে। সুদাম ভাষাহীন চোখে তাকাল।

ফুড়কুনী ব্যস্ত হয়ে বলল, তুমি একটু দাঁড়াও আমি ঘর থেকে আসছি।

দ্রুত পায়ে সে চলে গেল ঘরের দিকে।

ফিরে এসে বলল, তোমার সিঁদুরের কৌটোটা ফিরিয়ে নাও। ওটার আর প্রয়োজন নেই।

যা একবার দেওয়া হয়, তা আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। সুদামের দু-চোখে মেঘ নেমে এল, ওটা তুমি নিজের হাতে ফেলে দাও। আমি দুঃখ পাব না। কেন পাব দুঃখ? ভালবাসা সবার কপালে সয় না।

পাশে বাড়ি থেকে ভেসে আসে কবুতরের গলা, এ্যায় কোথায় গেলে, তাড়াতাড়ি আসো। তরকারি যে পুড়ে যাচ্ছে।

ফুড়কুনী আর দাঁড়াল না, যাওয়ার সময় একটাও কথা বলল না। প্রজাপতি হয়ে সে উড়ে গেল পাশের ঘরে। যাওয়ার আগে সিঁদুরের কৌটোটা ছুঁড়ে দিল পুকুরের জলে। সুদাম দেখল সামান্য একটা ঢেউ কি ভাবে ছড়িয়ে পড়ছে পুকুরের জলে। ঢেউ কি শুধু পুকুরে, তার বুকের ভেতরও। সব ঢেউ কিনারা পায়, এ ঢেউয়ের কোন কিনারা নেই।

॥ ষোল ॥

ঢেউ ওঠে, ঢেউ হারায়, ঢেউয়ের শেষ নেই।

আম গাছের পাতা চুঁয়ানো জল অবুঝ প্রেমিকের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে পুকুরের বুকে। ভরা শ্রাবণে পুকুর হয়েছে রুপসী কন্যা। কলমীলতার বাড়বাড়ন্ত চেহারা। তারাও দখল নিতে চায় ঘোলা জলের। আস্পর্ধা কম নয়। জানে না ঢেউ উঠলে ভেসে যাবে কলমীলতার সুখের সংসার।

সুদাম পুকুরের পাড়ে বসে ঢেউ গোনে না, তার হারান অতীতকে ডুবিয়ে দেয় পুকুরের জলে। বামন হয়ে চাঁদ ধরতে গিয়ে হাত-পা ভাঙেনি, শুধু মন ভেঙেছে এই নিয়ে যত ব্যথা-যন্ত্রণা। পুকুর পাড়ের একটু দূরেই বাঁশঝাড়। কটরাব্যাঙ সেই তখন থেকে ডাকছে। এই সময়টা বুঝি তাদেরও ডিম পাড়ার।

ঝুমা এসেছিল ভালবাসার প্রস্তাব নিয়ে সুদামের কাছে। সুদাম তাকে তাড়িয়ে দিল। যাওয়ার সময় বলে গেল এখনও দেমাক কমেনি তোমার। জীবন মাষ্টারের মেয়েকে তো চিনলে না, সে একটা চিজ। জাহাজ দেখেই সে ডিঙা ছেড়ে দিল সহজে। ভাগ্যিস ডুবে যায় নি ডিঙা, তাহলে তোমাকে আর খুঁজে পেতাম না। অনেকে চোট খেয়ে বিষ খায়, গলায় ফাঁস নেয়। তুমি দেখছি সে দলে নাম লেখাও নি। শুধু দোষের মধ্যে চোলাই খাচ্চ দিনে দু-বার করে। দাঁড়াও আমি তোমার মাকে সব বলব। নিজেকে নষ্ট করার ক্ষমতা তোমাকে কে দিল? ঝুমা চোখ মুছে নেয় শাড়ির আঁচলে তারপর আর দাঁড়ায় না।

দিনের বেলায় পুকুর ধারে আলো আসে কম। ভেজা মাটি সুবাস ছড়ায় চতুর্দিকে। চোঙা মাইকের মত কলমী ফুলে ভ্রমর এসে বসে। গুনগুন ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ে। বুকে হাত রেখে সুদাম খুজতে চায় ক্ষতটাকে। দু-মাসেও ক্ষত ভরাট হল না। জীবন মাষ্টার সব শোনার পর বলেছিল, সব ভুলে যা, ওসব হল জলের দাগ। জীবনে এরকম অনেক ঢেউ আসে। তুই দীঘায় গেলে বুঝতে পারবি ঢেউ বড় হয়, ছোট হয়, আবার হারিয়ে যায়। ফুড়কুনী যা করেছে তা ওর ভালোর জন্য করেছে। মেয়েটা সারাজীবন কষ্ট পেল, ওকে এবার একটু সুখে থাকতে দে।

ফুড়কুনীর সুখের জন্য এখনও জীবন দিতে পারে সুদাম, ফলে সে হাসতে হাসতে পাঁচুর সাইকেল দোকানের কাজটা ছেড়ে দিল। পাঁচু তাকে কত বোঝাল, ছাড়বি কেন, হাতের লক্ষ্মী কেউ পায়ে ঠেলে? পাগল কোথাকার!

নিমাইয়ের মা ঘটনাটা জানতে পেরে মুখে চুকচুক সান্ত্বনার শব্দ করে বলল, চোরের উপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাবি কেন? একটা কথা মনে রাখিস বাপ, সোনার আংটি বাঁকা হলেও দাম কমে না। তুই পুরুষ মানুষ, তোর দাম সবসময়।

বিয়ের পর ফুড়কুনী আর তাপস মাষ্টার সংসার পেতেছে বাজারের উপর। ভঞ্জবাবুদের পাকা ঘরটা ভাড়া নিয়েছে ওরা। ফুড়কুনী জানলা খুললেই পাঁচুর সাইকেলের দোকানটা দেখা যায়। সে দেখতে পেত সুদাম সাইকেল সারছে দোকানে, তার রুগ্ন শরীর, মরা মন—সে যেন শুকিয়ে যাওয়া পুঁইডাঁটা। বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারত না ফুড়কুনী, তার শরীর জুড়ে শুরু হত অন্যের মন পুড়িয়ে খাক করে দেওয়ার অনুশোচনা। সে যে নিজেকে এত দ্রুত বদলে ফেলবে সে নিজেই জানত না। মেয়েরা পারে না এমন কোন কাজ নেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে। তারা ইচ্ছে করলে জলে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে। আগুন ছাড়াই তারা জ্বালিয়ে দিতে পারে বিপরীত তাপের বক্ষঃস্থল। টাটকা রোদে সুদামকে ঘামতে দেখে হাসি পায় ফুড়কুনীর। ঘেন্নাও হয় নিজের উপর। সে তার মা-বাবাকে দেখেনি, কে তার মা-বাবা তাও জানতে চায় না। তার জানার আগ্রহ মরে গেছে। সে একটা বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছে তার জন্মদাতা এবং জন্মদাত্রী সৎ ছিল না। তারা যদি সঠিক পথে চলত তাহলে ফুড়কুনী কোনদিন প্রথম প্রেমের বুকে অনীহায় ছোরা চালাতে পারত না। মা বাবার স্বভাব পায় ছেলে-মেয়েরা, তাদের রক্তে দৌড়ে বেড়ায় সৃষ্টিকর্তার খুন-যমুনা। তা যদি হয় তাহলে ফুড়কুনী নিজকে বদলাবে কি করে? বাবা-মায়ের চরিত্র ভাল না হলে ছেলে-মেয়ের চরিত্র ধোয়া তুলসী পাতা হতে পারে না। সুদামের দিকে তাকিয়ে এরকম অনেক কথা মনে আসে ফুড়কুনীর। সে জানলার শিক ধরে হা করে তাকিয়ে থাকে পাঁচুর সাইকেল দোকানের দিকে। দু-তিনদিন দেখার পরে সুদামই সিদ্ধান্ত নেয় সে কাজটা ছেড়ে দেবে। পচা সুতো দিয়ে সে আর নতুন করে বাঁচার মালা গাঁথতে চায় না। সুদামকে দেখতে না পেয়ে হাঁপিয়ে ওঠে ফুড়কুনী। সে চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে ছুটে আসে পাঁচুর দোকানে। নিজেকে আর লুকিয়ে রাখতে পারে না, ব্যাকুল হয়ে শুধায়, কাকা, সুদাম কাজে আর আসে না কেন?

সে কাজ ছেড়ে দিয়েছে।

কেন?

আমি তার কি জানি মা। তবে সে বলছিল তার নাকি কেউ মারা গিয়েছে। জানি না বাবা, কে মরল আবার? পাঁচু নিজের কাজে মন দেয়। ফুড়কুনী ঘরে ফিরে গিয়ে বালিশ ভিজিয়ে কাঁদে। তার ঘোর কেটে গিয়েছে বিয়ের পরেই। ফুলশয্যার রাতে ফুড়কুনী লজ্জায় কুঁকড়ে গেলে তাপস তাকে বলেছিল, তুমি মানসীর মত নও। বিয়ের আগে মানসী কত স্মার্ট ছিল। আমি বললেই সে হয়ে যেত মলাট ছাড়া কাব্যগ্রন্থ।

তাপসের চাওয়ার কোন শেষ নেই। মাঝে মাঝে তার ভেতরে একটা পশু শক্তি জেগে ওঠে। বিছানায় কেঁদে কঁকিয়ে ওঠে ফুড়কুনী, অনাবৃত বুকে শাড়ি চাপা দিয়ে বলে, তুমি আমার সাথে এত খারাপ ব্যবহার করো না। আমি বাজারের মেয়ে মানুষ নই, তোমার বউ!

যে ভুল ফুড়কুনী করেছে তার প্রায়শ্চিত্ত সে করতে চায়। কারোর অভিশাপ, দীর্ঘশ্বাস মাথায় নিয়ে বেশি পথ হাঁটা যায় না। এখন চোখ বুজলেই সুদামের অসহায় মুখটা যেন ধারাল ব্লেড হয়ে তার সারা শরীরে ক্ষতচিহ্ন এঁকে দেয়। সে আর্তনাদ করে ওঠে, এই তীব্র দহন জ্বালা থেকে নিজেকে বাঁচাতে চায়।

টানা বর্ষায় ডুবে গেছে স্কুলের মাঠ। জল ভেঙে ফুড়কুনী গিয়েছিল পুবপাড়ায়। ঝুমার সাথে দেখা হতেই তার সুন্দর চোখ দুটো পচা লাউজালির মত নেতিয়ে গেল। নিখুঁত মুখশ্রীতে গ্রহণ লাগল তখন। ঝুমা তাকে দশ কথা শুনিয়ে ছাড়ল, তোমার মত মেয়েরা হল সুখের পায়রা! পায়রার মত বুক নিয়ে সমুদ্রের কাছে যেতে তোমার লাজ লাগে না? ভালবাসাকে যারা টাকা আর চাকরি দিয়ে মাপে, তারা তো ছেনাল। তাদের মুখ দেখলে সেদিন খাওয়া জুটবে না।

ঝুমার হাত দুটো ধরে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল ফুড়কুনী, ওকে একটু বুঝিয়ে বলো, আমি নিরুপায় ছিলাম, আমার কিছু করার ছিল না। ওর ভালবাসা আমাকে যে শাস্তি দিয়েছে তাতে তাপস মাস্টার পুরো পৃথিবীটা এনে দিলও আমি ওকে ভালবাসতে পারবো না। তুমি তো মেয়ে, তুমিই বলো—মন থেকে ক'জনকে ভালবাসা যায়? কুমারী মেয়ের ভালবাসা দিনের আলোয় লুকিয়ে থাকা তারার মত। আমি না মরা পর্যন্ত বুকে বয়ে বেড়াব।

ফুড়কুনীর কথাগুলো কানে গিয়েছে সুদামের, সে হাসবে না কাঁদবে কিছুই বুঝতে পারেনি। শ্রাবণের আকাশ মানুষ ঠকায় সবসময়। সমুদ্র ফুঁসে ওঠে জোয়ারের টানে। সুদাম এই চেনা বাজারের ছায়া মাড়াতে চায় না আর। তার জন্য কারোর সংসার ভেঙে যাক—এও তার কাম্য নয়। ভরত মেয়ে দেখছে সুদামের জন্য। সুদাম মুখের উপর বলেছিল, সে বিয়ের পিঁড়িতে বসবে না। বুকে ঘা নিয়ে পরের মেয়েকে সুখে রাখা যায় না।

ভরত মতিগতি বুঝতে পারে না ছেলের, সে কপালে হাত দিয়ে বসে থাকে দোরগোড়ায়। মাজা-ভাঙা সাপ ফণা তুলতে পারে না। ফণা না তুললেও বিষ কমেনা। বিষ না কমলে হারায় না যৌবন। সুদাম একা একা আনমনা হয়ে ঘোরে। নকুল তাকে বোঝায়, ছেলেমানুষী করিস নে, চল দু-জনে মিলে মাছের ব্যবসায় লেগে যাই।

মাছের ব্যবসা? ওসব আমার দ্বারা হবে না। সুদাম শূন্য চোখে বৃষ্টিতে ভেজা মাটির

ঘরখানার দিকে তাকিয়ে থাকে। অভাবের জল চুঁয়ায় খড় বেয়ে। কেঁচো উঠে আসে দাওয়ায়। পচা কাদার গন্ধে গা গুলিয়ে ওঠে সুদামের।

নকুল তবু আশা ছাড়ে না, সাইকেলের ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। পাঁচু কাকা তাকে একটা সাইকেল দেবে যার দাম দিতে হবে না। তুই তো ওর দোকানে কাজ করেছিলিস, তোরও কিছু পাওনা আছে। সাইকেল দিলে সব শোধ বোধ হয়ে যাবে। তাছাড়া তোর এখানে থাকা ঠিক নয়। সব সময় আগুনের কাছে থাকলে তাত লাগবে। তুই ঝলসে যাবি। তোর মনটা পুড়ে ছারখার হবে। পালিয়ে চল, কাজের মধ্যে ডুবে থাক—এতেই তোর শান্তি।

ভোরবেলায় আটার রুটি করে দেয় যোগমায়া, সাইকেল নিয়ে সমুদ্রের দিকে পাড়ি জমায় সুদাম আর নকুল। যাওয়া আসা মোট তিন ঘন্টা। প্যাডেল করে কনকন করে পা। নকুল বলে, মানুষ অভ্যাসের দাস। দু'দিন গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

মাছের ঝুড়ি দুটো বাঁধা থাকে কেরিয়ারের দু'পাশে। ভরত নিজের হাতে বানিয়ে দিয়েছে নিজের ছেলের জন্য। সে জানে মাছ ব্যবসায় কাঁচা পয়সা। বরাত খুলে গেলে খড়ের ছাউনি বদলে টিন বা টালি লাগাতে কতদিন লাগবে।

দীঘার ঝাউবন দেয় সুদামকে নতুন জীবন। নকুল তার সঙ্গ ছাড়ে না। মাছের আড়তে নকুলই পরিচয় করিয়ে দেয় সুদামের। ধার-বাকি চলে, মহাজন মাটির মানুষ। প্রায়ই বলে, তুমি আমার পয়সা নেবে, কিন্তু ভাগ্য নিতে পারবে না। এই দীঘা-শঙ্করপুরে আমার সাতখানা ট্রলার চলে। আমার যা সারণি জালের স্টক তা দিয়ে আমি নিউদীঘা ঢেকে দিতে পারব।

এত যার অর্থ, বৈভব, পরাক্রম—সেই মানুষটাকে ভাল লেগে গেল সুদামের। জহর মহাজন তার পিঠ চাপড় দিয়ে বলে, তুমি আমার ছেলের মত, আমার সাথে কারবার করে ঠকবে না। নোনা জলের কারবারী, মিঠে জলের সওদাগর। সুদাম সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকে হা করে। ঢেউ ভাঙে সমুদ্র, ঢেউ ভাঙে ফুড়কুনী। তার রুপের বাহার রুপাপাটিয়া মাছের মত চমৎকার। ঝাউ বনে নকুল ঠেলা মেরে বলে, সমুদ্র কোনদিন পুরনো হয় না। যত দেখবি ততই মনে হবে নতুন।

ফুড়কুনী পুরনো হয় না। দীঘার মত রূপে নিত্য নতুন তার রূপ-মাধুর্য। নারীও লুকিয়ে রাখে ঢেউ চোখের ভিতর। ঢেউয়ের মাথায় জোনাকীর মত ঝকমকায় চোখের তারা। নোনা জল সিক্ত করে জমি।

নকুল তার হাত ধরে টানে, চল আজ তোকে জবার হোটেলে ভাত খাওয়াই। জানিস, জবার টকরসা একবার খেলে ভোলা যায় না। তুই তো ফুড়কুনীর কথা বলিস, সে যদি নোনা জল হয় তাহলে জবা হল সমুদ্রের ফেনা।

ঝুপড়ির হোটেলের রেডিও বাজে দুপুর বেলায়। আধুনিক গান হয়, হয় জোয়ার-ভাঁটা সংবাদ। মাঝিরা সতর্কিত হয় ঝড়, বন্যায়। জহর মহাজনের ট্রলার বাঁধা থাকে কিনারে। জোয়ারের সময় কে আর ঝুঁকি নিতে চায় জীবনের!

সরু টেবিলের ভাত দিয়ে যায় জবা, ওর মুখের লালিমা জবা ফুলের চেয়েও দৃষ্টি আকর্ষণকারী। কোমরে আঁচল গুঁজে জবা কাজ করে হোটেলে। ওর বাবা দশরথ ক্যাশে বসে পয়সা গোনে শুধু। মেয়ের কর্মক্ষমতা বুড়োকে আরও কুঁড়ে করে দিয়েছে।

নকুল জবাকে ডাকল হাতের ইশারায়, জবা কাছে আসতেই তার শরীর থেকে উঠে এল মৎস্যগন্ধার সুবাস। নকুল পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, আমার ছোটো বেলাকার বন্ধু সুদাম। ও তোমার হোটেলে খাবে। তুমি ভাল করে খাওয়াবে। আমি না আসলেও তুমি ওর কাছ থেকে পাইকারী রেটটা নেবে।

জবা ঘাড় নাড়ল।

খেয়ে-দেয়ে হাত মুখ ধুয়ে এল সুদাম। দশরথকে টাকা দিতেই সে খুশি হয়ে বলল, এই নকুল আমার দোকানে পাঁচ বছর ধরে খাচ্ছে। ওকে আমি কোনোদিনও ঠকাইনি। তুমিও এস। আমার এখানে এসে কেউ খালি মুখে ফিরে যায় নি। আমার জবারানী থাকলে সে একাই একশ লোকের রান্নাবান্না করে দেয়। শুধু রান্না করা নয়, খেতেও দেয় সে। ওর দু-হাত সবসময় মেশিনের মত চলে। জান বাবা, মেয়েটা এত খাটে তবু ওর ক্লান্তি নেই।

সমুদ্রের কি ক্লান্তি আছে? সুদাম ভাবল। সমুদ্র দেখতে গিয়ে সে দেখল জবার চোখ।

॥ সতের ॥

চোখে যদি যাদু থাকে সেই যাদুর উৎস হল সমুদ্র। নীল জলরাশি আকাশের মুগ্ধতায় সঁপে দিয়েছে নিজেদের। এ বড় আজব লীলা। কোথাকার জল কোথায় এসে পড়ে। হাওয়া, রোদ এবং মেঘের খেলা চলে প্রতিনিয়ত। বালি চিকচিকিয়ে ওঠে রোদের সোহাগ উষ্ণতায়। এমন দীর্ঘস্থায়ী ভালবাসা কোন দিন কি সুদাম দেখেছে। তার সমস্ত শরীর সিরসিরিয়ে ওঠে টান টান উত্তেজনায়। তার বড় সখ ছিল ফুড়কুনীকে নিয়ে অন্তত একবার সমুদ্রে আসা। সমুদ্রের গল্প কত যে শুনেছে সে। এই বিশাল জলরাশি কী ভাবে ধরে রেখেছে একে অপরকে এই মৌলিক শিক্ষার প্রয়োজন ছিল সবার। এখন সমুদ্র পাড়ে দাঁড়িয়ে নকুল যেন খোলা হাওয়ার মত হাসে। আমোদপ্রিয় ভ্রমোনার্থী বালুতটে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের ছায়ার উপর গড়িয়ে যাচ্ছে ঢেউয়ের শেষ টান। এত মানুষ ভালবাসে সমুদ্রকে? ওরা কিসের জন্য আসে এখানে? নকুলের মুখের দিকে তাকিয়ে সুদাম জিজ্ঞেস করে, শুধু কি সমুদ্রকে ভালবেসে ওরা এখানে আসে নাকি অন্য আরও কোন গোপন উদ্দেশ্য থাকে। জহর মহাজনের মাছখটী থেকে সমুদ্র দেখা যায়। রোজই হা করে তাকিয়ে থাকে সুদাম। জহর মহাজন রসিকতা করে বলে, লোকে প্রেমে পড়লে সমুদ্রে আসে, চোট খেলেও সমুদ্র ভালবাসে। তা তুমি কোন দলের পথিক হে!

সুদাম কি জবাব দেবে ভেবে পেল না। পথ হারান মানুষ পথের জন্য দৌড়ে বেড়ায়। সুদাম পথ চায় না, সে চায় শান্তি। টানা সাত দিন লাভের পর ক্ষতির মুখ দেখেছে সে কাল। আসলে আকাশ রুষ্ট হলে সে কোপ সামলান যায় না। মাছখটী থেকে বেরবার পরই চেন পড়ে গিয়েছিল সাইকেলের। পানিপারুল আসতেই শুরু হল মুষলধারে বৃষ্টি।

নেগুয়ার হাটটা ধরতে পারলে লাভের মুখ সে অবশ্যই দেখতে পেত। কিন্তু নেগুয়া অব্দি পৌঁছান গেল না।, তার আগেই নকুল সাবধান করে বলল, কেনা দামে ছেড়ে দে সুদাম, আজ মনে হয় কপালে দুঃখ আছে।

আকাশ মুখ গোমড়া করে থাকলে বৃষ্টির পরশ সেই গোমড়া স্বভাব সুদামকেও ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। জবার হোটেলে খেতে গিয়ে আজ আর জবার সাথে দেখা হল না। দশরথ কাঠের চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে খুবই নিস্তেজ স্বরে বলেছিল, মেয়েটা আজ আর আসবে না। কাল রাত থেকে ওর গায়ে ধুম জ্বর। আমি ওষুধ এনে দিয়েছি দোকান থেকে। দশরথের চিন্তাটা কী ভাবে যেন সুদামের বুকে ছড়িয়ে পড়ে। ঝুপড়ি হোটেলের আয়ে তার সংসার চলে কোনমতে। দীঘায় বেড়াতে আসা মানুষগুলো ভুল করেও তার হোটেলের দিকে তাকায় না। মাছখটীর খুচরো ব্যবসায়ীগুলো এখনও বাঁচিয়ে রেখেছে তার হোটেল, না হলে কবে লালবাতি জ্বলে যেত। জবার বয়স হয়েছে কিন্তু এখনও তার কোনও সম্বন্ধ এলনা। লম্বা মুখশ্রী জবার। ফর্সা নয়, তবে শ্যামলাও নয় পুরোপুরি। একনজর দেখে তাকে কেউ কুৎসিৎ বলতে সাহস পাবে না। ওর শরীর জুড়ে উঠে আসে লালচে একটা আভা। যখন সমুদ্রের বুক থেকে সূর্য ওঠে, চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে রঙ, যখন জলে গুলে যায় হালকা লাল রঙ-পূব দিকে মেতে ওঠে লাল আভায় আবীর মেখে, সেই লাল আভাটাই যেন জবার মুখ কেটে ফুটে বেরয়।

সেদিন কথায় কথায় নকুল বলছিল জবা মেয়েটা খারাপ নয়। খুব চালাক-চতুর। ও একা কি ভাবে পুরো সংসারটাকে ধরে আছে ভাবলে অবাক হতে হয়। মেয়েরা জবার মত না হলে সংসার উচ্ছন্নে যাবে।

নকুলের কথাকে আমল দেয়নি সুদাম, তবু নকুল বলল, দশরথের চার ছেলে, ওরা এখন দীঘাতেই ব্যবসা করে। তারা সব আলাদা হয়ে গিয়েছে। কেউ কারোর সাথে যোগাযোগ রাখে না। তবে আমি শুনেছি জবা সবার বাড়ি যায়, খোঁজ-খবর নেয়। ওকে ওর দাদারা ভালবাসে।

দুই বোনের মধ্যে জবাই বড়। টগর তার থেকে বছর দুইয়ের ছোট। তবে টগরের মুখশ্রী তার চাইতে আরও ধারাল। টগরের গায়ের রঙ লালচে নয় অবিকল সাদা। মেঘের মত। ফর্সা বলেই ছোট মেয়ের নাম রাখা হল টগর। সে ঝাউবনের চেয়েও চঞ্চল। চোখ মুখ এমন কি শরীরের বাঁধুনীতে বাড়তি আকর্ষণ। জবাকে দেখতে এসে দারুয়ায় বিষ্ণু টগরকেই পছন্দ করল। এ ঘটনায় ঝিমিয়ে গেল জবা। সে দীর্ঘদিন দীঘার ধারে আসেনি। ঘরেই লুকিয়ে রাখত নিজেকে। অথচ টগরের কোন প্রতিক্রিয়া নেই। সে যেন খুশির জোয়ারে ভেসে যাওয়া পুজার ফুল। দিদির কথা ভাবল না। ভাবল না তার দুঃখের গভীরতা। সে নিজেকে নিয়ে মশগুল থাকে। নিজের সুখ ছাড়া অন্যের কথা ভাববার সময় পায় না—তারা স্বার্থপর না আত্মকেন্দ্রিক বোঝা কঠিন। টগরের বিয়ে হয়ে গেল ধুমধাম করে, জামাই কাঁথি পৌরসভার ঝাড়ুদার, দারুয়াতে তাদের নিজের ঘর আছে বালিচড়ায়। টগর যখন ঘরে আসে তখন তার চালচলন অন্যরকম। দিদিকে সে দয়ার চোখে দেখে। বাজি জিতে যাওয়ার আনন্দটা তার বুকের ভেতরে খেলা করে। সে মুখ

ফুটিয়ে কিছু না বললেও হাবভাবে সব বুঝিয়ে দেয়। জবা কিছু না বললেও দশরথের বুক ফেটে যায়। টগরের গর্ব ধরে না—বিষ্ণু চাকরি করে বলে সে জবাকে শোনায় তার সুখের কথা। জবা আয়নায় দেখে তার হেরে যাওয়া মুখখানা। ফাঁকা সিঁথি কে ভরাবে, কে পূরণ করবে তার স্বপ্ন। হোটেল চালায় যে মেয়ে, তার বিয়ে দেওয়া কঠিন কাজ। কালু বিয়ে করতে চেয়েছিল। দশরথের অমত ছিল না কিন্তু জবাই বেঁকে বসল। কালু নেশা করে প্রায়দিন, ওর ভাইগুলো চোর। ঘরবাড়ি ভাল নয়। সমুদ্র ঝড়ের সময় জবা দাঁড়াবে কোথায়?

দীঘায় নয়, জবা চলে যাবে অনেক দূরে। গ্রামে শ্বশুরঘর হলেও তার কোন ক্ষতি নেই। সে চায় তার স্বামী তাকে ভালবাসবে, সুখ দেবে। তাকে ছাড়া অন্য কারোর কথা ভাববে না। এই বালিয়াড়ি, ঝাউবন, সমুদ্রধার, ঘুরতে আসা যুবক-যুবতীর দল, তাদের উৎশৃঙ্খল ব্যবহার জবাকে সেই ছোট থেকেই পুরুষের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগী করে তুলেছে। জীবন সম্বন্ধে তার আগ্রহ বেড়েছে বয়স বাড়ার সাথে সাথে। সে স্বল্প সামর্থে চেষ্টা করে নিজেকে সাজিয়ে রাখার। পুরুষ আকর্ষণের কলকাঠি তার জানা আছে। সে চোখ দিয়ে পুরুষের ভেতরটা দেখে নিতে পারে। সাগরমেলায় সে উতলা হয়ে ওঠে, কোন যুবকের গোপন সঙ্গ পাবে বলে। টগর তার এই আদিম ইচ্ছেটাকে আরো তীব্র করে দেয়। সে বিষ্ণুর সাথে এমন ব্যবহার করে দেহজ যেন এক বছর নয়, মাত্র একদিন তার বিয়ের বয়স। জবা তাই হেরে যেতে চায় না টগরের কাছে। তার চোখ সদা-সর্বদা খুঁজে বেড়ায় যুবক শরীর। অতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে ঘন ঘন।

জবার জ্বর ছাড়েনি। সে ভর্তি হয়েছে দীঘার হাসপাতালে। দশরথের হোটেল বন্ধ। কালু রিকশাওলা দেখা হতে বলল, কাকা, মেয়েটা বাঁচবে তো? তখন বললাম আমার সাথে বিয়ে দিয়ে দাও, ল্যাঠা চুকে যাক। দিলে না। তোমার মেয়ের বড়ো নাক উঁচু স্বভাব। এবার ঠেলা বোঝ। বয়স বেড়ে গেলে মেয়েদের গতরে আর কি থাকে? দীঘার শুকনো ঝিনুকগুলো দেখছ? ওরা বালিয়াড়িতে পড়ে থাকে, সবাই লাথি মেরে চলে যায়। কেউ আর ফিরেও তাকায় না। যৌবন যাওয়ার আগে মেয়েকে যেখানে হোক গুছিয়ে দাও নাহলে ঠকবে।

কালু নেশার ঘোরে যে কথা বলে দশরথের কাছে তা বেদবাক্য। সে একদিন নকুলের হাত ধরে বলল, আমার মেয়েটাকে পার করার ব্যবস্থা করো। আমি তোমাকে খুশি করে দেব। আমার চাঁদ চাই না, চাকুরিয়া চাই না—মাছখটীর ব্যাপারী হলেও চলবে।

জবাকে হাসপাতালে গিয়ে দেখে আসল নকুল, সুদামকেও জোর করে ধরে নিয়ে গেল, সুদাম কিছুতেই যাবে না, হাসপাতালের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে সে প্রশ্ন করল, জবা আমার কে হয় যে দেখতে যাবো? ওদের হোটেলে ভাত খাই, পয়সা মেটাই—ফুরিয়ে গেল ঝামেলা।

নকুল হাল ছাড়ল না, সে জোর গলায় বলল, আজ পাঁচ বছর জবা আমাকে ভাত রেঁধে খাওয়াচ্ছে। শুধু পয়সা দিলেই কি ভাত পাওয়া যায়? ভাতের জন্য ভাগ্য দরকার। তুই না গেলেও আমি যাব। আমি ভাতের দাম পয়সা দিয়ে মাপি না। আমি মাছের

কারবারী। আমার কাছে কারবারের চেয়েও বড় মানুষের সম্পর্ক। তোর বৌদি কি বলে জানিস? জবা নাকি আমার দ্বিতীয় ঘরনী। নকুলের সাদা হাসি বিদ্ধ করল সুদামকে। সে হেঁটে গেল জবার বেডের কাছাকাছি। জবা শুয়ে ছিল। আধবোজা চোখ, তার শরীর লেপটে ছিল বিছানায়। নকুল কী কাজে যেন বাইরে যেতেই সুদাম শুধালো, কেমন আছো তুমি? হঠাৎ যে জ্বর এল, কি ব্যাপার? জবা রুগ্ন হেসে এই প্রথম সুদামের মুখের দিকে তাকাল, তার শরীরের সব উত্তাপ যেন শুষে নিল সাদা চাদর আর বিছানা। কোন মতে বলল, জ্বর কি বলে-কয়ে আসে? জ্বরের কোন ঠিকানা নেই। কাউকে পেলেই হলো। জ্বর বেড়ে যায়। জ্বর থামান যায় না। জ্বর নিয়েই কত বছর বেঁচে আছি। জবা মুখ ঘুরিয়ে নিল অভিমানে।

সাতদিন পরে জবাকে ছেড়ে দিল হাসপাতাল থেকে।

দশরথ রিকশা ডেকে ঘরে নিয়ে গেল মেয়েকে। মাত্র কদিনেই শুকিয়ে গেছে জবা, তার চোখের কোল বসে গেছে ভেজা বালির মত। বয়স বেড়ে গেছে অনেক। প্রতীক্ষার গাছটা ঝড়ে নুইয়ে গেছে অনেকটা। মনে চিন্তা থাকলে মেয়েমানুষের চেহারা অর্দ্ধেক হয়ে যায়। ঠোঁট থেকে সরে যায় হাসির মালা। দু'চোখে তখন ছড়িয়ে পড়ে রাশি রাশি শূন্যতা।

রাতে ঘুম হয় না জবার।

মাথার ভেতর পোকা কামড়ায়। দু'জন তাকে দেখে গিয়েছে। পছন্দ হয়েছে। তাদের দাবী আকাশ ছোঁয়া। জবা তার বাবাকে মুক্তি দিতে চায়। সে সংযমী, মার্জিতভাবে বলে, বাবা, তুমি আর কাউকে আমার বিয়ের কথা বলো না। আমি তো গরু-ছাগল নই যে আমাকে নিয়ে দরদাম হবে। আমি হোটেল নিয়ে বেশ আছি। আমার সময় কাটাতে অসুবিধা হয় না।

রাতের অন্ধকারে ঢাকা পড়ে আছে রজনীগন্ধা। তার সুগন্ধকে রাত বন্দী করতে পারে না। জবা কেন অন্যের হাতের পুতুল হবে। সে অন্য ভাবে বাঁচবে। এ বাঁচার আনন্দ অনেক।

তবু দশরথ কথা শোনে না। মেয়ের পাশে বসে শান্ত ভঙ্গিতে বলে, আমার আর কত দিন! বয়স কালে বুড়ো পাতার হাওয়া ভাসতে সময় লাগে না। তখন তোর কি হবে, কে তোকে দেখবে?

দাদারা আছে, তারা আমার পাশে দাঁড়াবে। জবা জোরের সঙ্গে বলে, ওরা আমাকে ভুলবে না বাবা। কাজের ঝামেলায় জড়িয়ে আছে বলে ওরা আমার খোঁজখবর নিতে পারে না।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে দশরথ হারিয়ে গেল স্মৃতির পুকুরে। জবা আর টগর তার দু'চোখের মনি। ছোটবেলা থেকে একসাথে ঘুরত খেলত। জবা একবার জোয়ারের সময় হারিয়ে যাচ্ছিল সমুদ্রে। পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা জেলেরা তাকে বাঁচায়, সেদিন বাতাস ভরিয়ে কেঁদেছিল টগর। নোনা জল খেয়ে জবা যখন মরমর তখন টগর তার জন্য মানত করেছিল ঠাকুরের কাছে। ওদের ভাবছিল। লোকে দেখে বলত, জবা আর টগর একই গাছের দু'রকম ফুল। দশরথের শুনতে ভাল লাগত। বুক ভরে যেত গর্বে।

টগরের বিয়ের পরে সেই গর্ব করার বিষয়টাই হারিয়ে গেছে দশরথের। সে এখন পঙ্গু মানুষের চেয়েও অধম। টগর আর জবা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে এক বিন্দু থেকে। ওরা এখন একে অন্যকে সহ্য করতে পারে না। জবার মধ্যে বিরাট দ্বন্দ্ব খেলা করে। সে হেরে গেছে টগরের কাছে। বিষ্ণুও তাকে হারিয়ে দিল। সিঁদুর দানে বিষ্ণু তার পক্ষে রায় দিল না। একজন মেয়ে হয়ে এর চেয়ে দুঃখের আর কি থাকতে পারে? জবা ধরেই নিয়েছে তার আর কোনদিন বিয়ে হবে না। বয়স বেড়ে গেলে মেয়েরা ঝুরি নামান বটগাছ। তখন দোল খায় উপেক্ষায়। তা সহ্য করা যায় না। চোখ জ্বলে, অবশ হয়ে আসে গা-হাত-পা। মনটা ফাঁকা ফাঁকা লাগে। তখন ভবিষ্যৎ হারিয়ে যায় অতীতের কোলে। ঢেউ তোলা সমুদ্রকে মনে হয় একঘেয়ে জলের পাহাড়। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে যারা ঘুরে দাঁড়াতে পারে জবা কি তাদের দলে? সে জানে না তার শক্তি কতখানি। সে শুধু জানে সে হেরে গেছে। তার সিঁথি এখনও ফাঁকা। মাঝে মাঝে তার মনে হয় সে হারবে না। কালুর হাত ধরে চলে যাবে ঝুপড়িতে। কালু খেতে পরতে দেবে না তবু ছায়াটুকু তো দেবে।

ডাক্তার বলেছেন, সকাল-বিকেল একটু হাঁটা-চলা করতে। এতে শরীর মন দুটোই ভাল থাকবে। দশরথও বলে, যা না মা, সমুদ্রের কাছ থেকে ঘুরে আয়। নোনা হাওয়ায় শরীরের ঘা সারে। মনের ক্ষত জুড়ায়।

ক'দিন হল জবা সমুদ্রের কাছে যাচ্ছে—আসছে। তার মত কত মানুষ হাঁটে বালিয়াড়ি ধরে। ছেলে বুড়ো-যুবক যুবতী—বয়সের কোন মাপকাঠি নেই। ওরা হাঁটছে। পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে ভেজা বালি। কাঁকড়ার বাচ্চাগুলো দাগ কেটে চলে যাচ্ছে জলের দিকে। ওরাও জেনে গেছে নিজস্ব ঠিকানা। ফণা তোলা ঢেউ আছড়ে পড়ে বালির বুকে। বালি বুঝি অবুঝ নারী। এই অসীম প্রকৃতিতে সম্পর্কের শেষ নেই। জবা খালি পায়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে যায় অনেকে দূর। একা একটা মেয়ে হাঁটছে—এটাই যেন দেখার জিনিস। সমুদ্র পাপ করে না কিন্তু মানুষ করে। তাজা রোদে ছুটে আসে তিন জন যুবক। ওরা সবাই জবার মুখ চেনা। তাদের মধ্যে রিকশাওলা কালুও আছে। কালুর বাঁ-পাশের ছেলেটি বলল, হাসপাতাল থেকে কবে এলে? তুমি চলে যাওয়ার পর পুরো দীঘা শুনশান।

কালু দাঁত বের করে হাসে।

তখনই মাছখটী থেকে সাইকেল চালিয়ে বালিয়াড়ির পথ পেরোয় নকুল আর সুদাম। এরা দুর থেকে দেখতে পেয়েছে জবাকে। নকুল বলল, তাড়াতাড়ি চল। ঐ দেখ জবা।

সুদাম গা করল না। মেয়েদের উপর তার আগ্রহ কমে গেছে। ফুড়কুনীই তার জীবনের প্রথম এবং শেষ মেয়ে।

নকুলের পেছন পেছন সাইকেলের প্যাডেল ঘোরায় সুদাম। হাওয়ার বিপক্ষে যেতে গেলে ঘাম ঝরে পড়ে।

কালুর বন্ধু জোর করে হাত ধরেছে জবার। জবা দুমড়ে মুচড়ে চেষ্টা করেছে ছাড়িয়ে নেবার। ঘাম ফুটে ওঠে মুখে। সে পারছে না। হেরে যাচ্ছে আবার। কালু এসে কামুক হাতে থুঁতনী ছুঁয়ে দেয় জবার, তোর কপালে সরকারী বর জুটবে না। তুই হোটেলয়ালী। আমি রিকশা চালাই। তোর সাথে আমার ফারাক কোথায়?

দিনের বেলায় কালুর মুখ দিয়ে চোলাইয়ের গন্ধ বেরয়। জবার দু'চোখে ঢুকে গেল নোনা হাওয়া। বিন্দু বিন্দু জলকণায় জোয়ার আসে চোখের কোনায়। জবা বিপদে পড়ে কাঁদছে। এই নির্জন বালুতটে, কেয়া ঝোপের আড়ালে কেউ তাকে বাঁচাতেও আসবে না। কেন মরতে সে এখানে এল? তার এত সাহস না দেখানোই ভাল ছিল। কালু সজোরে তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল বালুচড়ায়। বিশ্রী হাসতে হাসতে বলল, আমি তোর কাছে হারব না। অপমানের বদলা সুদে-আসলে পুষিয়ে নেব। চল, কেয়াগাছটার পেছনে চল। কালু জবার হাত ধরে টানল।

তখনই সাইকেলটা বালিয়াড়িতে শুইয়ে দিয়ে ছুটে গেল নকুল। অবশেষে শুরু হল ধস্তাধস্তি। নকুলকে কাবু করে ফেলেছিল ওরা। সুদামের মাথায় উঠে গেল রক্ত। সে চোখের পলকে পাকা বাঁশের লাঠিটা খুলে নিল কেরিয়ার থেকে। লাঠি মাথার উপর তুলে ছুটে গেল সুদাম।

পরপর তিনটে বাড়ি কালুর মাথায়, কালু বালি আঁকড়ে কঁকিয়ে উঠল যন্ত্রণায়। তার মাথা চুঁয়ান রক্ত স্পর্শ নিল বালির। কালুর বন্ধুরা তেড়ে এল সুদামের দিকে। এবার আর লাঠি নয়, পা দিয়ে বালি ছুঁড়ে দিল সুদাম। মোটা দানার বালি ঘোলাটে চোখে জলের উৎস ধারার কারণ হল। সুদাম তাদেরও পেটাল মনের সুখে, ঘরে তোদের মা-বোন নেই বুঝি?

সবাই যদি মা-বোন হবে বউ হবে কে?

সুদাম তার পেটে সজোরে একটা লাথি কষিয়ে দিল, মেয়েমানুষের হাত ধরে টানা কত বড় অপরাধ জানিস?

জানি, সব জানি। যার তার হাত ধরে টানি নি। একটা হোটেলয়ালীর কি সম্মান? ওরা তো—? কথা থামিয়ে দিল কালো ছেলেটা, গোঙানী থামিয়ে বলল, তোমার যদি এত সখ হিরো হবার, তাহলে ওর হাত ধরো। সাগরমাতাকে সাক্ষী রেখে ওকে বিয়ে কর। আমরা আর কোনদিন ওর মুখের দিকে তাকাব না। পারবে তুমি? তোমার কি সেই হিম্মোৎ আছে? জানি পারবে না। ফুট শালা।

আবার বুনো রাগে ছুটে গেল সুদাম। ছেলেটার চুলের মুঠি ধরে ঠুসে দিল বালিতে। বার চারেক মাথাটা ওঠা-নাম করিয়ে সে দম নিল। তারপর এগিয়ে গেল জবার দিকে। শক্ত করে চেপে ধরল সে জবার হাত। জবা কাঁদছে। ঢেউ ভাঙছে সমুদ্র। খুশিতে নাচছে ঝাউবন। রোদ এসে ডিগবাজি খায় বালিচড়ায়। কেরিপাখি উড়ে যায় নীল সমুদ্রে। ছোট ডিঙায় গান ধরেছে মাঝি। ডিঙাটা দুলছে। কাঁপছে। মনে হয় এই বুঝি ডুবে যাবে। এই বুঝি ভাসিয়ে নিয়ে যাবে ঢেউ ডিঙা। কোথায় যাবে? ডিঙা ভাসতে ভাসতে চলে যাবে কোথায়, কোনদিকে? সুদাম জানে না। তার চোখের কোন নোনা হাওয়ায় পেছল হয়ে ওঠে। বুকে আবার ফিরে আসে সেই টিসটিসানী শব্দ। শব্দটা ফুড়কুনী না জবার, না সমুদ্রের সে বুঝতে পারে না। শুধু ঘামতে থাকে দুটি হাত।

নকুল গায়ের বালি ঝেড়ে নিয়ে এগিয়ে এল সামনে। কালু আর তার নেশাখোর বন্ধুরা খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে যাচ্ছে ঝাউবনের দিকে। নকুলের ঠোঁট পিছলে এত

কষ্টের মধ্যেও বেরিয়ে আসে হাসি। সে সুদামের পিঠটা চাপড়ে দিল জোর করে। সুদাম বলল, আমি আর একবার জীবন নিয়ে বাজি ধরলাম। জানি না হারব না জিতব। যদি হারি তবু আমার দুঃখ নেই। দুঃখ পাওয়া আর হজম করা আমার নিত্য দিনের ঘটনা।

জবা হাত ছেড়ে দিয়ে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে বালুচড়ায়। পায়ের বুড়োর আঙুলে বালি ছুঁড়ছে সে আনমনে। এ ঘটনা তার জীবনে জলের দাগ নয়, কলার কষ। ছোট ডিঙা নিয়ে মাঝ দরিয়ায় এগিয়ে যাচ্ছে মাঝি। মাঝি জানে না সে পাড় পাবে কিনা! তবু সে ঢেউয়ের মাথায় ভাসতে থাকা জোনাকি পোকার মত এগোয়। এগোতে থাকে। এগিয়ে যাওয়ার অন্য নাম বুঝি জীবন।

সুদাম তাকে বলল, আমার সব কিছু তোমার জানা নেই। তোমার সব কিছু আমার জানা নেই। তবু আমরা দু'জনে হাত ধরলাম। হাত ধরা মানে ডিঙা বানানো। জীবন একটা সেতু চায়। সেই সেতুর নাম হল বিয়ে। তুমি রাজি আছো?

ঠোঁট থরথরিয়ে কেঁপে উঠল। ঢেউ ওঠা শরীরে তার এখন খুশির জোয়ার। নকুল বলল, জবা বোন, জীবন ছোট নয়, অনেক বড়। জীবনকে সম্মান করো। কখনও একে অন্যকে ঠকিও না। মনে রেখো তুমি সমুদ্রকন্যা।

॥ আঠার ॥

সমুদ্র কন্যার জলের শরীর, তার দু-চোখে জোনাকি গোঁজা। সে কাঁদে না, জীবনভর হাসে। সে ঢেউ তোলে অনন্ত নীল দরিয়ায়। এ কথা গর্ব ভরে বলেছিল মাছখটীর জহর মহাজন। পাত্রীর নাম আর বিশদ পরিচয় শুনে সে কিছু বলল না, দায়িত্ব এড়িয়ে গেল সে। ভাল লাগল না নকুলের, যেহেতু সে আবেগে ভাসতে ভালবাসে। জহর মহাজন মাটি ভালবাসলেও জল তার কাছে কম প্রিয় নয়। এই নোনা হাওয়ার সব মানুষ তার চেনা। কে কোন্ পথ দিয়ে হাঁটে তা-ও জানা। জবার বয়স কত হবে, সে তো তার চোখের সামনে বড় হল। দশরথ আগে মাছ কুড়াতো সমুদ্রের ধারে। ঝিনুক কুড়িয়ে বেচত। তখন তার বিয়ে সাদী হয়নি, সে একেবারে ঝাড়া হাত- পা। সে সময় দীঘার একটা মেয়েকে সে বিপথে নিয়ে গেল, পরে পেট খালাস করে নিস্তার পেল। এই যার চরিত্র, তাকে সে বিশ্বাস করবে কিভাবে। গাছ খারাপ হলে ফল খারাপ হতে বাধ্য। তার দুই মেয়ে দুই মেরুর বাসিন্দা। তারা একে অন্যকে সহ্য করতে পারে না। মেয়েদের মনে হিংসা থাকলে তা কাঁটাবনের চেয়েও মারাত্মক। জবা নিজেকে বিজ্ঞাপিত করেছিল পুরুষ ধরার জন্য। এটা তার কাছে ছিল শক্ত পরীক্ষা। ভাগ্যের জোরে সে উতরে গেল। সুদামকে প্রথম দিন দেখার পরে তার মনে শুরু হয়েছিল ভূকম্প। মনের কথা মনেই থেকেছে, সে মুখ ফুটিয়ে কারোর কাছে বলতে পারল না। কার কাছে সে যাবে, কাকে বলবে অন্তরের কথা। টগর থেকেও না থাকার মত। দারুয়া হাসপাতালে তার সিজার করে ছেলে হয়েছে। সেই ছেলের বয়স এখন আট মাস। বিষ্ণু ছেলের মুখ দেখে টগরকে

গড়িয়ে দিয়েছে কানপাশা। টগর সেটা পরেই বাপের ঘর এল ঘনঘন। জবাকে কানপাশা দেখিয়ে বলেছিল, সোনার হারও আমি গড়াতে দিয়েছি, যা সুন্দর ডিজাইন না—তোর তাক লেগে যাবে!

জবার সময় হয়েছে বদলা নেবার। কাঁটা দিয়ে কাঁটা না তুললে যন্ত্রণা বোঝা যাবে না। হোটেলে ভাত খেয়ে সুদাম সেদিন চলে গেল। জবা চাইছিল সুদাম থাকুক। রাতে সে তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেবে। তার ঐ রোগা প্যাংলা শরীরে যে বজ্র লুকানো তা সেদিন টের পেয়ে গেল জবা। সেই থেকে ভয়টা মনের ভেতর দলা পাকায়। অমন রাগী মানুষ সে কি এর আগে দেখেছে? জবা নিজেকে প্রশ্ন করল কিন্তু উত্তর পেল না। সুদাম রোগা শরীরে ভেলকি দেখাল। ভয়ে পালিয়ে গেল কালু ও তার দলবল। ঠিক সময়মত সুদাম না এলে বিপদ ঘটত জবার। সেদিনের সেই ঘটনার কথা তার মনে পড়ে আজও। মনে পড়লেই তার গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে। মানুষটা সাহস পুরে রাখে বুকের ভেতর। ওর সাথে আগডুম-বাগডুম খেলা চলবে না। যে পুরুষ বিয়ের রাতে বৌকে ভয় দেখাবার জন্য বিড়াল মারে, তার বীরত্বের সাথে সুদামের সাহসিকতার তুলনা চলে না। জবা মনে মনে গর্ববোধ করে সুদামের জন্য। নকুল এককাঠি উপরে, সে জবাকে মন্ত্র পড়ানোর মত বলে, তোমার ভাগ্য ভাল বোন যে অমন স্বামী পেলে! নিশ্চয়ই শিবের মাথায় ঘড়া ঘড়া জল ঢেলেছিলে।

জবার হাসিটা বড় চমৎকার। ঝকঝকে দাঁতের লাল মাড়ি ছুঁয়ে হাসিটা ঠোঁট পিছলে বেরিয়ে আসে। ঠোঁটের হাসি ওর চোখে কী ভাবে যেন মিশে যায়। তখন তাকে আরো সুন্দরী দেখায়।

সুদাম এখনও জবার চোখে চোখ ফেলে তাকায় নি। চেষ্টা যে করেনি তা নয়। যতবার দেখতে গেছে ততবারই ফুড়কুনী হেসে উঠেছে জবার চোখে। একথা কাউকে সে বলেনি। গোপন দুঃখ লুকিয়ে রাখলেই জ্যোৎস্নার আলো ছড়ায়। মানুষ গোরুর মত স্মৃতির জাবর কাটতে ভালবাসে।

দীঘা ছাড়ার আগে সুদাম বলেছিল, কাল আসব। কাল আমাদের বিয়ে হবে। চন্দনেশ্বরের বুড়ো শিবের কাছে আমার মানত আছে। আগে মানত শোধ করব তারপর তোমাকে বিয়ে করব শিবমন্দিরে। আমার লোক খাওয়ানোর সামর্থ নেই। তবে দু-চারজন কাছের মানুষ যদি আসে আমি তাদের সম্মান রাখার চেষ্টা করব।

সুদামের কথায় রোমাঞ্চিত হয় জবা। খুশীতে তার মুখ দিয়ে কোন ভাষা বেরয় না। শুধু হৃদয় দোলে বাতাস লাগা ঝাউডগার মত।

দশরথকে সব বুঝিয়ে বলল নকুল। সে সব শুনে বলল, তোমরা যা ভাল বুঝো করো। আমার বয়স হয়েছে। আমি তোমাদের সঙ্গে চন্দনেশ্বর যেতে পারব না। তাছাড়া আমি গেলে হোটেল চালাবে কে? দশরথের চোখে অহেতুক দুঃশ্চিন্তা ধরা পড়ল। জবার বিয়ে হয়ে যাওয়ার অর্থ সে একা হয়ে গেল। ছেলেরা কেউ হোটেলের দিকে আসবে না। সে সুদামের হাতে দিতে চাইল তার জমানো নগদ কিছু টাকা আর সোনাদানা। সবিনয়ে ফিরিয়ে দিল সুদাম। বিনীতভাবে বলল, আমি গরীব তাই আমার টাকার কোন লোভ নেই। যদি মন চায় তাহলে জবার হাতে দিতে পারেন। আমি শত অভাবেও সে টাকা ছুঁয়ে দেখব না। ভগবান আমাকে যা দিয়েছে—তাতেই আমি ভীষণ খুশী।

নকুলের সাথে মেনকা এসেছে গ্রাম থেকে। সঙ্গে তাদের শিশু সন্তান। যোগমায়া আসত কিন্তু ভরত তাকে আসতে দিল না। সে কিছুটা বিচলিত স্বরে বলল, ছেলের বিয়েতে মা যে সঙ্গে যায় এমনটা আমি জীবনেও দেখিনি। তুমি ঘরে থাকবে। আমিও যাব না। আমরা দু-জনে মিলে ঘরের কাজগুলো সেরে রাখব। নকুল যাচ্ছে। সে একাই একশো। মেনকার কথা তো ছেড়েই দিলাম।

শুক্রবারে বিয়ের তারিখ আছে। ভরত গিয়ে কায়দা করে জেনে এসেছে জীবন মাষ্টারের দোকান থেকে। অবসর সময়ে পঞ্জিকা পড়া জীবন মাষ্টারের অভ্যাস।

ভোরের বাস ধরে ওরা পৌঁছে গেল দীঘায়। আজ এই শুভ দিনে তাদের মাছ বিক্রি বন্ধ। জহর মহাজন আগে থেকে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে রেখেছিল। সুদাম আর জবাকে আগাম আশীর্বাদ করে সে বলল, সুখী হও। চিরদিন চেষ্টা করো 'জোড়' যেন ঠিক থাকে। মনে রেখো সংসারে ঝড় ওঠে। সংসার এই সমুদ্রের মত। সাঁতরে না পেরতে পারলে ছোট একটা ডিঙা নিও। অনেক সময় জাহাজ যা পারে না ডিঙা তাই করে দেয়।

সুদাম পা ছুঁয়ে প্রনাম করল জহর মহাজনের। তার দেখাদেখি জবাও মাথা ঝুঁকাল। খুশি হল জহর মহাজন। নিখাদ হেসে বলল, আজ চন্দনেশ্বরে তোমরা সবাই ট্যাক্সি করে যাবে। আমি ভাড়ার ট্যাক্সি বলে রেখেছি। ট্যাক্সিভাড়া তোমাদের দিতে হবে না, ওটা আমার খরচ।

চন্দনেশ্বরের শিব ভীষণ জাগ্রত। জবা জানত, সুদামও বিশ্বাস করে এ কথা। পুরুতমশাই বিয়ে করিয়ে দিতে অনেক টাকা নেবেন। নকুল সুদামকে আড়ালে ডেকে বলেছে, টাকার জন্য চিন্তার করিস না, আজ আমি তৈরী হয়েই এসেছি।

পুকুরে হাত-মুখ ধুয়ে আসার পরেই মন্ত্র পড়ালেন পুরুতঠাকুর। সিঁদুরদানের পরে জবা হাউহাউ করে কেঁদে উঠল তার মায়ের জন্য। মেনকা তাকে বোঝাল, মা কি চিরদিন থাকে বোকা। মানুষের জীবন হল পদ্মপাতার জল। কবে ঝরে যাবে কেউ জানে না।

বিকেলের একটু আগেই ওরা ফিরে এল দীঘায়। মানুষের ভিড়ে গমগম করছিল দীঘার সমুদ্রতট। এ সময় পশ্চিম দিগন্তে রঙের বাহারী খেলা চলে। জবা দেখল তার সিঁথির গুঁড়ো সিঁদুর যেন গুলে যাচ্ছে সমুদ্রের জলে। সেই দিকে বিস্ময়ভরা চোখ মেলে তাকিয়েছিল সুদাম। জীবনের এই পট পরিবর্তন অপ্রত্যাশিত ছিল তার কাছে। মানুষের ভাগ্য সেই ছোট্র ঢেউ ডিঙার মতো কোথায় ভাসতে ভাসতে চলে যায় আগাম বুঝি কেউ জানে না। ক'মাস আগেও জবা তার কাছে ছিল অপরিচিতা, আজ জবা বুকের কাছে, হৃদয়ের মাঝখানে এসেছে, তাকে কিছুতেই আর ঠেলে দেওয়া যাবে না, সে এখন তার জীবনমরণের সঙ্গী।

ধীরে ধীরে গোল সূর্যটা ডুবে গেল সমুদ্রের জলে, পশ্চিমের রক্তিম আলো মুছে গিয়ে দখল নিল তরল আঁধার। ঢেউ ভরা সমুদ্রের বুক থেকে উঠে আসছিল ঠাণ্ডা হাওয়া। বড় বড় হোটেলগুলোয় জ্বলে উঠেছে আলো। দোকানগুলো সেজে উঠেছে খদ্দেরের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। ফেরিওলাদের হাঁকডাকে মনে হচ্ছে যেন মেলা বসেছে দীঘা চত্বরে। জবার ভাল লাগছিল দেখতে। স্বপ্ন ধরা পড়ছিল দু'চোখে। সে আর হারবে না এমন

সুদৃঢ় জেদ উঠে আসল রক্তের ভেতর থেকে। সুদামকে তার ভাল লেগেছে। ওকে ভাল লাগার অনেক কারণ আছে। প্রথম কারণ সুদাম নিজেকে রহস্যময় করে তোলে সবসময়। তার বাড়িয়ে বলার স্বভাব নেই। সে যেন নিজের ক্ষুদ্র সামর্থের মধ্যে হারিয়ে যেতে ভালবাসে। তার শান্ত স্নিগ্ধ এই চেহারাটি জবার মনে দাগ কেটেছে।

সুদাম এগিয়ে এল নকুলের কাছে। নকুল বলল, আজ আর বাড়ি যাব না। আজ বাড়ি যেতে নেই। আজ আমরা জবাদের বাড়িতে থাকব। বারবার করে তোর শ্বশুর-মশাই আমাদের বলেছে থাকার জন্য।

সুদাম এবিষয়ে কোন মন্তব্য করল না।

নকুল বলল, কাল সকালেই আমরা ফিরব। ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিই। যদিও মহাজন বলেছে ঘর পর্যন্ত নিয়ে যেতে, সেটা ভাল দেখায় না। আসল কাজটা যখন হয়ে গিয়েছে তখন আর অন্যকে কষ্ট দিয়ে কি লাভ?

সুদাম বলল, সেটাই ভাল।

সন্ধের আগে সারণি জাল টেনে জেলেরা বালুভূমিতে দম নিচ্ছিল। ওদের ভেজা কাপড় চুঁইয়ে গড়িয়ে নামছিল নোনাজল। আজ একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে। বড় জালে ধরা পড়েছে হাঙ্গর মাছ। পনের জন জেলে হাঙ্গরটাকে টেনে তুলতে পারছে না ডাঙায়। হাঙ্গরটা ক্ষত-বিক্ষত চেহারায় আটকে গেছে জালে। জাল ছিঁড়ে সে বেরতে পারেনি। তাকে বহু চেষ্টায় ডাঙ্গায় তুলল জনা বিশেক জেলে। মাছের বদলে এই ফ্যাসাদ ভাবিয়ে তুলেছে তাদের। এত বড় হাঙ্গর এ এলাকায় কেউ আশা করে না। মাঝে মধ্যে ভুঁড়ি মগর, চিলা মগর কিংবা উঁরা মগর দূরের সমুদ্রে কেউ কেউ দেখলেও দেখতে পারে। দলছুট এই অতি দানবীয় মগরমাছ সমুদ্র ধারের দর্শনার্থীদের আগ্রহ বাড়িয়ে তোলে। ভিড় জমে যায় সেই মগরমাছ দেখার জন্য। মগরমাছের উপকারিতা, অপকারিতা নিয়ে নিবিড় আলোচনায় মেতে ওঠে সমুদ্রপাড়। নকুল যতটা শুনেছে সেই শোনা-কথার উপর নির্ভর করে সে বলল, মগর মাছের তেল বাত-বেদনায় ভাল কাজ দেয়। এ মাছ গরীব মানুষরা খায়। স্বাদ ট্যাংরা বা বোয়াল মাছের মতন।

নকুলের পাশে ভেজা শরীর নিয়ে দাঁড়িয়েছিল বুড়ো মতন এক জেলে, সে এই আলোচনায় মাথা গলাল, বুড়া মগরের আসল উপকার হল ওর তেলে। ওর তেল দিয়ে কবিরাজী ওষুধ হয়। বারো বছর আগে এই পুরনো দীঘায় একটা বুড়া ভুঁড়ি মগর জড়িয়ে গিয়েছিল জালে। তাকে যখন ডাঙায় টেনে তোলা হল, দেখে সবার চক্ষু চড়কগাছ। এ তো মাছ নয় যেন ডাঙার হাতি। বালিচড়ায় দিন পনের পড়ে রইল সেই ভুঁড়ি মগর। পচে-গলে দুর্গন্ধ ছড়াল চতুর্দিকে। এত বড় মাছ সৎকার করার উপায় নেই। শেষে ট্রাকের পেছনে বেঁধে টেনে নিয়ে যাওয়া হল শহর থেকে দু'মাইল দূরে। তবু দুর্গন্ধ গেল না। মগর মাছের পচা-গলা দেহ থেকে ক্রমাগত চুঁইয়ে নামছে তেল, বালিতে পথ করে নিল সেই তেলের ধারা। আশে পাশের গাঁ ভেঙে লোক ছুটে এল শিশি-বোতল হাতে সেই মহামূল্যবান মগর মাছের তেল নিতে। এতে কি উপকার হয় জান বাবা? কারোর যদি কমজোরী থাকে তাহলে মগর-তেলের মালিশ করলে সে ধীরে ধীরে পুরুষত্ব ফিরে পায়।

সেই বিকট দর্শন মগরমাছ দেখে সুদামরা উঠে এল পাড়ে। মেনকার জায়গাটা খুব মনে ধরেছিল, তার আর একটু থাকার ইচ্ছে ছিল কিন্তু নকুলের ব্যস্ততায় তা আর সম্ভব হয়ে উঠল না। জবা মেনকার কাছাকাছি হাঁটছিল। মেনকার মন খারাপ দেখে সে বলল, আবার আমরা আসব। সমুদ্র কি একদিনের দেখার জিনিস? যত তুমি দেখবে ততই নেশা ধরে যাবে চোখে। এই আমার কথা ধরো না—আমি ছোট থেকে আছি এখানে, রোজই সমুদ্র দেখি তবু এত দেখেও আমার দেখার নেশাটা ফুরোল না।

টগর এসেছে দারুয়া থেকে, সঙ্গে এসেছে বিষ্ণু। দিদির সিঁথিতে সিঁদুর দেখে সে খুশিতে জড়িয়ে ধরল জবাকে, আজ আমি দায়মুক্ত হলাম। তোকে দেখতে এসে বিষ্ণু আমাকে পছন্দ করল, এটা আমার ভাল লাগেনি। ঠিক এই জন্যই আমি পুরুষজাতটাকে সহ্য করতে পারি না। ওরা এক ফুল থেকে আরেক ফুলে উড়ে বেড়ায়। যারা রূপ খুঁজে মরে তারা নিজেরাও জানে না রূপের ফাঁদ কত নির্মম ফাঁস। গলায় যেদিন ফাঁস লাগবে—সেদিন শিক্ষা হবে।

টগরের মনের কথা জানতে পেরে জবার বুকের পাথর সরে গেল। সে বোনের হাত ধরে বলল, তোর বিয়ে হয়েছে ভাল ঘরে এতে আমিও খুশি। কিন্তু বিষ্ণু যেভাবে আমাকে উপেক্ষা করল তাতে আমার চোট লেগেছে। আমি তো একটা মেয়ে। আমারও মন আছে, কষ্ট আছে।

ওসব কথা ভুলে যা দিদি। আজ তোর সুখের দিন। টগর হাসি মুখ করে বলল, সুখের দিনে দুঃখের কথা বলতে নেই। সুদামদা তোকে সুখে রাখবে এটা আমার ধারণা। কথা বলে যা বুঝেছি—ওর মতন ভাল মানুষ আর হয় না। আমি তোর চেয়ে বয়সে ছোট কিন্তু সংসার জীবনে বড়। তোকে একটা কথা বলি দিদি, চেষ্টা করিস—সুদামদাকে সুখে রাখার। মনে রাখিস—মাথা ঠিক থাকলে শরীর ঠিক থাকে সব সময়।

অনেক রাতে চাঁদ উঠল আকাশে, সমুদ্র ভাসিয়ে দিল ঠান্ডা হাওয়া। ফুলের মিষ্টি গন্ধ নাকে এসে লাগল সুদামের। তার ঘুম আসছিল না বলে সে বারান্দায় এসে বসেছে। এক দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আছে জ্যোৎস্নার নরম আলোর দিকে। জবা ইতস্তত পায়ে এগিয়ে এল তার কাছে। গা-ঘেঁষে বসে সে বলল, কাল কখন যাবে? জান আমার খুব ভয় লাগছে। কোনদিন সংসার করিনি, সংসারের কোন কিছুই আমি বুঝি না।

সুদাম ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল, ডান হাতটা আলতো ভাবে বিছিয়ে দিল জবার ঘাড়ে। সুষনি পাতার মত কেঁপে উঠল জবা। সে শুধু একবার চোখ তুলে তাকাল। তারপর চোখ নামিয়ে নিল ধীরে ধীরে। সুদাম জবাকে টেনে আনল নিজের কাছে, বুকের তাপ দিয়ে বলল, আমি তোমার কাছে ভালবাসা ছাড়া আর কিছুই চাই না। সংসারে অভাব আছে, থাকবেও। তবে দেখো কোনদিনও যেন ভালবাসার অভাব না হয়।

জবার হাত সুদামের বুকে খেলা করে। সমুদ্রের ঢেউ এসে জড়ো হয় তার শরীরে। একসময় জবা হয়ে যায় সমুদ্র। ঢেউ ডিঙা হয়ে সেখানে সাঁতার কাটে সুদাম। জ্যোৎস্না লুটিয়ে পড়ে নির্জন বারান্দায়।

ফেরার সময় ফাঁকা বাসে সিট পেয়ে গেল ওরা। তৃপ্ত জবা সুদামের সঙ্গ ছাড়ে না

কিছুতেই। পাশাপাশি সিটে বসে জবা বাইরের দিকে তাকাল, সবুজের ঢল নেমেছে প্রকৃতিতে, উজ্জ্বল রোদ্দুর সাঁতরে বাস গিয়ে থামে বাজারে। একে একে নেমে আসে নকুল, মেনকা আর দশরথ। সব শেষে নামে সুদাম আর জবা। বাজারের চেনা-জানা দোকানদাররা ছুটে আসে। ছুটে আসে ভরত আর ঝুমা। ওদের ঘিরে ভিড় বাড়ে। মুখ ঈষৎ ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল জবা। সত্যিই তার ভয় লাগছে। ঝুমা ছুটে গিয়ে সরিয়ে দিল তার ঘোমটা। তারপর আনন্দে খুশিতে উথলে উঠে বলল, এ যে দেখছি—দীঘার সমুদ্র উঠে এসেছে আমাদের গ্রামে!

লজ্জায় রাঙা হয়ে গেল জবার মুখমন্ডল। সুদামের বিয়ের সংবাদটা আগেই শুনেছিল জীবনমাষ্টার। মেসিন ছেড়ে সেও এল রাস্তায়। তাকে দেখে এগিয়ে গেল সুদাম। জবাও তার পেছন পেছন গেল। সুদাম পায়ে হাত দিয়ে প্রনাম করতেই জবাও পায়ের ধুলো নিল জীবন-মাষ্টারের। মাথায় হাত রেখে জীবন-মাষ্টার আশীর্বাদ করে বলল, সুখী হও মা। ফলে-ফুলে ভরে উঠুক তোমার সংসার।

ফুড়কুনী দাঁড়িয়ে ছিল বারান্দায়। সকালে স্নান সেরে চুল শুকাচ্ছিল সে। সুদামের বিয়ের সংবাদে তার সমস্ত শরীর বুঝিবা ঝাঁকুনি খেল হঠাৎ। মনে হল সব হারিয়ে গেছে তার। হাতে চিরুনী নিয়ে সে দৌড়ে এল মাঠে। সুদামের জীবনসঙ্গীকে সে দেখতে চায়। কিন্তু মাঝমাঠে এসে থেমে গেল তার পা। জলভরা চোখে সে দেখল সুদাম নতুন বউয়ের হাত ধরে হেঁটে যাচ্ছে মোরামভরা পথের উপর। ফুড়কুনী দাঁড়িয়ে থাকল শূন্য চোখে চেনা ঘাসের উপর।

॥ উনিশ ॥

কার ভাগ্য কোন দিকে যায় কেউ জানে না।

নল পোঁতা শুরু হয়ে গেছে গ্রামে গ্রামে। ধান গাছে এখন থোড় আসার সময়। নকুল পয়সার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছিল। জহর মহাজন তাকে বুঝিয়ে বলল, হায় টাকা, হায় টাকা করলে জীবন চলে না। ব্যবসায় আপ-ডাউন আছে। লাভ-ক্ষতি দুটোকেই মানিয়ে নিতে হয়।

নকুল মানিয়ে নিতে চায় কিন্তু মেনকা রাজী নয়। সে জেদ ধরে বলল, সংসারের খরচ বেড়েছে। এখন শুধু মাছের কারবার করলে চলবে না। সঙ্গে আরও কিছু করো।

কি করবে নকুল, আর কিছু বিদ্যা তার জানা নেই। ফলে সে হতাশ এবং কিছুটা অসহায়। মেনকা কোন কথা শুনবে না। সে সুখ চায় মুঠো মুঠো। তার মাথায় লোভ-লালসার পোকাটা নড়ে উঠল। অনেক ভেবে সে বলল, নোনা মাছের কারবার করে শুধু নুন-ভাতের যোগাড় হয়। ডাল-ভাত না হলে আমার চলবে না। আমি সংসার ঠেলতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছি। আমি আর পারছি না। তাছাড়া পেটেও একজন বাড়ছে। তার কথাও ভাবতে হবে তোমাকে।

গালে হাত দিয়ে নকুল বসেছিল চায়ের দোকানে। আজকাল দীঘায় গিয়েও সে মন মত মাছ পাচ্ছে না। দামী মাছগুলো উঁচু দাম দিয়ে কিনে নিয়ে যায় অন্য লোকে। সেখানেও প্রতিযোগিতা। সে পেরে উঠছে না। মাছের মহাজনরা ধার-বাকি কমিয়ে দিয়েছে। তাদেরও টাকা মার যায়, সবাই সমান নয়। জহর মহাজন পম্‌প্লেট মাছের ঝুড়িটা দিয়েছিল কাঁথির ব্যাপারীকে। ঘটনাটা চোখের সামনে ঘটল। হাতে টাকা থাকলে মাছগুলো নিতে পারত সে। না পারার জন্য আফশোস হয়। দিন চলে যায় লাভ-ক্ষতির মধ্যে দিয়ে। সাইকেল চালিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছে নকুল। রোজ কত আর সাইকেল চালান যায়? রাতে পায়ের গুলি দুটো ব্যথায় টনটন করে। মেনকা মালিশ তেল ঘষে দেয় তবু ব্যথা কমে না। এক কাপ চা খেয়ে নকুল ভাবল টাকার জন্য সে গোবিন্দর কাছে যাবে। গোবিন্দ ছাড়া এ গ্রামে কেউ তাকে টাকা দেবে না। সবাই মুখে বড় বড় কথা বলে। কাজের বেলায় সবাই সরে পড়ে।

চা-দোকানে পয়সা মিটিয়ে বাইরে এল নকুল। সুদামকে সে খুঁজছিল। কিন্তু খবর নিয়ে জানল সে দীঘায় চলে গেছে ভোরবেলায়। তারও হাজার চিন্তা। বিয়ের পর থেকে সে একদিনেরও জন্য সুখ পেল না। জবা সব সময় অশান্তি করে, মাটির ঘরে তার মন বসে না। জল কাদা তার পছন্দ নয়। পছন্দ নয় মীরাকে। সুদাম স্পষ্ট মুখের উপর বলে দিল, মীরা আমার বোন। ওকে তুমি মানিয়ে নাও। পাগল বলে ওকে তো আমরা ফেলে দিতে পারি না।

প্রতিনিয়ত মীরার সাথে খিটিমিটি লেগে থাকে জবার। মীরা তার কোন জিনিস ছুঁলেই মুখ লাল হয়ে যায়। সুদাম ঘরে আসার সঙ্গে সঙ্গে নালিশ করে, আর পারি না, তুমি আমাকে দীঘায় রেখে আসবে চলো। অমন পাগলীকে নিয়ে আমি ঘর করতে পারব না। বিয়ের আগে কেন বললে না তোমার পাগল বোন আছে? তুমি আমাকে ঠকিয়েছ।

সুদামের মুখের ভাষা হারিয়ে যায়। যার জন্য চুরি করা সেই বলে মহাচোর। সব জেনে শুনে জবার এই পাগলামী সহ্য করা কঠিন সুদামের পক্ষে। তার মুখ শুকিয়ে গিয়েছে চিন্তায়। সাইকেল চালিয়ে তারও রুগ্ন হয়েছে হাত-পা। এসব দিকে খেয়াল নেই জবার। সে রানীর মত সেজেগুজে থাকে ঘরে। যোগমায়া রান্নার কাজটা সামাল দেয়। ঘরবার সব যোগমায়াকেই দেখতে হয়। ছেলের বউ কুটোটি ভেঙে দুটো করে না। সে যেন দীঘার সমুদ্রের জলপরী। মাটির পৃথিবীতে তার পা পড়তে চায় না। নকুল একদিন এল সমস্যার সমাধানে। তার মুখের উপর জবা বলল, আমি অভাব সহ্য করতে পারি না। একটা মানুষ খাটবে আর গোটা সংসার বসে খাবে তা হয় না। আমরা আলদা হয়ে যাব। ওকে তুমি বুঝিয়ে বলো নকুলদা।

নকুলের কান লাল হয়ে ওঠে কথা শুনে। সে জবাকে বোঝায়। কিন্তু বুঝবার মেয়ে নয় জবা। যোগমায়া আক্ষেপের সুরে বলে, বৌমা যা চায় তাই হোক। আমরা বুড়ো-বুড়ি মেয়েটাকে নিয়ে আলাদা হয়ে যাই। বৌমা যখন চায় না তখন গায়ে গা লাগিয়ে থাকা অন্যায়।

কথার শেষ নেই, কথায় কথা বাড়ে।

সুদামের কানে গিয়েছে সব। সে স্পষ্ট ভাষায় জবাকে বলে দেয়, তোমাকে বিয়ে

করেছি বলে আমি তোমার হাতের পুতুল নই। তোমার জন্য আমি বাবা-মাকে বিসর্জন দিতে পারব না। জান, ওরা কত কষ্ট করে আমাকে মানুষ করেছে।

সে তো নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছি। জবার গলায় ভেসে ওঠে ঠাট্টা।

নকুল হাঁটতে হাঁটতে ভাবল—কী করে বদলে যায় মানুষের চরিত্র। চারদিক থেকে অশান্তির মেঘ কেন উড়ে আসে? সে এখন সুদামের মুখের দিকে তাকাতে পারে না। যে ছেলেটা ঘর থেকে বেরত না, সে এখন ঘরের বাইরে কাটায় বারো ঘন্টা। এত খেটেও তার কোন সুনাম নেই। শান্তিও হারিয়ে গেছে মন থেকে। জবা কি চায় সুদামের কাছে? আলাদা হাঁড়ি হলে কি সে সুখী হবে? এক ঘরে দুটো হাঁড়ি বেমানান। তিতি-বিরক্তি সুদাম মাথার চুল ছেঁড়ে, সে কি করবে বুঝে উঠতে পারে না। জবা প্রায়ই বলে, তোমাদের বাড়ির উঠোনে প্যাচেপ্যাচে কাদা। আমি হাঁটব কোথায়? দীঘায় কাদার চিহ্ন নেই। ওখানে বালি শুষে নেয় বর্ষার জল।

শুধু বালি নয়, মানুষও শোষণ করে বালির মত। পিছনের ফেলে আসা ছবিগুলো মানুষই মুছে দিতে চায়। ভুলে যায় সম্পর্কের বাঁধন। সবাই স্বাধীন হতে চাইলে পরাধীনতার শেকলের দৈর্ঘ্য বেড়ে যায়।

নকুল দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে গোবিন্দর মুখের দিকে তাকায়। টাকার কথা বলে নীচু গলায়। গোবিন্দ হিসাব করে বলে, এত টাকা খালি হাতে দেওয়া যাবে না। সোনাদানা যা হোক কিছু বন্দক রাখো, তারপর টাকা নিয়ে যাও।

মেনকার সোনার গয়না বন্দক রেখে নকুল টাকা নিতে নারাজ। সে ফিরে আসছিল, তখন গোবিন্দ ছুটে এল, টাকা না দিতে পারিস তো অন্য কিছু দে।

কি আছে যে দেব।

দেওয়ার ইচ্ছা থাকলেই অনেক কিছু দেওয়া যায়। কপাল কুঁচকে গেল গোবিন্দর, খাদে নামাল কণ্ঠস্বর, সুদামের বোনটা আমার নজর কেড়েছে। ও পাগল, ওকেই দে।

নকুলের মাথায় যেন বিদ্যুৎ চমকায়। ঘেমে ওঠে গা, সর্বাঙ্গ। জ্বালাপোড়া করে বুকের ভেতর। ঠাস করে সে একটা চড় কষিয়ে দেয় গোবিন্দর গালে। চিৎকার করে ওঠে নকুল, জানিস, সুদামের বোন আমার কে হয়? না জানিস তো শুনে নে। ঐ পাগলীটা আমারও বোন হয়। ওর গায়ে যেদিন তুই হাত দিবি, আমি তোর হাত ভেঙে দেব।

গোবিন্দ গর্জাতে থাকে রাগে। তার চোখ বেরিয়ে আসে উত্তেজনায়। ফুঁসে ওঠে গোবিন্দ, তোকে আমি দেখে নেব।

হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখে নিস, তাতে আমার কোন আসবে যাবে না। তোর মত শয়তানের ছায়ায় দাঁড়াতে আমার ঘেন্না হয়। নকুল ফিরে আসে।

জহর মহাজনের মাছখটিতে ভিড় বেড়েছে অন্য বেপারীর। সেখানে থৈ পায় না নকুল কিংবা সুদাম। হতাশায় ছেয়ে থাকে মন, চারদিক শুধু জমাট বাঁধা অন্ধকার। মানুষ যে টাকার গোলাম অনেক পরে বুঝতে পারল নকুল। সে মেনকার গায়ে হাত তুলল সেই প্রথম। মেনকা গোবিন্দর সাথে কথা বলছিল বাজারে। গোবিন্দ তাকে তেলেভাজা কিনে দিয়েছে নিমাইয়ের মায়ের দোকান থেকে। ছ'টা চপের কি এমন দাম যার জন্য আত্মসম্মান বিকিয়ে দেবে মেনকা। পেটেরটা কি একটা শয়তান হবে? শয়তানের কিনে

দেওয়া চপ খেয়ে মেনকার ঠোঁট থেকে কি করে এত সুন্দর হাসি বেরয় ভাবতে অবাক লাগে নকুলের। মাথা ঠিক রাখতে পারে না। ঠেলা মেরে মেনকাকে গড়িয়ে দেয়, দাওয়া থেকে। মেনকা কাঁদছে। ক্ষীণ রক্ত ধারায় চমকে উঠছে বারবার। ভীতু গলায় সে কান্নার সুর ভাসায়, ওগো আমার কি হল গো, আমার যে সব গেল....!

সব যায় না, কিছু থাকে।

নকুল পরের দিনই সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে দীঘার দিকে। জহর মহাজনের মাছের আড়তে সে আর ভুল করেও যাবে না। সুদামকেও যেতে দেবে না। কেন যাবে? ওখানে ব্যবসা আছে কিন্তু সম্পর্ক নেই। পাঁচ-ছ'বছরের সম্পর্ক জহর মহাজন টাকার জন্য একদিনে উপড়ে দিল। তার তো টাকার অভাব ছিল না। তবু কেন এমন সিদ্ধান্ত নিল? তাহলে কম বেশি সবাই কি টাকার গোলাম? দপদপিয়ে উঠল নকুলের কপালের শিরাগুলো। কষ্ট হয় তবু সাইকেলের প্যাডেল ঘোরায় বনবন। মানুষ পারে না এমন কোন কাজ নেই।

নির্জন বালিয়াড়িতে ডিম পাড়তে এসেছে সমুদ্র কাছিমের দল। ডিম পেড়ে ওরা চলে যাবে। জাল পেতে রেখেছে দাড়িওলা মহাজন। সমুদ্রকাছিম ধরা নিষিদ্ধ। খবরের কাগজে তা ছাপা হচ্ছে ফলাও করে। ধরা পড়লে জেল-জরিমানা দুটোই। এ অঞ্চলের মানুষ সমুদ্র কাছিমের মাংস খায় ভাল। দামেও কম। খেতেও ভাল। একটা সমুদ্র কাছিম সে যদি পেয়ে যায় তাহলে মেহনতটা পুষিয়ে যায়। দূরের কোন হাটে বালিগড় কেটে বেচে দিলেই হল। কে যে সমুদ্র কাছিমের নাম রেখেছিল বালিগড় নকুল তা জানে না।

বেশী দূর যেতে হল না তাকে। একেবারে ঝাউবাগানে শেষ মুড়োয় সে দেখা পেয়ে গেল দাড়িওলা মহাজনের লোকটাকে। দেখা মাত্রই সাইকেল থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল নকুল। কাকুতি-মিনতি করে বলল, মাছের ব্যবসায় পড়তা নেই এখন। যদি একটা বালিগড় দিতে তাহলে লাভের টাকায় পেট চলত।

মহাজন লোকটা চোখে সন্দেহ নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল, বালিগড় আছে কিন্তু নেবে কি ভাবে? যদি ধরা পড়ো তাহলে জেলের ঘানি টানতে হবে।

আমি আর ভয় পাই না। পেট তো চালাতে হবে? চলো।

চায়ের দোকানের কাঠের বেঞ্চিতে বসে চা খেল ওরা। ওখানেই দেখা হল সুদামের সাথে। ও ঝিম ধরে বসেছিল। মাথায় কত রকমের অশান্তি। মীরা আবার ঘর ছেড়ে চলে গেছে। বৌদির সাথে তার অবিরাম যুদ্ধ। কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না। শেষে চুলোচুলি, খামচা-খামচি। পাড়ার লোক এসে জড়ো হল উঠোনে। যোগমায়া মীরাকে চ্যালা কাঠ দিয়ে পেটাল, তারপর ভেঙে পড়ল কান্নায়। সেদিনই বিকেল থেকে মীরাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এবার ভরতের মোটে গা নেই। সে মীরার ব্যাপারে কুলুপ এঁটেছে মুখে। কত আর দৌড়াবে এদিক-সেদিকে। বাসভাড়া নেই, খরচাপাতি নেই। খালি হাতে মেয়ের খোঁজ করা যায় না।

সুদামের চেহারা ভেঙে গেছে অল্প দিনে। নকুল দু'প্লেট ঘুঘনি আর পাউরুটির অর্ডার দিয়ে তার পাশে গিয়ে বসল। রোদ এসে পড়েছে ছিঁটেবেড়ার চা-দোকানে। তোলা উনুনে

চায়ের জল ফুটছে টগবগিয়ে। সুদামের ভেতরটাও যেন ফুটছে এভাবে। ফোসকা পড়ছে মনে। এত জ্বালা সংসারে সে কি এসব জানত? শুধু অভাব দেখেছে এতদিন। এখন অভাবের সাথে মিশেছে অশান্তি। সে জবাকে যা ভাবছিল, তার ভাবনা সম্পূর্ণ উল্টো হল। জবা লুকানো স্বভাবটাকে বের করে এনেছে বাইরে। সে এখন মীরাকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে। সুদাম কিছুতেই তাকে বোঝাতে পারে না। কুকুরের লেজ সোজা হয় না—হাল ছেড়ে দিয়েছে সুদাম।

নকুল মুখোমুখি বসে বলল, কখন এসেছিস? ডাকলি না কেন?

সুদাম চেয়ে রইল নকুলের মুখের দিকে, ডাকব যে তেমন মনের জোর পেলাম না।

কেন, কি হয়েছে?

না, তেমন কিছু নয়। তবে আমি তোদের ঘরে যাই এটা তোর বউয়ের পছন্দ নয়।

নকুল একটা কাঁচা খিস্তি দিয়ে বলল, বউটা যে কি চায় আমিও বুঝতে পারি না। আজ একচোট হয়ে গেল। কাল থেকে অশান্তি আমার পিছু ছাড়ছে না।

চা খেয়ে দাম মিটিয়ে নকুল বেরিয়ে এল বাইরে। দাড়িওলা মহাজনের খাস লোকটা নিচুস্বরে বলল, বেলা বাড়ছে, যেতে হলে এখনই যেতে হবে। মাল মরে গেলে বাজারে দাম পাবে না।

ব্যস্ত হয়ে নকুল আর সুদাম তার সঙ্গ নিল।

দুটো বালিগড়েরই ওজন কেজি ষাটেকের উপরে। দীঘার চৌহদ্দি পেরতে পারলে তাদের আর ধরে কে।

লোকটা আগে আগে হাঁটছিল, পেছনে নকুল আর সুদাম। বালির উপর হাঁটা পথ গড়ে ওঠে না। বালি পথের ধার ধারে না। মোটা দানার বালিতে খেলা করে রোদ। হাওয়ায় ওড়ে বালি। সমুদ্রের তর্জন-গর্জন শোনা যায় অবিরত। এখন সব কিছু ওদের কান-সওয়া। ঝাউবন পেরিয়ে এলে লোকটা বলে, সাইকেল এখানে থাক। ঐ যে চাটাই ঘেরা ঘরটা, ওটাই দাড়িওলা মহাজনের আড়ত।

দু'পাশে ছোট বড় গাছের ছায়া। লোকজন বেশি নেই এদিকে। শুধু বিরাজ করে শ্মশানের নীরবতা। দু-একটা ঝুপড়ি পাশ কাটিয়ে ওরা আড়তের কাছে গেল। খাটিয়ায় বসে বিড়ি টানছিল মহাজন। ওদের বসতে বলে লোকটা দাড়িওলা মহাজনের সঙ্গে নীচু গলা কি সব আলোচনা করল।

দাড়িওলা মহাজন আদ্যোপান্ত দেখে নিয়ে উঠে গেল সামনে। তারপর শাণিত দৃষ্টি মেলে তাকাল, পারবে তো বালিগড় নিতে? যারা নোনামাছের কারবার করে তাদের মন লহরা মাছের মত ভ্যাদভেদে। বালিগড় ব্যবসায় এখন সাহস আর পয়সা দরকার। এই দুটো জিনিস যদি তোমাদের থাকে তাহলে এপথে হাঁটো নাহলে ঘর ফিরে যাও।

সুদাম বিরক্ত হল, আমরা ঘর ফিরে যাবার জন্য আসিনি। মাল কোথায়? দেখাও—

দাড়িওলা মহাজন উবু হয়ে বড় ঝুড়িটার ঢাকনা খুলে দিল। সমুদ্র-কাছিম নড়ে উঠল ঝুড়ির ভেতর। ভয় পেয়ে পিটপিট করে তাকাল। লুকনো চার পা বাইরে বের করে এনে আবার ঢুকিয়ে দিল পেটের গর্তে।

দাড়িওলা মহাজন এবার সরে এল কাছে, মাল তো দেখলে। যদি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে দাম বলো।

সুদামের কোন অভিজ্ঞতা নেই এ লাইনে। নকুল এর আগেও বালিগড়ের ব্যবসা করেছে। তখন রাস্তায় এত ধড়পাকড় ছিল না। সে অনেক ভেবে চিন্তে বলল, মালগুলো বিশেষ বড় নেই। তোমার জিনিস। তুমি কি দাম নেবে আগে বল?

দাড়িওলা মহাজন মাথা চুলকে তাকাল, বালিগড়গুলো কাল রাতে ধরা। সব-গুলোর পেটে ডিম আছে।

দরদাম হল দশ মিনিট ধরে। কাঁটায় মাল চড়াল না মহাজন। চোখের আন্দাজে ওজন বুঝে টাকা গুনে নিল। টাকা গোনা শেষ হলে দাড়িওলা মহাজন বলল, বালিগড় ঝুড়িতে যাবে না। বস্তার দরকার। তবে মাল নিয়ে যেতে হবে খুব সাবধানে। যদি একবার ধরা পড়ো তাহলে হাজার টাকা জরিমানা হয়ে যাবে। তখন লাভের গুড় সব পিঁপড়ে খেয়ে নেবে।

দাড়িওলা মহাজন সামান্য টাকার বিনিময়ে বস্তার ব্যবস্থা করে দিল। বস্তায় বালিগড় ঢুকিয়ে মুখ বন্ধ করে দিল নকুল। সুদাম শুধালো, মুখ বেঁধে দিলে বালিগড় মরবে না তো?

নকুল তাকে অভয় দিয়ে বলল, তোর ভয় নেই। বালিগড়ের প্রাণ অত সহজে যায় না। আগে আমার এই ব্যবসা ছিল। চেকিং বাড়তেই ছেড়ে দিয়েছি। কে আর খামোকা ঝুট-ঝামেলায় জড়াতে চায়।

আড়ত থেকে বেরিয়ে ওরা ঠিক করল দু'জন দু'দিকে চলে যাবে। একসঙ্গে গেলে চারটে বালিগড়ই খোয়ানোর সুযোগ আছে।

নকুল গেল ঘুরপথে, সুদাম সাইকেল নিয়ে উঠে এল রাস্তায়।

কপাল খারাপ থাকলে ডাঙাতেও বাঘের দেখা পাওয়া যায়। বাঘ নয়, সুদামের সামনে এসে দাঁড়াল থানার জিপটা।

কি আছে সাইকেলে?

কিছু নেই বাবু।

কিছু নেই? দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা।

দু'জন পুলিশ এগিয়ে গিয়ে সাইকেলের হ্যান্ডেল ধরল। বেতের লাঠিটা বার চারেক ঠুকে দিল সাইকেলের ক্যারিয়ারে। ধাতব শব্দ উঠতেই প্রাণ শুকিয়ে গেল সুদামের। সে একবার ভাবল সাইকেল ছেড়ে দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যাবে কিন্তু কোথায় পালাবে এই ভেবে নিজেকে গুটিয়ে নিল।

পুলিশগুলো বস্তার মুখ খুলে বালিগড় দুটো ঢেলে দিল রাস্তার উপর। ধপাস করে শব্দ হতেই ছুটে এল দারোগা। দু'চার ঘা সুদামের গায়ে বসিয়ে খিস্তি দিয়ে বলল, গাড়িতে ওঠ, তারপর থানায় গিয়ে তোর রস নিংড়াব।

হাত-পা কাঁপছিল সুদামের। ইতস্তত করতেই ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাকে গাড়ির উপর ফেলে দিল দারোগা।

বালিগড় ওঠানো হল থানার জিপে, সাইকেল পড়ে থাকল রাস্তায়।

জিপ ছুটল থানার দিকে। রোদের রঙ তখনও সোনাবরণ।

সুদাম যে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে এ সংবাদ গ্রামে পৌঁছাল দুপুরের পরে। নকুল বালিগড় কেটে বেচে দিয়েছে হাটে। তার পোষাকে ছিটিয়ে গেছে রক্ত। সারা শরীর জুড়ে উঠে আসছে আঁশটে গন্ধ। সমুদ্র-কাছিম দুটো বুঝি ডিম পাড়তে নির্জন বালিচড়ায় আসছিল। তখনই হয়ত জেলেদের পেতে রাখা জালে জড়িয়ে পড়ে। তাদের আর ডিম পাড়া হয়নি। থোকাথোকা লাল বর্ণের ডিমগুলো নকুলকে কেমন উদাস করে দেয়। তার মেনকার কথা মনে পড়ে। রাগের মাথায় সে মেনকাকে দাওয়ায় ফেলে দিয়ে উচিত কাজ করে নি। মেনকা গর্ভবতী ছিল। তার শরীর নিঃসৃত রক্তের ধারায় নকুল শুধু বিব্রত বা বিচলিতবোধ করেনি, ভয়ে সে মুখ তুলে তাকাতে পারে নি। মেনকা কাঁদছিল সব হারানোর দুঃখে। তার দুঃখের গভীরতা পরিমাপ করার শক্তি ছিল না নকুলের। সংসারের ঝড় বুঝি সামুদ্রিক-ঝড়ের চেয়েও মারাত্মক ধ্বংসবাহী। সব লন্ডভন্ড করে দেয়।

সুদাম যে পুলিশের হাতে ধরা পড়বে এটা প্রত্যাশিত ছিল না নকুলের কাছে। টহল দেওয়া পুলিশের গাড়ি তাকে সন্দেহ করে ধরে ফেলে। সমুদ্র-কাছিমের সংখ্যা কমে আসছে দিনে দিনে। প্রতিকূল পরিবেশের সাথে ওরা নিজেদের মানিয়ে নিতে পারছে না। দূষণ বাড়ছে সর্বত্র। সমুদ্রের জলেও মিশে গেছে দূষণের বিষ। অসহায় জীবগুলো তাহলে যাবে কোথায়? ওরা ডিম পাড়ার জন্য বালিয়াড়িতে উঠে এলে ওৎ পেতে থাকে মানুষের হিংস্র থাবা। নকুল সুদামের ভবিষ্যৎ ভেবে আতঙ্কিত হল। চা-দোকানের সামনে নকুলকে দেখতে পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল ভরত। নকুলের হাত দুটো ধরে অবুঝ কান্নায় ভেঙে পড়ল সে, আমার সুদামকে তুই বাঁচা। থানা থেকে খবর এসেছে ওকে চালান করবে। যা করার তার আগেই করতে হবে। আমি কিছু জানি না বাবা। আমার বংশের কেউ এর আগে থানায় যায় নি। আমি মূর্খ মানুষ। কি করব কিছু বুঝতে পারছি না।

তুমি শক্ত হও কাকা। দেখি আমি কি করতে পারি। নকুল ভরতকে সান্ত্বনা দিয়ে জীবন মাষ্টারের দোকানে চলে গেল। সব শুনে জীবন মাষ্টার বলল, বালিগড় নিয়ে এত ধর-পাকড় চলছে আগে জানতাম না তো! আগে তো হাটে-বাটে বালিগড় কাটত। গরীব মানুষরা খেয়ে বাঁচত। এখন দেখছি সব জায়গায় সরকারের নজর।

নকুল অস্থির চোখে তাকাল, এখন কি করা যাবে, কাকা? সুদামকে তো ছাড়াতে হবে?

কপালে দুঃশ্চিন্তার ভাঁজ ফেলে জীবন মাষ্টার ফুড়কুনীদের ঘরের দিকে তাকাল, তাপস মাষ্টার ঘরে আছে কিনা দেখ। সে ঘরে না থাকলে ইস্কুলে গিয়ে খোঁজ নে। ও লেখাপড়া জানা ছেলে। ওর কাছে গেলে পথ ঠিক বেরিয়ে আসবে।

নকুল চলে গেল মাঠ পেরিয়ে ফুড়কুনীদের ঘরে।

দরজা খুলে ফুড়কুনী সহাস্যে বলল, সূর্য আজ কোনদিকে উঠেছে কে জানে।

কি ব্যাপার নকুলদা, আমার এখানে আসো না কেন? আমি কি কোন দোষ করেছি।

নকুল চিন্তার মধ্যেও হাসল, সময় পাই না একদম। ভোরবেলায় দীঘায় চলে যাই, ঘরে ফিরি রাত নটায়। সংসার এ মনভাবে গলায় চেপে বসেছে আমি আর দম ফেলতে পারি না।

ফুড়কুনীকে অনেক দিন পরে দেখল নকুল। তার চেহারায় আগের সেই লালিত্য

নেই, হাসিখুসি মুখে ছাপ পড়েছে চিন্তার। ক'মাসেই যেন বয়স বেড়ে গেছে তার। জোর করে হাসলেও সেখানে দুঃখের চিহ্নরেখা লুকাতে পারে না। ফুড়কুনী কি তাহলে চাপের মধ্যে আছে? সংসার জীবন তার কাছে কি সুখের হল না? নকুল এসব যখন ভাবছিল তখন ফুড়কুনী আন্তরিকভাবে বলল, ঘরে চলো। কতদিন পরে এলে, গল্প না করে ছাড়ব না।

নকুল চঞ্চল হয়ে উঠল, আমি একটা দরকারে এসেছি। মাষ্টার মশাই কোথায়? তার সাথে আমার খুব দরকার।

সে তো এখানে নেই। তিন দিন আগে কলকাতায় গিয়েছে। কাল ফিরবে। ফুড়কুনী বসল, কেন কি দরকার? আমাকে দিয়ে কি হবে না?

নকুল চিন্তায় পড়ে গেল, সুদামের খুব বিপদ। ও বাড়িগড় আনতে গিয়ে দীঘায় ধরা পড়ে গেছে। পুলিশ ওকে থানায় নিয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত কী হবে কিছু জানি না।

কথাগুলোয় যেন ঝড় উঠল ফুড়কুনীর বুকের ভেতর। ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে এল মুখমন্ডল। ঘাবড়ে যাওয়া চোখে সে তাকাল, তুমি আমার সঙ্গে চলো। আমি থানায় যাব।

তুমি যাবে? নকুল আশ্চর্য হল।

কেন মেয়েদের বুঝি থানায় যেতে নেই? প্রশ্নের তীর ছুঁড়ে দিল ফুড়কুনী, তার বিপদ শুনে আমি ঘরে বসে থাকব কি করে? তুমি কি জান নকুলদা, সে আমার কে হয়? আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে সে ভগবানের মতো। জীবনের সব কিছু দিয়েও আমি তাকে ছাড়িয়ে আনব।

মুহূর্তের মধ্যে তৈরী হয়ে নিল ফুড়কুনী। নকুল সাইকেল রেখে এল ঘরে। ভরত এসে দাঁড়িয়েছে সোনাঝুরি গাছের নীচে। চিন্তায় তার চোয়াল জাগান মুখ প্রাগৈতিহাসিক কোন প্রাণীর মত দেখায়। ফুড়কুনী নত মাথায় এগিয়ে এল তার কাছে, চিন্তার কোন কারণ নেই। আমরা ওকে সঙ্গে করেই আনব। ওকে না নিয়ে আমরা কেউই ফিরব না।

বাস এসে গেল এগরা থেকে। ভিড় বাসে পা রাখার জায়গা নেই কোথাও। ফুড়কুনী তবু ঠেলে ঠুলে উঠে এল নকুলের সঙ্গে। গুমোট গরমে অসহ্য লাগছিল তার। দমবন্ধ হবার উপক্রম। তবু সে ঠোঁটে ঠোঁট টিপে পেরিয়ে এল পথ।

থানায় যে এত সহজে ঝামেলাটা মিটে যাবে ফুড়কুনী তা ভাবে নি। জীবন মাষ্টারের দূর সম্পর্কের এক আত্মীয় ওখানকার সেকেন্ড-অফিসার। পলাশই সব কাগজপত্র ঠিক করে দিল।

এত সহজে সুদাম যে ছাড়া পাবে সে নিজেও জানত না। ফুড়কুনীর প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার চোখ ছাপিয়ে জল এল। চলে আসার আগে পলাশকে ধন্যবাদ জানাল ফুড়কুনী। পলাশ বলল, আসল অপরাধীদের আমরা ধরেছি। এমন জঘন্য কাজ বেশিদিন চলতে দেওয়া যায় না। সুদামের সাহায্য পেয়েছি বলেই আমরা লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারলাম। তবে ওকে বুঝিয়ে বলো ও যেন এপথে আর না হাঁটে।

পথ চলে গেছে বহুদূর। নিভু আলোয় রহস্যময় হয়ে উঠেছে পৃথিবী, ফুড়কুনীর মতো।

তাহলে কি সুদামের ছোট্ট পৃথিবী এখনও ফুড়কুনীকে ঘিরে আবর্তিত কিংবা ফুড়কুনীর হৃদয়?

সমুদ্রের তীরে ওরা দাঁড়িয়ে আছে। ওরা তিনজন। নোনা হাওয়ায় আছড়ে পড়ছে ফুড়কুনীর খোলা চুল। সে কি দেখছে অমনভাবে? সে কি সমুদ্র হতে চায় নাকি ছোট্ট সেই ঢেউ-ডিঙা? মানুষ কি চায় তা সে নিজেও জানে না। ঢেউয়ে ঢেউয়ে সে হয়ে যেতে পারে সমুদ্রসমান। শুধু ডিঙা ভাসানোর দরকার। ঢেউ-ডিঙা।

॥ কুড়ি ॥

নদীর কচ্ছপের নাম কাঁসারী।

সমুদ্র-কাছিমের সঙ্গে এদের ফারাক বিস্তর। কাঁসারী নোনা জলের কাছিম নয়, মিষ্টি জলের। মিষ্টি জলে থাকার সুবাদে তার মাংসে আঁশটে গন্ধ প্রায় নেই বললেই চলে। এর দাম আকাশ ছোঁয়া না হলেও সমুদ্র-কাছিমের চেয়ে একটু চড়া। সুবর্ণরেখার মোহনার কাছে নকুল দুটো কাঁসারী পেল খুব অল্প দামে। প্রথমে ভেবেছিল—নেবে না কিন্তু পরে আর লোভ সামলাতে পারল না। ঝুঁকি আছে এ কাজে তবু ঝুঁকি না নিলে জীবন বাঁচে না। মেনকাকে এখন প্রতি মাসে এগরা নিয়ে যেতে হয় ডাক্তার দেখানোর জন্য। যাওয়া-আসা, খাওয়া-খরচ, ডাক্তারের ফি, ওষুধের দাম-সব মিলিয়ে অনেকগুলো টাকা চোখের সামনে হড়হড় করে খরচ হয়ে যায়। খরচ হলেও কিছু করার নেই। মেনকাকে আর অবহেলা করা চলে না। এখন ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি। আশ্বিনের প্রথম সপ্তাহে সে চলে যাবে মাছখটীতে। সমুদ্রধারের উঁচু বালিয়াড়িতে টানা চারমাস থেকে ফিরে আসবে পৌষ সংক্রান্তির আগে। চারমাসে যা কামানোর কামিয়ে নিতে হবে তাকে। মাছ ব্যবসায় নকুলের এখন দিন চলে না। নোনা মাছ হাওয়া আর রোদে লতপত করে, দাম পাওয়া যায় না। গাঁয়ের হাটগুলোয় ধার-বাকি চায় সবাই। অনেক হাটে দায়ে পড়ে আসলও ধারে চলে যায়। তখন আঙুল কামড়ান ছাড়া তার আর কিছু করার থাকে না।

কাঁসারী দুটোর দাম মিটিয়ে নকুল ভাবছিল আজকের দিনটা ভাল যাবে। যা সে কখনো আশা করেনি তা এখন তার হাতের মধ্যে। পিঠ উঁচা নদীর কাছিম দুটো ঝুড়িতে ঢুকিয়ে বস্তার আড়াল দিল নকুল। আকাশে ফটফট করছে রোদ, আজ মনে হয় বৃষ্টি-বাদলার হুজ্জোতির কোন সুযোগ নেই। এমন পরিষ্কার আকাশ থাকলে সাইকেলে চেপে নেগুয়ার হাটে পৌঁছাতে কতক্ষণ!

নকুল সাইকেল ঠেস দিয়ে ঝুপড়ি-দোকানে চা-পাউরুটি খেল। সঙ্গে কড়া ঝাল দেওয়া আলুর দম। ক'দিন থেকে মেনকা আর ভোরে উঠে রাঁধাবাড়ার কাজটা করতে পারছে না। শরীর তার ভারী হচ্ছে দিনে দিনে। এখন একটু বেশি খাটাখাটি করলেই তার শিরদাঁড়ার কাছটায় কেমন ব্যথা করে। হাঁটুর নীচ থেকে টান ধরে মাংস পেশীতে। ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে তার চেহারা। নকুল সমুদ্র-মাছ রোজ আনে ঘরে। মিঠে জলের মাছ কিনতে পারে না সে, দাম বেশি। মেনকাও আব্দার করে না মাছ খাবার জন্য। সে নকুলের বদ-মেজাজটাকে চেনে। সেদিনের মারের কথা ভোলেনি সে, অল্পের জন্য ভ্রূণ

হত্যার দায় থেকে বেঁচে গেছে। সে নিজেও বেঁচেছে। এসময় মা ও সন্তানের উভয়ের ক্ষতি হতে পারে। ভগবান ছিল নাহলে সেদিন যে কি হত কে জানে। পয়সা মিটিয়ে নকুল যখন ঢালু পথ বেয়ে নামছিল বালিয়াড়ির দিকে তখনই চা-দোকানের মালিক অবন তাকে ডাকল নাম ধরে। নকুল ফিরে তাকাতেই অবন ছুটে এল সাইকেলের কাছে। গলা খাদে নামিয়ে সে বলল, তোমাকে একটা কথা বলি। তোমার কাছে কাঁসারী আছে। কাঁসারী নিয়ে যেন রাস্তা দিয়ে যেও না। যেতে হলে সমুদ্রের বালিচড়া ধরে চলে যাও। এতে তুমি নিরাপদে যেতে পারবে।

নকুল খুব অবাক হয়ে শুধোল, কেন, মেন রাস্তা ধরে গেলে কি হবে?

কিছু হবে না, আবার হয়েও যেতে পারে। থানার পুলিশগুলো ক্ষেপে আছে। ওদের বদনাম হয়েছে উপরমহলে। তাছাড়া ওরা বালিগড় আর কাঁসারীর ফারাক বোঝে না। ওদের কাছে কাঁসারীও যা, বালিগড়ও তাই। একবার ধরা পড়ে গেলে বাপের নাম ভুলিয়ে ছেড়ে দেবে।

নকুল কিছুটা ঘাবড়ে গেল। মনে মনে ভাবল নদীর কাছিম না কিনলেই বুঝি ভাল করত সে। পুলিশের ঝামেলা ওর ভাল লাগে না। সুদাম ধরা পড়ার পর কড়াকাড়ি হয়েছে দীঘার পাড়ে। থানায় খবর আছে রোজ নাকি শ'য়ে শ'য়ে সমুদ্র-কাছিম আসছে পশ্চিমের দ্বীপ থকে। কারা আনছে, কোন পথে আনছে, কোথায় বিক্রি হচ্ছে এসব এখন পুলিশের জানা হয়ে ওঠেনি। যদি জানত তাহলে পুরো এলাকা ঘিরে ফেলে ওরা তল্লাসী চালাত। নিরীহ মাছ-কারবারীদের উপর ধরপাকড় বেড়ে যেত। নকুলকে রোজ আসতে হয় দীঘায়। সে এমন বাজে ঝামেলায় জড়িয়ে গেলে তাকে কেউ উধারে আর মাছ দেবে না। টিসটিসানী শুরু হল নকুলের। এক সময় তার মনে হল সে সমুদ্রে ছেড়ে দেবে নদীর কাছিম। দরকার নেই লাভে। পরমুহূর্তে ঝিমিয়ে গেল সে। মেনকাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে—টাকা দরকার। মাসে মাসে এত টাকা কে দেবে তাকে? কে দেবে ঘর খরচ?

নকুল অবনের মুখের দিকে তাকাল, তুমি ঠিকই বলেছ ভাই। আমি আজ আর মেন-রাস্তা দিয়ে যাব না। একটু ঘোরা হোক তবু বালিয়াড়ি ধরে যাব। দীঘাটা পার হতে পারলে আমার আর ভয়ের কোন কারণ নেই।

নোনা জলের বালিগড় শুধুমাত্র ডিম পাড়ার জন্য ডাঙায় ওঠে। পশ্চিমের দ্বীপটা বড় বেশি নির্জন। সমুদ্র-কাছিম সেখানে ডিম ছেড়ে বালি ঢাকা দিয়ে চলে আসে। এখনও শীত আসেনি, তবু এবছর যেন ওদের ডিমপাড়ার হিড়িক পড়ে গেছে। লোভী জেলেরা নৌকা নিয়ে চলে যায় কীর্তনীয় মাছখটীর কাছে। ডিম পাড়তে আসা সমুদ্র-কাছিম ধরা পড়ে তাদের পেতে রাখা জালে। সারণি জালে কদাচিৎ দু'চারটে বালিগড় উঠলেও জালের মালিক সেই বালিগড় বাজারে নিয়ে যাবার সাহস পায় না। পুলিশ জানতে পারলে জাল-মাছ-সম্মান সবই যাবে। কে আর বাড়া ভাতে কাঠি দিতে চায় এখন। এই কঠিন যুগে বেঁচে থাকাটাই একটা কঠিন দায়। তারা ভয়ে বালিগড় ভাসিয়ে দেয় সমুদ্রের জলে। মুক্তির আনন্দে ওরা সাবমেরিনের মত হারিয়ে যায় জলের গভীরে। মাদী-নর

পাশাপাশি সাঁতার কাটলে এসময়ে যৌনলিপ্সা বেড়ে যায় ওদের। শুধু জল নয়, ডাঙায়ও ওরা সমান পারদর্শী। নকুলের হাসি পেল এসব ভাবতে গিয়ে। তার মেনকার কথা মনে পড়ল। বউটা শুকনো শরীর নিয়ে এখনও সন্তান ধারণ করতে চায় বছর বছর। নকুল মতে মত মিলিয়ে চলতে পারে না, তার ভীষণ ভয় করে।

পাক্কা আধঘন্টা সাইকেল চালিয়ে সে দীঘার এলাকা পেরিয়ে এল। গামছায় ঘাম মুছে নিয়ে সে একটা তালগাছের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ালো। গরম হাওয়া আসছিল মাঠ ডিঙিয়ে। ঘামে ভেজা শরীর চিড়বিড়িয়ে উঠছিল নকুলের। অস্বস্তি হল তবু তার মধ্যে ফুটে উঠল শান্তির ঢেউ যেন বুকে চেপে বসা পাথর সে হাত দিয়ে নামিয়ে দিয়েছে। বড় করে শ্বাস নিয়ে নকুল দেখল সামনে কোন বিপদ আছে কিনা। রাস্তা ধানকাটা মাঠের চেয়েও ফাঁকা। নকুল ধীরে ধীরে উঠে এল পাকা রাস্তায়।

পানিপারুলের বাজারে তার সাথে দেখা হল সুদামের। দিনের আলো তখন তাপ উগরায়। সুদাম ক'দিনেই শুকিয়ে গেছে অনেকটা। পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছে বলে—এখন তার মনে কোন আপশোস নেই। সে তার কৃতকর্মের ফল পেয়েছে। আগুন ছুঁলে হাত তো পুড়বেই। এটা আগুনের দোষ নয়, হাতেরই দোষ। ফুড়কুনী সেদিন যদি ঠিক সময়ে না যেত তাহলে এখনও জেলের ঘানি টানতে হোত তাকে। সে ফুড়কুনীর প্রতি কৃতজ্ঞ। এই উপকার গায়ের রক্ত দিলেও শোধ হবে না। সেদিনের পর আর ফুড়কুনীর সাথে দেখা হয়নি সুদামের, সে নিজেও ইচ্ছে করে দেখা করেনি। জবা ফুড়কুনীর কথা শুনলেই এখন তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে। মুখ গম্ভীর করে বলে, মাষ্টারের বউটার চাহুনি আমার ভাল লাগে না। কেমন তাকায় যেন কোনদিন পুরুষমানুষ দেখে নি। ওর চাহুনি দেখে আমি বুঝতে পারি জীবনে ও সুখী হয়নি।

ছ্যাকা খেলে ফোসকা পড়ে, সেই ফোসকা গলে গেলে সৃষ্টি হয় ঘায়ের। তাপস মাষ্টারের স্বভাব বিয়ের পরে বদলে গেছে পুরোপুরি। বিয়ের বছর না ঘুরতেই প্লেন ক্রাশে মারা গেছে মানসীর ইঞ্জিনীয়ার স্বামী কুণাল। মানসী ফিরে এসেছে কলকাতায়। সে আবার পুরনো সম্পর্ক ঝালিয়ে নিয়ে নতুন করে বাঁচতে চায়। বাঁচার জন্য তার একমাত্র আশ্রয় তাপস। তাপসও ডিঙা ছেড়ে জাহাজে উঠবে বলে মানসিকভাবে তৎপর। গ্রামের ফুড়কুনী তার পথের বাধা। এই নিয়ে রোজ তাদের সংসার টালমাটাল। বেশির ভাগ দিন তাপস ঘরে থাকে না, চলে যায় এস.টি.ডি. বুথ থেকে কথা বলার জন্য এগরায়। সেখানে তার বন্ধু সৌগত থাকে। সৌগত এন.আর.এস. মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারী পাশ করে নিজস্ব চেম্বার খুলেছে এগরায়। শুধু এগরা নয় আরও সাত জায়গায় তার ওঠা-বসা। ক্লান্ত হয়ে সে যখন বাসায় ফেরে তখন মদের ফোয়ারা ছোটে। তাপস আর সৌগত মুখোমুখি বসে মদ খায় সময় পেলে। অনেক রাতে মদ খেয়ে বাড়ি ফেরেন তাপস মাষ্টার। সৌগত তাকে বাড়ি পর্যন্ত গাড়ি করে পৌঁছে দিয়ে যায়। প্রায় রাতে সৌগত'র টাটা সুমো থেকে টলমল পায়ে সবুজ মাঠ পেরিয়ে ঘরে আসে তাপস মাষ্টার। অত রাত পর্যন্ত ভাত নিয়ে ঘরে বসে থাকে ফুড়কুনী। তাপস মাষ্টার প্রায় রাতেই খান না। মদে চুর হয়ে তিনি জুতো সমেত লুটিয়ে পড়েন বিছানায়। ফুড়কুনী তার জুতো-

মোজা খুলে দেয়, নিজেও না খেয়ে শুয়ে পড়ে তাপসের বিছানায়। সে তার ভবিষ্যৎ নিয়ে এখন আর কিছু ভাবে না। বড় গাছে ভাঁড় বাঁধতে গিয়ে সে পা পিছলে পড়ে গিয়ে মাজা ভেঙেছে। হাত-পা-ভাঙলে জোড়া লাগত, কিন্তু শিরদাঁড়া যে জোড়া লাগে না। ফুড়কুনী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে, তার কান্না শোনার কেউ নেই এখন। গত রাতেও তুমুল ঝগড়া হয়েছিল ওদের। তাপস মাষ্টার ফুড়কুনীকে লাথি মেরে ফেলে দিয়েছেন খাট থেকে। উত্তেজিত হয়ে বলেছেন, তুমি কেন আমার পথের উপর পাহাড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদি পথ না ছাড় তাহলে আমি তোমাকে ডিঙিয়ে চলে যাব। যদি ডিঙাতে না পারি তাহলে আমি ডিনামাইট দিয়ে বাধার পাহাড় উড়িয়ে দেব।

তাপস মদ্যপ অবস্থায় মুখ ফসকে সত্যি কথাটা বলে ফেলল।

তুমি শুনে রাগ করলেও আমার কিছু করার নেই। আই অ্যাম ব্যাডলি ইনগেজড উইথ মানসী। আমি মানসীকে ভালবাসি বুঝলে? কলকাতায় গেলে আমি মানসীর ফ্ল্যাটে যাই। মানসী একা থাকে—বুঝলে? সারা রাত আমরা কেউ-ই ঘুমাই না। পুরনো কথার জাবর কাটতে কাটতে আমাদের রাত ভোর হয়ে যায়। ভোরবেলায় আমি রাধাচূড়া ফুল নিয়ে খেলা করি।

ফুড়কুনী কানে হাত চাপা দিয়ে বসে পড়ে। চোখের জল ছাড়া তার আর প্রতিবাদের কোন ভাষা নেই। এই মানসিক নির্যাতনে সে হাঁপিয়ে উঠেছে ক'মাসেই। স্ত্রীর মর্যাদা যখন তাপস দেবে না তখন আর বেঁচে থাকার মূল্যই বা কি!

তাপস গতকাল চলে গিয়েছে কলকাতায়। ফুড়কুনী এই সুযোগ নষ্ট করেনি। সে দুপুরবেলায় বিষ খেয়েছে। কাজের বউটি না দেখতে পেলে তাকে হয়ত মৃত অবস্থায় বাজারের সবাই দেখতে পেত।

কাজের বউটি খবর দিল জীবন মাষ্টারকে। সুদাম গিয়ে দেখল ফুড়কুনীর মুখের দু'পাশে গ্যাঁজরা, সে অসাড় হয়ে পড়ে আছে মেঝেতে। ম্যাটাডোর ভাড়া করে তাকে নিয়ে আসা হয়েছে পানিপারুল হাসপাতালে। স্টমাক-ওয়াসের পরে ফুড়কুনী এখন যমের সাথে লড়ছে।

সুদাম চোখ মুছে নিল রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে। জীবন মাষ্টার কাঁদছিল শিশুর মত। হাসপাতালের ডাক্তারবাবু বললেন, আমি এখনও আশা ছাড়িনি। ফিফটি-ফিফটি চান্স আছে। আপনারা কেউ যান, এই ইনজেকশনটা তাড়াতাড়ি কিনে আনুন।

ডাক্তারবাবুর স্লিপটা নিয়ে বাজার দৌড়ে এসেছে সুদাম। ওষুধটা কিনে নিয়ে সে আর দাঁড়াল না। যে পথে এসেছিল সেই পথ ধরে ফিরে গেল আবার।

খবরটা শোনার পর থেকে নকুলও ভীষণ অন্যমনস্ক। মাছের বাজারে সস্তা দামে কাঁসারী দুটো বেচে দিয়ে সেও চলে গেল হাসপাতালে।

তিনদিন পরে শেষ হল যমে মানুষের লড়াই। জিৎ হল মানুষের।

ডাক্তারবাবু হাসি মুখে বলল, ইট ইজ এ মিরাকেল! আমি ভাবতেই পারছি না যে ফুড়কুনী বাঁচবে! ও বেঁচেছে, এটাই আশ্চর্যের!

খবর পেয়েই কলকাতা থেকে ফিরে এসেছেন তাপস মাষ্টার। ফুড়কুনী তার দিকে একবারও ফিরে তাকাল না। তার দু'চোখে দোল খেল ছোট্ট ডিঙা।

॥ একুশ ॥

ছোট ছোট ঢেউ বদলে দেয় জীবনের পথ। পথ চলে যায় মাটির পৃথিবী ছুঁয়ে। কত অদলবদল ঘটে যায় সুদামের জীবনে। সে এখন দীঘায় যেতে ভয় পায়। পুলিশের রুলের বাড়ি খেয়ে সে টানা বেশ কয়েকদিন ঘরের বাইরে বেরলো না। জবা তাকে বলল, ঘরে বসে থাকলে চলবে না। ব্যবসা তোমাকে করতেই হবে। ব্যবসা না করলে খাবে কি?

জবা যা বলেছে, সংসারের মুখ চেয়েই বলেছে। মাত্র দশ কাঠা ধান জমি তাতে কি হয় এত বড় সংসারের? ভরত এখন বেতের কাজ করছে। তরলা বাঁশের ঝুড়ি কুলো চালুনী খালুই নিয়ে বসে হাটে। এতেই চলছে সংসার। দশ দিন বসে যাওয়ার অর্থ সংসারের দশ অবস্থা। জবা আর পারছে না। সে বিরক্ত। সে ভেবেছিল পায়ের উপর পা তুলে খাবে, তা আর হল কই? এখানে একটা ভাল শাড়ি পরার পরিবেশ নেই। সবাই যে যার তালে ঘুরছে। কারোর পোষাক-আষাকের নজর নেই। খালি পা, কারোর গায়ে আবার জামা নেই। সময় মত চিরুনি চালাতে ভুলে যায় এখানকার মানুষ। জবা তার জীবনের ছন্দ হারিয়ে ফেলছে দিনে দিনে। হতাশা তার মনে দীর্ঘ ছায়া ফেলেছে, যেখানে দাঁড়ালে তার লালচে, লাবণ্যময় মুখখানা অন্ধকারে ঢাকা পড়ে।

সুদাম প্রায়ই ভাবে এই জীবনের কি দাম? মানুষ কিসের পিছনে ছুটছে? এর শেষ কোথায়?

নকুল তাকে চাঙ্গা করে তোলে। সে পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, অত ভাবলে জীবন চলে না। জীবনকে নিজের পথে যেতে দে। হাওয়ার পথ বদলে দেওয়া যায় না।

তা যায় না কিন্তু এভাবে তো আর চলছে না। সুদামের কণ্ঠস্বরে হতাশা ঘোঁট পাকায়।

নকুল গুরুত্বহীন হাসল, কাজের মধ্যে মানুষকে থাকত হবে। তারপর যা হবে দেখা যাবে।

কাজ কোথায়? উদগ্রীব হল সুদাম, আমি তো কতদিন ধরে ঘরে বসে আছি। জবার সাথে প্রায়ই খিটিমিটি লাগছে। ও যা চেয়েছিল তা পায়নি। না পাওয়ার জন্য ওর মনের ভেতরে একটা ফাটল তৈরী হয়েছে। দিনকে দিন জবা সেই ফাটলে নিজেকে ছুঁড়ে দিচ্ছে। ওর হতাশা আমাকে কাঁপিয়ে দেয়। এখন যে আমার কী করা উচিত আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

নকুল প্রকৃত শুভার্থীর মত বলল, গ্রামে নিষ্কম্মা বসে থাকলে মন আরও খারাপ হয়ে যাবে। ভুলে যা পুরানো কথা। আবার নতুন করে ব্যবসা শুরু কর। দেখবি একদিন ঠিক পথ খুঁজে পাবি।

মাছের ব্যবসা আমার ভাল লাগে না। তাছাড়া অত সাইকেল চালান আমার এই শরীর সয় না। আমি হাঁপিয়ে উঠি। বুক ধড়ফড় করে।

তাহলে এক কাজ কর। আমার সাথে যাবি?

কোথায়?

এবছর মাছখটীতে আমি চলে যাচ্ছি। সব যোগাড়যন্ত্র করে ফেলেছি। তুই যদি যেতে

চাস তাহলে আমার সঙ্গে যেতে পারিস। মাছখটীতে চার মাসের তোর কাজ পাকা। ওখানে পরিশ্রম কম, সাইকেল চালাতে হবে না।

কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল সুদামে, মাছখটীতে আমাকে কি কাজ করতে হবে?

নকুল হাসতে হাসতে বলল, মাছখটীর কাজ হালকা। তোকে তেমন কিছু কঠিন কাজ করতে দেব না। শুধু সমুদ্র থেকে মাছ আনা, আলাদা জাতের মাছ বাছা, রোদে বালিয়াড়িতে শুকোতে দেওয়া, মাছ শুকিয়ে গেলে মহাজনের সাথে যোগাযোগ করা— ব্যাস-এইটুকু দায়িত্ব তোর। কিরে পারবি না?

সুদাম বলল, না পারার কিছু নেই তবে জবার সাথে একটু কথা বলে নেওয়া দরকার।

হ্যাঁ, তা তুই বল। তবে আমার মনে হয় জবা আপত্তি করবে না। পুরুষমানুষ ঘরে থাকলে তার মন কেঁচো হয়ে যায়। তার বাইরে বেরনো দরকার। আর একটা কথা। মাছখটীতে তুই জবাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে পারিস। জবা যদি তোর সঙ্গে যায় তাহলে উঁচা বালিয়াড়িতে আমি তোকে আলাদা ঝুপড়ি বানিয়ে দেব। সেখানে তোর কোন অসুবিধা হবে না। কত শয়ে শয়ে মানুষ বউ-বাচ্চা নিয়ে মাছখটীতে থাকে। শুকা তৈরীর কাজে সবার সাহায্য দরকার।

ঘরে ফিরে এল সুদাম। জবাকে কথাটা বলতেই সে কেন্নো চেবানোর মত মুখ করে তাকাল, ঘরের বউকে তুমি মাছখটীতে নিয়ে যাবে? কি করে ভাবলে এটা? আর ক'দিন পরে তুমি বলবে—চলো দীঘায় মুখে রঙ মেখে সন্ধেবেলায় ঝাউবনে ঘুরবে! সেখানেও অনেক পয়সা। ছি:, তোমার মুখের দিকে তাকাতে এখন আমার ঘেন্না হচ্ছে!

আমাকে ভুল বুঝো না। মাচখটীতে আমাদের পাড়ার অনেকেই যায় বউ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে। ওরা সেখানে চার মাস শুকনো মাছের কাজ-কারবার করে, তারপর পৌষমাসে ফিরে আসে। এতে খারাপ তো কিছু নেই!

সুদামের উপর জবা যেন ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইল, খারাপ-ভাল'র বিচারশক্তি তুমি হারিয়ে ফেলেছ। তোমার সাথে কথা বলা না বলা সমান। তোমার যেখানে মন চায় চলে যাও। আমাকে টেনো না। আমাকে এখানে থাকতে দাও।

চার মাস তুমি এখানে একা থাকবে?

সুদামের প্রশ্নে জবার ঠোঁটে বাঁকা হাসি খেলে গেল, চার মাস কেন, চার বছরও আমি একা থাকতে প্রস্তুত। সবাই তো সমান ভাগ্য নিয়ে এ সংসারে আসে না। টগর যা পেয়েছে, আমি যে তা পাব—এমন ভাবাটা ভুল। তুমি নিশ্চিন্তে চলে যাও, আমার জন্য ভেবো না, আমি এখানেই ভাল থাকবো।

ভরত আর যোগমায়া শুনছিল ওদের কথোপকথন।

ভরত বলল, মাছখটীর কাজ আমার জানা আছে। আমি তোর সাথে যেতে পারি। এখানে বসে থেকে কি করব? চাষবাস নেই। সেখানে গেলে বরং কাজের মধ্যে থাকব। দুটো পয়সার মুখ দেখতে পাব।

যোগমায়ার মনে চিন্তা ঢুকেছে। সে অস্থির হয়ে বলল, তোমরা দু-জনেই মাছখটীতে চলে গেলে আমরা মেয়েমানুষ ঘরে একা থাকব কি করে? আমাদর দায়ে-অদায়ে, বিপদে-আপদে কে দাঁড়াবে?

ভরত বলল, তার জন্য ভেবো না। আমি প্রতি হপ্তায় ঘরে আসব। বাজারহাট সব করে দিয়ে যাব। তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না।

তাহলেও আমার কেমন যেন লাগছে। যোগমায়া দ্বিধা জড়ানো গলায় বলল, আমি একা থাকলে অন্য কথা। সে আমি যেমন করেই হোক কাটিয়ে দিতাম। বউমাকে নিয়ে আমার সমস্যা হবে। কচি বউ ঘরে একা থাকলে শাশুড়ির অনেক দায়িত্ব বেড়ে যায়।

সেটুকু দায়িত্ব তোমাকে নিতে হবে মা। এ সংসারটা শুধু বাবা বা আমার একার নয়। এ সংসারটা সবার। সুদামের কথায় যোগমায়া কেমন ঘাবড়ে যাওয়া চোখে তাকাল, যেটা ভাল বুঝিস তোরা কর। আমার যা মনে এল বলে দিলাম। কিছু হলে আমাকে দোষ দিবি না। আমি ঘর পাহারা দিতে পারব কিন্তু বউ পাহারা দিতে পারব না।

যোগমায়ার মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুটা অবাক হয়েছিল সুদাম, সে মুখে কিছু না বললেও একটা সংশয় এবং আশঙ্কা মনের ভেতর ঘোঁট পাকাচ্ছিল। জবা তার বাপের বাড়ি যাবে না, পুরো চারমাস সে এখানেই থাকবে—এমন একটা জেদ ফুটে উঠছিল তার কথার মধ্যে। কেন সে বাপের বাড়ি যাবে না এর মধ্যে কোন অজানা রহস্য লুকিয়ে আছে কিনা তা সম্পূর্ণরূপে সুদামের কাছে অজ্ঞাত। জবা হয়তো শ্বশুরবাড়িকে ভালবাসে বলেই সে আর অন্য কোথাও যেতে চায় না। এমন যদি তার মনোভাব হয় তাহলে অবশ্যই তা গ্রহণযোগ্য। এছাড়া সে যদি অন্য কোন সুপ্ত বাসনা মনের ভেতর লুকিয়ে রাখে তাহলে তা হবে রীতিমতন নিন্দনীয়। কথা আর বেশী দূর বাড়েনি, ঠিক হল ভরত আর সুদাম নির্দ্দিষ্ট দিনে চলে যাবে জুনপুটের মাছখটীতে। নকুলের সঙ্গে পাকা কথা বলে এল সে। ভরত যে জুনপুটের মাছখটীতে যাবে একথা শুনে উৎসাহিত হল নকুল। যখন বাস-রাস্তা হয়নি তখন ভরত আর গোবর মাছের ব্যবসা করত যুবক বয়সে। তারা ভোরবেলায় উঠে দীঘায় চলে যেত বাঁক আর ঝুড়ি নিয়ে। ফিরে আসত হাঁটা পথে গ্রামের মধ্যে দিয়ে। হাঁটা পথ নাকি সোজা পথ এমন গল্প শুনেছে নকুল। তার বাবা গোবর বলত, শরীরে আমাদের ছিল হাতির বল। অতটা পথ ভেঙে এক মণ মাছ এনেও বাজার সারতাম আমরা। সাঁঝের বেলায় ঘরে ফিরে আর শরীর চলত না। এক ঘুমে ভোর হয়ে যেত। অবশ্য তখন খাদ্য-খাবারে এত পায়িল ছিল না, লোহা খেলেও হজম হয়ে যেত পেটে। বাবার কথাগুলো এখনও মনে পড় নকুলের। তখন তার ঝিমুনি ভাবটা কেটো যায়। শরীর না চললেও মনের শক্তি তাকে চাঙ্গা করে তোলে।

মাছের ব্যবসা নকুলের বুঝি রক্তে ঢুকে গেছে। নোনামাছের টানে সে বার বার ছুটে যায় দীঘার দিকে। রোজ সমুদ্রদর্শন তার জীবনে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতার কথা সে মেনকাকে বুঝিয়ে বলতে অক্ষম। নোনা মাছের নেশা অন্য যে কোন নেশার চাইতেও মারাত্মক। খুব শরীর খারাপ না হলে সে একবার দীঘার পাড় থেকে ঘুরে আসবেই। মাছের আড়তে গিয়ে খোঁজখবর নেওয়া, গল্পগুজব করা—এসব তার প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার অঙ্গ।

সুদাম অনেকক্ষণ পরে বলল, তাহলে কবে যাবি দিনক্ষণ কিছু ঠিক করেছিস?

নকুল বলল, জিনিসপত্র সব বেঁধে নে। যদি খবর আসে তাহলে কালই আমরা চলে যাব। আগে গেলে উঁচা বালিয়াড়িতে ডেঁড়া বাঁধার জায়গা পছন্দ মত পেয়ে যাব। দেরী করে গেলে ফাঁকফোঁকরে ঢুকতে হবে। তখন চারমাসের জন্য সময় কষ্ট।

জুনপুটের বালিয়াড়িতে বড় পুজোর আগে থেকে যেন মেলা বসে সবসময়। আশেপাশের গাঁ ভেঙে লোক আসে শুটকিমাছের কারবার করার জন্য। যারা আসে তারা একা আসে না, বউ-বাচ্চা-বুড়ো মা এমন কী ঘরের কুকুরটাকেও সঙ্গে করে নিয়ে আসে। বছরের চার মাস তালা ঝোলে তাদের ছিটে বেড়ার ঘরে। মাছখটীতে কাজে মশগুল হয়ে থাকে পুরো পরিবার। মাছের আড়ত কিংবা সমুদ্রের কিনারা থেকে ওরা সস্তায় কিনে আনে মাছ। সেই মাছ বাছাই হয় বালির উপর। তারপর বালিতেই শুকাতে দেওয়া হয় শুটকি মাছের জন্য। রোদে রস শুকায় নোনামাছের। বিশ্রী গন্ধে ভরে যায় মাছখটীর আশপাশ। তখন অস্থায়ী টিউবওয়েল বসানো হয় বালিয়াড়িতে। ঝাউবনে গিজগিজ করে মানুষের দল। এমনও দেখা গেছে মাছখটীতে কাজে এসে পোয়াতীর বাচ্চা হয়েছে অস্থায়ী ছাউনিতে। পুজোপাঠ উপোস ধর্ম কোন কিছু বাদ যায় না এই জীবন থেকে। সন্ধের পরে হাতে যখন কাজ থাকে না তখন গান-বাজনার আসার বসে। কেউ বা তাস পেটায় হ্যারিকেনের আলোয়। এ সময় সমুদ্রঝড়ের আশঙ্কা খুব কম থাকে। আশ্বিনের পরেই মেঘ হয়ে যায় স্বচ্ছ নির্মল। চরাচরে নেমে আসে ঠান্ডা আমেজ। সমুদ্রও সর পড়া দুধের মত। এই অনুকূল পরিস্থিতিতে মালিকরা নৌকো নিয়ে চলে যায় দূর সমুদ্রে। সারণি জাল পেতে ফিরে আসে ডাঙায়। তারপর চলে কাছি নিয়ে কোমর জল থেকে পিছিয়ে আসা পা মেপে মেপে। জনা বিশ-ত্রিশেক মানুষ টেনে তোলে সারণি জাল ডাঙায়। খলবলান মাছ বালিয়াড়ির ছোঁয়া পেলেই ঝিমিয়ে পড়ে। নোনা মাছের কাছে বালিয়াড়ি মরণকাঠির সমান। বাউল, পমপ্লেট, কড়মামাছ কিছুক্ষণ বেঁচে থাকলেও রূপাপাটিয়া, তেল-তাপড়া কিংবা লহরা মাছেরা বালি ছোঁয়ার সাথে সাথেই চোখ উল্টে দেয়। নকুল ভেবে পায় না নোনা জলের প্রাণবন্ত চঞ্চল মাছের দল বালি ছোঁয়ার সাথে সাথে কেন শেষ হয়ে যায়! অনেক জেলেকে সে এই প্রশ্নটা করেছ কিন্তু কেউ-ই সদুত্তর তাকে দিতে পারেনি।

সুদাম নকুলের সঙ্গে কথাবার্তা সেরে সোজা চলে আসে জীবন মাষ্টারের দোকানে। এত কিছুর পরেও জীবন মাষ্টার তার জীবনে অনেকটা জায়গা জুড়ে বসে আছে। ওই মধ্যবয়স্ক মানুষটার কাছে তার বুঝি ঋণের শেষ নেই।

আলো কমে আসা পৃথিবীতে কালচে দেখায় ঘাসের শরীর। মৃদুমন্দ বাতাসে সোনাঝুরি গাছ থেকে ঝড়ে পড়ে সোনার কুঁচি। এই গাছগুলো দশ বছর আগেও বুঝি তাদের এলাকায় ছিল না। গ্রামের মুরুব্বিরা বলে, এগুলো নাকি বাইরের গাছ। গাছ যেখানকারই হোক না কেন মাটি ছুঁয়ে থাকে শেকড়। মাটির রস তার শরীরকে পুষ্টি যোগায়।

জীবন মাষ্টার সবসময় কাজের মধ্যে ডুবে থাকে। সুদামের পায়ের শব্দ পেয়ে সে মুখ তুলে তাকায়। চলন্ত মেসিনের চাকা হাত দিয়ে থামিয়ে দিয়ে শুধায়, কী ব্যাপার সুদাম, কী মনে করে?

সুদামের চোখে বাড়তি আনন্দ, কাকা, আমি মাছখটীতে চলে যাব, তোমাকে খবরটা দিয়ে গেলাম।

সেকি রে, হঠাৎ চলে যাবি যে, কেন গ্রাম বুঝি ভাল লাগছে না?

না, তা নয়। সুদাম ভেবে নিয়ে বলল, বিয়ে-থাওয়া করেছি, কিছু তো একটা করতে হবে। গ্রামে থেকে কি আর করব বলো—তাই চেষ্টা করছি গ্রাম থেকে গিয়ে যদি ভাগ্য ফেরাতে পারি।

ভাল কথা। ঘরে কে-কে থাকবে?

কেন, মা আর জবা।

নতুন বউকে একা ফেলে চলে যাবি?

কেন মা থাকছে তো? মা-ই জবার আগলদার। ওদের কোন অসুবিধা হবে না। আমি হপ্তায়-হপ্তায় এসে দেখে যাব। সুদাম নিশ্চিন্ত গলায় বলল, তাছাড়া তোমরা তো আছ। দায়ে-অদায়ে তোমরাই দেখবে।

সে আমরা দেখব কিন্তু—। জীবন মাষ্টারের কথা আটকে গেল, আমি তোর মাকে নিয়ে ভাবছি না, তোর বউকে নিয়ে ভাবছি। কাঁচা বয়সের মেয়েছেলে কখন কি ভুল করে বসে বোঝা দায়। সব চাইতে ভাল হয় যদি তুই ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যাস।

তা সম্ভব নয়। সুদাম মুখ নিচু করে দাঁড়াল, জবা যাবে না। মাছখটীর পচা গন্ধ ওর ভাল লাগে না।

ওঃ, এই কথা! তাহলে ও দীঘার পাড়ে থাকত কি করে?

সে আমি জানি না। তবে একটা কথা মান তো? যে যায় লঙ্কায় সে হয় রাবণ। কাক যদি পেছনে ময়ূরের পাখনা লাগায়, নিজেকে ময়ূর ভাবে তাহলে কার কি করার আছে বল?

জীবনমাষ্টার অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল, তারপর কপালে ভাঁজ ফেলে বলল, দিনকাল বড় বদলে যাচ্ছে রে! এখন আমারও মানুষ চিনতে ভুল হচ্ছে। একটু চোখ-কান খোলা রেখে না চললে পদে পদে হোঁচট খেতে হবে। বুঝলি?

সুদাম বাইরের দিকে তাকাল। মনে হাজার চিন্তা। কোনটাকে সে সামলাবে? সে মাছখটীতে গেলে জবাকে একা থাকতে হবে এখানে। এটা ভাল দেখায় না। নতুন বউয়ের উপর চাপ সৃষ্টি করা। এছাড়া তার কিছু করারও নেই। জবা যেতে চাইলে তাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া ঝামেলা। বালিয়াড়ির আবহাওয়া ভাল নয়। সেখানে নোনা হাওয়ায় মানুষের শরীরের খিদে বাড়ে। কেউ সুযোগ পেলে পাপ কাজ করতে ভয় পায় না। দীঘার সমুদ্রধারে প্রতিনিয়ত কত ঘটনা ঘটছে। কেউ বান্ধবীকে খুন করে পালিয়ে যাচ্ছে গোপনে। পরে পচা লাশের গন্ধে টের পাচ্ছে মানুষ। পুলিশ আসছে। তাদেরও কিছু করার নেই। আসলে সবখানেই মানুষ বদলে গেছে ভেতরে এবং বাইরে। অসৎ হাওয়া বইছে চতুর্দিকে। সে হাওয়া ঠেকাবে কে? সুদামের মুখে দুঃখের ছায়া বাড়ল। সে বেরিয়ে এল দোকান থেকে। জীবন মাষ্টার ঘাড় তুলে তাকাল, আবার আসিস। তুই এলে ভাল লাগে। দুটো কথা বলা যায়। আজকাল কথা বলারও লোক নেই। ফুড়কুনীর বিয়ে হয়ে

যাওয়ার পর আমি খুব একা হয়ে গেছি। ও এত কাছে থাকে তবু ওর বাড়িতে যেতে আমার ভাল লাগে না। গেলে যে ও খাতির-যত্ন করে না তা নয়। তবু যেতে ইচ্ছে করে না।

জীবন মাষ্টারের চাপা দুঃখের গভীরতা মাপার চেষ্টা করল সুদাম। পারল না। সে নিজেও কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেল। ফুড়কুনীর দুঃখী মুখের আদল তাকে নাড়িয়ে দিল। মানুষ কি চায় আর কি পায়—এই হিসাব কে করবে? ফুড়কুনী ভেবেছিল তাপস মাষ্টারকে নিয়ে সে সুখে জীবন কাটাবে। কিন্তু তা হল না। এখন সারা দিন ঘরের মধ্যে একা বন্দী থাকে ফুড়কুনী। বাইরে বেরয় না লজ্জায়। সে বিষ খেয়েছিল আত্মহত্যার জন্য এখবর সবাই জানে। বাজারের অনেকেই জেনে গেছে তাদের পারিবারিক অশান্তির কথা। তাপস মাষ্টার যে অন্য মহিলার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে কানাঘুষো এটাও জেনে গেছে অনেকে। কোন বিশেষ দরকারে ফুড়কুনী বাজারে এলে অনেকেই তার দিকে কেমন করুণার চোখে তাকায়। যেন ওরা তাকে দয়া করছে। এসব চাহুনি ফুড়কুনীকে শান্তি দেয় না, মরমে মরে সে। মুখ তুলে সে কারোর চোখের দিকে তাকাতে পারে না। ঝটপট কাজ সেরে ঘরে এসে হাঁপায়। ফুঁপিয়ে ওঠে তার সমগ্র সত্তা।

আলো কমে আসা পৃথিবীতে এখন অশান্তির কোন বীজ নেই। সুদাম রাস্তা পেরিয়ে মাঠে এসে দাঁড়াল। ফুড়কুনীর কাছে একবার যাওয়া দরকার। ভাবল সে। তাপস মাষ্টার ঘরে নেই, কলকাতায় গিয়েছেন। কবে ফিরবে জানে না সুদাম। ফুড়কুনীর সঙ্গে তার এর মধ্যে দেখা হয়নি। সে নিজেও চেষ্টা করেনি দেখা করার। পুরনো সম্পর্ক ঝালিয়ে নিতে তার ইচ্ছে হয় না। তবে আজ সে কিসের টানে হাঁটছে? মাছখটীতে যাওয়ার আগে তার মন উতলা হয়ে উঠেছে ফুড়কুনীর জন্য।

সুদাম মাঠ পেরিয়ে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। কড়া নাড়ল মৃদু।

রান্নাঘরের কাজে ব্যস্ত ছিল ফুড়কুনী, ভেজা হাতে সে এসে দরজা খুলে দিল। চোখে মুখে জোয়ার আসা বিস্ময়, ভেতরে এসো। আমি ভাবতেই পারছি না, তুমি এখানে আসবে।

সুদাম কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলল, ক'দিন থেকে ভাবছি আসব কিন্তু আর আসা হয়ে উঠছে না।

কোন দরকার আছে বুঝি? ফুড়কুনী কাঠের চেয়ারটা এগিয়ে দিল সুদামের দিকে, বসো, কতদিন পরে তোমাকে দেখলাম। রোজই দূর থেকে দেখি, আজ কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হল।

সুদাম বিষণ্ণ হেসে তাকাল, আমাদের দেখা না হওয়াই মনে হয় ভাল।

কেন একথা বলছ?

তাপস মাষ্টার আমাদের পুরনো সম্পর্কের কথা সব জানে। কিছু যদি মনে করে—

ওর মনে করা না করায় আমি আর ভয় পাই না। কেন ভয় পাব বলতে পার? ফুড়কুনী ধীরে ধীরে তেতে ওঠা লোহার মত লাল হয়ে উঠল, যার নিজেরই কোন চরিত্রের ঠিক নেই, সে আবার কোন গলায় অন্যকে শাসন করবে? আমাকে তোমার

ব্যাপারে কিছু বলতে এলে আমিও মুখের মাপে জবাব দিয়ে দেব। সেদিন বুঝবে কত ধানে কত চাল হয়।

সে তোমার স্বামী। তার উপর তোমার এমন মনোভাব শোভা দেয় না। সুদাম বুঝিয়ে বলল, সব সংসারে ভুল বোঝাবুঝি, অশান্তি আছে। সেটাকে বড় করে দেখলে ক্ষতি হয়।

আমি সব জানি। আমাকে আর বোঝাতে এসো না। ঝাঁঝিয়ে উঠল ফুড়কুনী, সহসা তার ঠোঁট কেঁপে উঠল কান্নায়, আমি আর কত সহ্য করব বলো? সব মানুষের সহ্যের একটা সীমা আছে। ও এখন সীমার বাইরে। জান ও কি করে বেড়াচ্ছে?

ফুড়কুনীর চোখের দিকে তাকিয়ে বোবা হয়ে গেল সুদাম। ওর জ্বালা-যন্ত্রণা ছাপিয়ে ফুড়কুনীর সমস্যা তাকে ভাবাল। তবে এরকম পরিস্থিতিতে তাপসমাষ্টারের বিরুদ্ধে একটা কথা বলা মানে আগুনে ঘি-ঢালার সমান। সুদাম কখনই ফুড়কুনীর কাছে ছোট হবে না। সে নিস্তেজ ভাবে বলল, তাপসমাষ্টার কোথায় কি করছেন সেটা তোমার না দেখলেও চলবে। পুরুষমানুষকে নানা জায়গায় যেতে হয়, নানা ধরণের মানুষের সাথে মিশতে হয়। না মিশে তার উপায় নেই।

তুমি আমাকে সান্ত্বনা দিতে চাইছ? ফুড়কুনী বলল, আমি অনেকভাবে ভেবেছি। ভেবে কোন উত্তর পাইনি। তবে একটা কথা জেনে রাখ—শয়তানের সঙ্গে মানুষের কোনদিন সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে না। শয়তান আর মানুষ পাশাপাশি থাকতেও পারে না। আমি এখন যার সঙ্গে ঘর করি তার গায়ে মানুষের চামড়া। কিন্তু ভেতরে সে একটা হিংস্র পশু। ফুড়কুনী কোন সুযোগ না দিয়ে পিঠের কাপড় সরিয়ে দেখাল, ভাল করে দেখ, কি অবস্থা করেছে সে আমার! কলকাতায় যাওয়ার আগে সামান্য কথা নিয়ে অশান্তি হল। আমার শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না। শুধু কথার মধ্যে বলেছি—দু'দিন পরে গেলে হয় না। একথা শুনে সে পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া করল। মারধোর করে বলল, ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে। অত রাতে আমি কোথায় যাব, তাই থেকে গেলাম। এটাকে সে আমার কমজোরী বলে ভাবছে। সে যা ভাবে ভাবুক আমি তা ভাবি না। কোথাও না যেতে পারলে আমি একটা জায়গায় অবশ্যই যেতে পারি। ফুড়কুনী ঘাড় তুলে শূন্যের দিকে তাকাল।

সুদাম ভয় পেয়ে চোখ নামিয়ে নিল। ফুড়কুনীর পিঠে যে আঘাতের চিহ্ন তা যেন তার পিঠে উঠে এসেছে। ব্যথায় শিউরে উঠল সুদাম, ছিঃ ছিঃ, এমন ভাবে কেউ কাউকে মারে নাকি? মাষ্টার আসুক, আমি তাকে বলব।

না, তুমি কিছু বলবে না। কঠিন হয়ে এল ফুড়কুনীর চোখ-মুখ, আমি চাই না, তুমি ঐ পশুটার কাছে ছোট হয়ে যাও। ও তোমাকে বিষ নজরে দেখে। ও তোমাকে হিংসা করে। আমার মুখে তোমার প্রশংসা শুনলে ও নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না। তোমাকে ছাড়াতে থানায় গিয়েছিলাম—এটা শুনে ও কি বলল জানো—লায়লা-মজনু। আমি কলকাতায় গেলে তোমাদের তাহলে চলছে ভাল। যার মন এত নোংরা, তাকে সোডায় কাচলেও পরিষ্কার হবে না।

সুদাম অপ্রস্তুত। এই রামায়ণ শোনার জন্য সে এখানে আসে নি। সব কিছুর মূলে

সে জড়িয়ে আছে এই ভেবে তার খারাপ লাগল। সাদা দেওয়ালে কালি ছিটিয়ে দেওয়ার মত নিজেকে তার বিসদৃশ মনে হল। সে মনে প্রাণে চাইল ফুড়কুনীকে বোঝাতে, তাপস মাষ্টার আমাদের মেলামেশার কথা সব জানেন। ওঁর মনে সন্দেহ হতেই পারে। ও যাতে আর ভুল বুঝতে না পারে—তার জন্য তোমার একটু সতর্ক থাকা দরকার। সুদাম থামল, ঢোক গিলে মাথার চুলে হাত বোলাল বার কয়েক, ফুড়কুনীকে তার শান্ত করা দরকার, এই ভেবে বলল, তাপস মাষ্টার যা পছন্দ করেন না তা তুমি কোনদিনও করবে না। স্বামীকে সুখে রাখার জন্য যা যা করা দরকার—তুমি তা করো।

আমিই সব করব, ওর কি তাহলে কোন দায়িত্ব নেই?

দায়িত্ব দু'জনার। কেউ একটু বেশি করে, কেউ একটু কম। এই কম-বেশি নিয়ে ভাবলে জীবন অচল হয়ে যাবে।

জীবন আর অচল হতে বাকি কোথায় আছে? ফুড়কুনীর গলা ভারী হয়ে এল, সুখ-শান্তি শুধু মেয়েমানুষের একার কুক্ষিগত নয়। একজন ক্রমশ পাঁকে তলিয়ে যাবে—তাকে তুমি কতই বা টেনে তুলবে? আমি আর পারছি না। আমার শক্তি সব ফুরিয়ে গিয়েছে। হাল ছেড়ে দেওয়া ফুড়কুনীর বুক কাঁপিয়ে দীর্ঘশ্বাস নেমে এল। ভেতর থেকে ঠেলে উঠল কান্না। সে সুদামের কাছে কাঁদতে চায় না, তবু ভিড় করে আসে কান্না। সুদাম সেই ভেজা চোখের দিকে তাকিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, মেয়েদের সহ্য করার শক্তি অনেক বেশি। আমার বিশ্বাস তুমি অল্পতে ভেঙে পড়বে না। তাপসমাষ্টারকে সব বুঝিয়ে বলো। তিনি শিক্ষিত মানুষ। সব বুঝবেন—

এমন উপদেশ আমাকে বাবাও দিয়েছে। তাকে আমি পিঠে দাগ দেখাতে পারিনি। সে তো অনেক আশা করে আমার বিয়ে দিয়েছিল। বিয়ের আগে স্বপ্ন দেখে আমিও পাগল হয়ে গেলাম। এখন বুঝতে পারছি যে স্বপ্ন আমি দেখেছি তা সত্যি ছিল না। আসলে কাউকে কাঁদিয়ে সুখী হওয়া যায় না। আমি ভেবেছিলাম ভগবান নেই। ভগবান যে আছে, বিয়ের তিন মাসের মধ্যে বুঝতে পারলাম। যখন বুঝলাম তখন বিষের শিশি ছাড়া আমার কাছে আর কোন রাস্তা খোলা ছিল না! আঁচলে বারবার করে চোখের জল মুছে নিল ফুড়কুনী। তার ফর্সা মুখে নেমে এল বিষাদের ছায়া। মুখ ঝুঁকিয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকল মেঝের দিকে তাকিয়ে। তার চোখের নীচের কালিগুলো ছড়িয়ে পড়ল পুরো মুখে। মাত্র ক'মাসেই কত রোগা হয়ে গেছে সে। অথচ সবাই বলে বিয়ের পরে মেয়েদের শরীর নাকি উপচে পড়া নদীর চেয়েও সুন্দর হয়ে ওঠে। সুদাম কষ্টে পেল। সেই সঙ্গে তার রাগ হল তাপস মাষ্টারের উপর। সব জেনে যে বিয়ের পিঁড়িতে বসল জেদ করে এখন তার পিছু হটা ভাল লাগল না সুদামের। ফুড়কুনী সুখী হোক সে এখনও মনে-প্রাণে চায়। যাকে ভালবাসা যায় তার হাসি মুখ দেখলে আয়ু বাড়ে ব্যর্থ প্রেমিকের।

সুদাম কিছু বলার আগেই ফুড়কুনী বলল, আমি সেই তখন থেকেই শুধু নিজের কথা বললাম। তুমি বসো। আমি চা করে আনি।

ফুড়কুনী রান্নাঘরের দিকে চলে যেতে উদ্যত হলে সুদাম বলল, চা আমি খেয়েই

এসেছি, এখন আর চা খাব না। আমি একটা বিশেষ কথা বলার জন্য তোমার কাছে এসেছি। এখন ভাবছি-কথাটা বলা উচিত হবে কিনা!

ফুড়কুনী সরে এল কাছে, ছায়াঘন ব্যথিত চোখে তাকাল সুদামের দিকে, এত কিছুর পরেও তুমি আমাকে নিজের ভাবছ—ভাবতে ভাল লাগছে। যা বলার জন্য এসেছ—বলে ফেল। যদি না বলে চলে যাও তাহলে এই চিন্তাতে আমি আরো শুকিয়ে যাব।

সুদাম ভাবল কিছু সময়, তারপর নীচু গলায় বলল, এ গ্রামে আমার কোন কাজ নেই। আমি লোকের বাড়িতে জন-মজুর খাটতে যেতে পারি না। মাছের ব্যবসাটাও উঠে গেল। পুরনো সাইকেলটাও পেলাম না। ওটা সেদিন দীঘার রাস্তায় হারিয়ে গেল। পরে খোঁজ করে আর পাইনি। এত অসুবিধা তবু তো বাঁচতে হবে? আমি ঠিক করেছি জুনপুটের মাছখটীতে চলে যাব। বাবাও আমার সঙ্গে যাবে। শুধু জবা আর মা থাকবে ঘরে। আমি আবার চার মাস পরে আসব। তাই যাবার দিন যদি না আসতে পারি সেইজন্য আগাম এসে দেখা করে গেলাম।

ফুড়কুনী মন দিয়ে শুনল সব, তারপর রক্তহীন স্বরে বলল, তুমি চলে যাবে আমাকে ফেলে? পারবে? আমি তোমার সাহসে এখানে আছি—এটা নিশ্চয়ই তুমি জান না?

সুদাম বিব্রত বোধ করল, আমাকে যেতেই হবে। নকুলের সাথে কথা হয়ে আছে।

কাউকে কথা দিয়ে এখানে কেন এসেছ? এখন তোমার কাছে আমার চেয়েও নকুলের দাম বেশি। সে তোমাকে উপার্জনের পথ দেখাচ্ছে। ফুড়কুনী পাগলের মত বলল, যাবে যখন স্থির করেছ তখন এখানে না এলেই পারতে! আমি কে হই তোমার? পরস্ত্রী ছাড়া তো আর কিছু নই? তবু শুনে রাখো—তোমার জন্য আমার মন কাঁদে। জানি ভুল করেছি, সেই ভুলের কোন ক্ষমা নেই। এ-ও জানি—কেউ ক্ষমা না করলেও তুমি আমাকে ক্ষমা করেছ। সবাই ছেড়ে পালিয়ে গেলেও, আমি জানি—তুমি আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না। এই বিশ্বাস নিয়ে আজও আমি বেঁচে আছি।

সুদাম কি বলবে কিছু ভেবে পেল না। শুধু অসহায় চোখ মেলে তাকাল ফুড়কুনীর মুখের দিকে। ঘাড় ঝুঁকিয়ে, উদাসী চোখ মেলে ফুড়কুনীও তাকিয়ে আছে সুদামের ভাষা হারিয়ে ফেলা চোখের দিকে। সংকোচ-জড়তায় ভরা সেই পুরুষচোখ একদা যে প্রেমে হাবুডুবু খেত তা এখন আর শত চেষ্টা করেও খুঁজে পেল না ফুড়কুনী। পাড় বাঁধানো পুকুরের চেয়েও শান্ত ধীর-স্থির সুদামের চোখ। শুধু চোখ নয়, পুরো শরীর বুঝি আঘাত, অবহেলা আর অপ্রেমে নিস্তেজ হয়ে গেছে কবে। এর জন্য ফুড়কুনী দায়ী ভাবল নিজেকে, আমার জন্য নিজেকে আর কষ্ট দিও না। তাহলে কষ্ট আরও বাড়ব। জবা সুখী হলে ভাববে-আমিও সুখী হয়েছি। তুমি ওর মধ্যে আমাকে দেখো। তোমার সব দুঃখ তাহলে জুড়িয়ে জল হয়ে যাবে।

সুদাম কিছু না বলে বেরিয়ে এল ঘর থেকে, ফুড়কুনী তার পেছন পেছন এল। কিছুটা গিয়ে আবার ফিরে তাকাল সুদাম, কিছুটা কঠিন গলায় বলল, নিজেকে কষ্ট দেওয়া পাপ। আমাকে যদি একদিনের জন্য মনে জায়গা দিয়ে থাকো তাহলে এবার থেকে নিজেকে কখনও একলা ভেব না। তাহলে দেখবে মনের জোর আরও বেড়ে গেছে। কেউ তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলার সাহস পাবে না।

ফুড়কুনী কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল, বুকের ভেতর থেকে ঠেলে উঠল কত কথা, তবু সে মুখ ফুটিয়ে কিছু বলতে পারল না। আকাশের ছায়ায় সে দাঁড়িয়ে থাকল একলা গাছের মত।

॥ বাইশ ॥

সোনাঝুরি গাছের তলায় বাস থামে।

গাদাগাদি ভিড়ে বাসে লটবহর নিয়ে উঠে পড়ল ভরত। তার জীবনে ভয় বেশি। ঘর ছাড়ার আগে বারবার করে সে শীতলা বুড়িকে বলল, মাছখটীতে যাচ্ছি, ভালোয় ভালোয় যেন ফিরে আসতে পারি, মা।

যোগমায়া একপাশে দাঁড়িয়েছিল, তার দিকে কোন খেয়াল নেই ভরতের। যাওয়ার সময় কিছু বলে গেলে খুশি হত যোগমায়া। কিন্তু বাসে ওঠার ব্যস্ততায় সেই সৌজন্যতাটুকু ভুলে গেল ভরত। ভিড়ের মধ্যে সিঁধিয়ে গিয়ে ভরত খুঁজছিল সুদাম আর নকুলকে। ওদের দেখতে না পেয়ে ঘাবড়ে গিয়ে ঘামতে শুরু করল সে। কিন্তু ভিড়বাসে ঠেলে যে বাইরে আসবে তারও উপায় নেই। ফলে অসহায়ভাবে সে দাঁড়িয়ে থাকল যাত্রীদের গায়ে গা লাগিয়ে। তার কাপড়ের পোটলা, বিছানাপত্তর, হাঁড়িকুঁড়ি সব বাসের মাথায় তুলে দিয়েছে হেল্পার। তবু তার শান্তি নেই। মালগুলো যদি কেউ নামিয়ে নেয়— তাহলে ঢাকের দায়ে মনসা বিক্রি হবার যোগাড় হবে। ভরত ভিড় ঠেলে আবার বেরিয়ে এল গেটের কাছে। যাত্রীরা বিরক্তিবোধ করল তার গুঁতোগুঁতিতে। আর সেই সঙ্গে রীতিমত হাঁপিয়ে উঠল ভরত। তার গলা শুকিয়ে শুরু হল চাপা কষ্ট। তবু সে গেটের সামনে এসে খালাসিকে শুধোল, আমার বেটা দুটো উঠেছে তো ভাই?

বাসের খালাসি ড্যাবড্যাব চোখে তাকাল, সবাই উঠেছে, আপনি ভেতরে যান তো দাদু। বেশি ঠেলাঠেলি করলে বাস থামিয়ে নামিয়ে দেব তখন বুঝবেন ঠ্যালা! ভরত জড়োসড়ো হয়ে এক পাশে সরে দাঁড়াল। কিন্তু যা ঠাসাঠাসি ভিড় তাতে তার ভীষণ কষ্ট হল। বুক চাপা হয়ে সে যেন দম আটকে মরে যাবে এমন মনে হল তার। কষ্ট হলেও নকুল সুদামের চিন্তা তাকে অস্থির করে তুলল।

বাসের খালাসি ভরতের মুখের দিকে তাকিয়ে কি বুঝে বলল, চিন্তা করার কিছু নেই। ওরা ছাদের উপর উঠেছে। অত মাল নিয়ে কেউ কোথাও যায় নাকি? ওরা হাওয়া খাচ্ছে ছাদে, ওদের জন্য চিন্তা না করাই ভাল।

তবু শান্তি পেল না ভরত, সে চুপ করে থাকল। বাস লাইনের লোকের মুখে মিষ্টতা কম। ওরা কাট-কাট কথা বলে। বাসের কন্ডাক্টর হাত পেতে বলল, টিকিট?

ভরত অস্বস্তিতে পড়ল, ছাদে আমার ছেলে আছে, সে ভাড়া দেবে।

কন্ডাক্টর বাসের মধ্যে ঢুকে যেতেই ভরতের যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। এখন কোথাও যেতে আসতে সে বাসের কথা ভাবতেই পারে না। যা বাসের ভাড়া বেড়েছে

তাতে একবেলার ভাত হয়ে যায়। শেষ কবে বাসে চড়েছিল ভরত তা মনে করার চেষ্টা করল সে। মীরা নিরুদ্দেশ হবার পর এদিক-সেদিক খুঁজেছে সে। তখন বাসভাড়া অত কড়া ছিল না। এখন আর মীরাকে নিয়ে তার মনে কোন চিন্তা নেই। অত বড় মেয়ে হুটহাট করে পালিয়ে গেলে সে কি করবে? মেয়েটা তার নিজের ভাগ্য পুট করে নিজের হাতে ভেঙে দিল। গ্রামে পাগল আছে আরো দু'জন, তারা কেউ গ্রাম ছেড়ে পালায় না। বড়জোর পেট বাজাতে বাজাতে বাজার পর্যন্ত আসে, ইস্কুল মাঠে ছোটাছুটি করে, চেয়েচিন্তে খায়—তারপর সাঁঝ নামলে যে যার ঘরে ফিরে যায়। মীরার পাগলামীটা অন্য ধাঁতের। ও ভাল হওয়ার নয়। তবু সুদাম কম চেষ্টা করেনি। মাদুলি, তাবিজ আর শেকড়-বাকড়ে ভরে আছে তার ফর্সা শরীর। মেয়েটার কথা মনে পড়তেই ভরত আবার কষ্ট পেল। তার যেন কষ্ট পাবার শেষ নেই। সংসারের খুঁটিকেই ঘরের পুরো ভার সামলাতে হয়। মাত্র দশ কাঠা জমিতে কি হয় আজকাল! এতে নুন আনতে পান্তা ফুরোয়।

মাছখটীতে যাবে বলে ক'দিন রাতে ভালমতন ঘুমাতে পারেনি ভরত। জবা আর সুদাম বড় ঘরে শোয়। ওদের চাপা কথাবার্তা কানে আসে প্রায়ই। রাত গভীর হলে ওদের ঝগড়া বাড়ে। তখন যোগমায়া মন খারাপ করে বলে, শুনছো, ওরা আবার ঝগড়া করছে। মনে হয় সারা রাত ঝগড়া করে কাটিয়ে দেবে। আমি কি একবার যাব।

না, যাওয়ার দরকার নেই। তুমি যদি যাও তাহলে ওরা খারাপ ভাববে।

ভাবুক। তা বলে এত অশান্তি ভাল লাগে না। যোগমায়ার কণ্ঠস্বরে জেদ ফুটে ওঠে, আমাদেরও তো এই বয়সটা ছিল, কই তখন আমরা তো এমন সাপে-নেউলের মত মিশিনি। কী জানি বাপু, আমার খুব ভয় করে। কী মনে হয় জান, ঘরে বউমা বুঝি ভাল হয়নি। দীঘার হোটেল চালান মেয়ে আর কত ভাল হবে?

ভরত থামিয়ে দিত যোগমায়াকে, চুপ করো। শুনতে পাবে যে—

বাসের মধ্যে হাজার চিন্তা কোনঠাসা করে দিল ভরতকে। সুদামের জন্য তার বুকটা হাহাকার করে উঠল। বউ-ছেলের রাত দিনের বিবাদ ভাল লাগে না তারও। লোকের কানে গেলে হাসবে। হাজার বলা সত্ত্বেও জবা সোনাঝুরি গাছের তলায় এল না। জেদে মাটি আঁকড়ে ধরল পা। সুদাম ভ্রুক্ষেপহীন। সে হেঁটে এল বাসরাস্তা পর্যন্ত। পিছন ফিরে তাকাতেই সে দেখল জবা নেই, চলে গিয়েছে ঘরের মধ্যে। স্ত্রীর এই অনীহা সুদামকে মোটেও সুখ দিল না। সে যা চেয়েছিল তা পায়নি জবার কাছে। জবার আর দেওয়ার মত কিছু নেই তার কাছে। সে ভিখারী হয়ে গেছে মনে মনে। অথচ সুদাম তাকে সবকিছু দেওয়ার চেষ্টা করে। তার এই চেষ্টায় ফাঁকি নেই। তবু বুঝতে চায় না জবা, সে মুখ ভার করে বলে, আমার আলাদা সংসার চাই। যদি দিতে না পারো তাহলে আমাকে রেখে আসব চল। আমার আর ভাল লাগছে না এখানে।

গ্রামে প্যাঁচপেঁচে কাদা। পা পিছলে পড়ে যাবার ভয়। সুদাম তবু জবার জন্য ছাই আর মোরাম ফেলেছে উঠোনে। এতে কাদা কম হয়। পায়ে হাজা লাগে না। যে ছেলে কুটোটি ভেঙে দুটো করত না তার এই হঠাৎ পরিবর্তন ভরতকে ভাবায়।

যে খাটতে চাইছে তাকে সুযোগ করে দেওয়া দরকার। নাহলে অধর্ম হবে।

মাছখটীতে যাওয়ার জন্য ভরতের টানাপোড়েন ছিল মনের ভেতর। যোগমায়া তার প্রধান কারণ। তাকে ছেড়ে ভরত এই মধ্যবয়সেও কোথাও গিয়ে সুখ পায় না। যোগমায়া মুখ ফুটিয়ে কিছু না বললেও ওর নীরব অশান্ত চোখ দুটো সব কিছুই বলে দেয় অকপটে। ডাল-চাল, হাঁড়িকুঁড়ি, কাঁথাকানি, গায়ের চাদর, এমন কী দাঁতনের জন্য নিমকাঠি সবই যোগাড় করে দিয়েছে যোগমায়া। রান্নার জন্য হৈমবুড়িকে সঙ্গে নিয়েছে নকুল। এ সংসারে হৈমবুড়ির মুখ থুবড়ে পড়া চালা ঘরখানা ছাড়া আর কিছু নেই। একসময় তার সব ছিল, এখন সে ভিক্ষা বৃত্তিতে জীবনধারন করে। তাকে মাছখটীতে যাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল ভরত নিজে। বলার সাথে সাথেই রাজি হয়ে গেল হৈমবুড়ি। বাইরে বেরবার মত তার কোন ভাল শাড়ি ছিল না, নকুল তার জন্য কিনে দিয়েছে কালো ইঞ্চি পাড় শাড়ি। হৈমবুড়ি নতুন শাড়ির গন্ধে ঠোঁট ভরিয়ে হেসেছিল, সে আশীর্বাদ করে বলেছিল, তোদের মনোবাসনা পূর্ণ হবে। যে গরীবকে দেখে তাকে দেখার জন্য ওপরওলা বসে আছে। হৈমবুড়ি প্রথম গেটে উঠেছে। মেনকা তাকে প্রথম গেটে ঠেলে ঢুকিয়ে দিয়েছে। নাহলে সে উঠতেই পারত না। মেনকা যদি অসুস্থ আর গর্ভবতী না হোত তাহলে সে নিজে যেত মাছখটীতে। মাছবাছার কাজ পুরুষের একার কাজ নয়। মেয়েরা একাজে দক্ষ। ....কাজে লাগে।

বাস ফাঁকা হয়ে গেল পানিপারুলে। ভরত দেখল হৈমবুড়ি বসার জায়গা পেয়েছে। সে ভরতকেই খুঁজছিল। চোখাচোখি হতেই বুকে বল পেল সে। ভরতের বুক চাপা অস্বস্তিকর অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। সে একবার ভাবল বাস থেকে নেমে সুদাম অথবা নকুলের সঙ্গে কথা বলে নেবে। কিন্তু তা আর হল না, বাস ছেড়ে দিল ঘন্টা বাজিয়ে। পিচ রাস্তার দু'পাশে মাঠ ভরা ধান দোল খায় হাওয়ায়। ধান গাছে রঙ ধরেছে। বড় পুজোর আগেই এবার অনেক মাঠে ধান উঠে যাবে। মা দুর্গা এবার দেরীতে আসছেন। তার আগেই শীত পড়ে যাবে। এখনই ভোরবেলায় গায়ে চাদর নিতে হয়। গাছের পাতায় শিশিরের ছোঁয়া নজর পড়ে।

রামনগরে বাস এসে থামতেই একদল লোক হৈ-হৈ করে ছুটে এল। কিছু দূরে একটা লাইনের বাস টায়ার ফাটিয়ে পড়ে আছে। ভরত কাউকে গুরুত্ব না দিয়ে নেমে এল। আগে থেকে কথা ছিল তারা রামনগরে নেমে জুনপুট যাওয়ার জন্য বাস ধরবে। ভরত নামার আগে দেখল হৈমবুড়ি তখনও বসে আছে গ্যাট হয়ে। ভরত গলা চড়িয়ে বলল, দিদি, নেমে পড়। আমরা এখান থেকে আবার বাস ধরব।

ভরত নেমে আসার আগেই ছাদ থেকে নেমে এসেছে সুদাম আর নকুল। ওরা বোঁচকাবুঁচকি রাস্তার একধারে রাখল। হৈমবুড়ি সামান্য খুঁড়িয়ে হাঁটে। সে অকারণে হেসে উঠে রাস্তার এক পাশে গিয়ে বসল। ভরত বিরক্ত হয়ে বলল, এত ভিড় বাসে না উঠলেই ভাল হোত। আমার জীবনটা চাপাচাপিতে আর একটু হলে বেরিয়ে যেত।

তার কথা শুনে হাসল নকুলও। পকেট চিরুনিতে মাথা আঁচড়িয়ে সে বলল, খালি বাস তুমি কোথায় পাবে? এ লাইনের সব বাসে গাদাগাদি ভিড়। বাস যেমন বেড়েছে

তেমন মানুষও বেড়েছে প্রচুর। তবু দেখ ভিড়ের কোন কম নেই। সুদামের গলা শুকিয়ে গিয়েছিল খোলা হাওয়ায়। তার চোখ মুখ এমন কী মাথার চুল উসকোখুসকো। সে পাঁচ আঙুলকে চিরুনি বানিয়ে মাথা আঁচড়াল। তারপর এদিক সেদিক দেখে নিয়ে বলল, বাস আসতে দেরী আছে। তার আগে চা খেলে শরীরটা ঝরঝরে হোত।

নকুল সায় দিল সুদামকে, তাহলে আর দেরী কেন, যাওয়া যাক।

ওরা চা-দোকানে গেল। হৈমবুড়ি থাকল মালপত্তর পাহারা দেওয়ার জন্য। সে জড়োসড়ো হয়ে বসেছিল পোঁটলাগুলো আঁকড়ে ধরে। তার জন্য কাপ ভর্তি চা নিয়ে গেল ভরত, সঙ্গে দুটো বিস্কুট। এতটা আশা করেনি হৈমবুড়ি, গ্রামে থাকতে এই ভরতই তার সঙ্গে কথা বলত না। আসা-যাওয়ার পথে দেখা হলে মুখ ঘুরিয়ে চলে যেত। বাইরে বেরলে মানুষের অনেক পরিবর্তন ঘটে।

চা খেয়েও ওরা আবার ফিরে এল বাসস্ট্যাণ্ডে। কাঁথি যাবার বাস অনেক কিন্তু জুনপুট যাবার থ্রু বাস কম। সুদাম অধৈর্য হচ্ছিল। সে নকুলকে জোর করল, চল, কাঁথি পর্যন্ত চলে যাই। ওখান থেকে জুনপুটের বাস তাড়াতাড়ি পাওয়া যাবে।

নকুলের ইচ্ছে থাকলেও ভরতের এ প্রস্তাবে মত নেই। বারবার ওঠা-নামা তার পছন্দ নয়। এতে মেহনত বেশি হয়, ভাড়াও বেশি লাগে। ঝাড়া হাত-পা হলে কোন ক্ষতি ছিল না কিন্তু এত মালপত্তর চট করে কেউ বাসে ওঠাতে চায় না। খেজুরপাতার পুরনো তালাইগুলো দেখে বাস-খালাসি বলে, ভেতরে হবে না ছাদে ওঠো। ছাদে ওঠার ঝুঁকি অনেক। বাস যে গতিত ছোটে, গাছের ডালে মাথা বাঁচান রীতিমতন সমস্যা হয়। এছাড়া আছে ইলেকট্রিক তারের অত্যাচার। এখন মাকড়সার জালের মত এদিক-সেদিক চলে গিয়েছে বিদ্যুৎ-এর তার। ছোঁয়া লাগলে বিপদ ঘটার সম্ভাবনা।

ভাগ্য ভাল যে জুনপুটের বাস এসে থামল রামনগরে। বাসে তেমন ভিড় নেই। তবু ভেতরে জায়গা হল না ওদের। হৈমবুড়ি আর ভরত যথারীতি ভেতরে গেল, সুদাম আর নকুল জিনিসপত্তর নিয়ে ছাদে বসল। বাস ছুটছে হরিণ গতিতে। যে কোন সময় উল্টে যেতে পারে। সুদামের ভয় করছিল। খোলা হাওয়া চাবুকের মত আছড়ে পড়ছিল শরীরে। হাওয়ার এত শক্তি যেন চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে। এত হাওয়ায় নকুল কায়দা করে বিড়ি ধরাল। বিড়িতে দম দিয়ে বলল, ঘরের কথা মনে পড়ছে। মেনকার শরীরটা ভাল নেই।

সুদাম তার দিকে তাকাল, চিন্তা করে কি হবে? তোর মা তো আছে। সে সব দেখবে।

মা'র বয়স হয়েছে, এখন আর বেশি দৌড়ঝাঁপ করতে পারে না। ওদের সঙ্গে আনলে মনে হয় ভাল হোত। নকুলকে বড় চিন্তিত দেখাল।

চিন্তার মত ছোঁয়াচে কোন কিছু নেই। সুদামও অন্যমনস্ক হয়ে গেল মুহূর্তে, জানিস জবা আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করছে না। ও যে কী চায়, আমি তা বুঝতে পারছি না। বিয়ের পরে মেয়েরা বড় পাল্টে যায়।

নকুল সব শুনে দূরের দিকে তাকাল, কেউ যদি মনে মনে ভাবে সংসার করবে

না তাহলে তোরই বা কি করার আছে। বউয়ের মন রাখার জন্য বাবা-মাকে তো জলে ভাসিয়ে দেওয়া যাবে না। জবা ছেলেমানুষ। আমার মনে হয় বয়স হলে, অভিজ্ঞতা বাড়লে এই সমস্যা দূর হয়ে যাবে।

সুদামের মুখে কোন কথা নেই, সেও তাকিয়ে আছে খোলা মাঠের দিকে। যতদূর চোখ যায় রঙ ধরা ধান মাঠ। মাঠের উপর দিয়ে উড়ে যায় সাদা বক। মাঝে মধ্যে বাঁশবন, ঝোপঝাড়। কখনও বা লোকালয় ছাড়িয়ে বাস ছোটে। বাস যখন জুনপুট পৌঁছাল তখন হাওয়ার গতি বাড়ছিল ধীরে ধীরে। ভেসে এল সমুদ্রের গর্জন। বিশাল জলরাশির টিকি দেখতে পেল সুদাম। এর আগে সে এখানে আসেনি। জায়গাটা দেখার মত। এখানে দীঘার মত বোল্ডার নেই। বাঁ দিকে ঝাউবাগান। ডান হাতে নারকেল গাছের সারি। ওরা হাওয়ায় মাথা দোলাচ্ছে যেন অভ্যর্থনার ভঙ্গিতে। এখানকার বালিয়াড়ি ১০ নম্বর কড়াইয়ের মত গভীর নয়, কাঁসার থালার মত। ঢেউ যা আসে হাত সমান উঁচু। ঢেউ মিশে যায় বালির বুকে। এত শান্ত ঢেউ দীঘায় কোনদিন দেখেনি সুদাম। তার দু'চোখে ভাল লাগার রেশ ছড়িয়ে গেল। নকুল সময় নষ্ট না করে এগিয়ে গেল একটা চেনা-জানা চা-দোকানের দিকে। কী সব কথা বলে সে ফিরে এল, তাড়াতাড়ি চল, আমাদের আসতে দেরী হয়ে গেছে। বালিয়াড়ি ফাঁকা পাব কিনা জানি না। আমরা আসার আগেই আরও বিশটা পরিবার এসে গেছে। ওরা কাজ শুরু করে দিয়েছে।

মৎস দপ্তরের পাকা ঘরগুলো পাশ কাটিয়ে ওরা হেঁটে গেল বালিচড়ায়। হৈমবুড়ির বগলে খেজুরপাতার চাটাই। এছাড়াও সে নিয়েছে হাঁড়িকুঁড়ির বোঁচকাটা। সমুদ্রধারের বাতাস বড় ঠান্ডা। বালিচড়ায় হাওয়া বুঝি পাগলের মত ঘোরে। সুদামের চুল আছড়ে পড়ল মুখের উপর। অস্বস্তি হল সুদামের। তবু এক ধরণের ভালবাসায় ভরে গেল মন। এখানকার সমুদ্র সবাইকে আপন করে নিতে পারে সহজে। এই শান্ত স্নিগ্ধ সমুদ্র কারোর মনে ভয় সৃষ্টি করে না। নকুলের পেছন পেছন বালিয়াড়ির ঝাউবনে ঢুকে এল ওরা। বালিয়াড়িতে চাপাকল বসিয়েছে মাছখটীর লোকেরা। একটা নয়, পরপর অল্প ব্যবধানে দুটো টিউবওয়েল। একটা চা-বাগান হয়েছে ঢোকার মুখে। মুরগি চরছিল। সমুদ্রধারের কুকুরগুলো বড় সেয়ানা। তারা হৈমবুড়িকে দেখে ডেকে উঠল মুখ উর্দ্ধে তুলে। হৈমবুড়ি ভয় পেতেই নকুল তেড়ে গেল কুকুরগুলোর দিকে। ওরা পালিয়ে গেল ঝাউবনের দিকে। পচামাছের গন্ধ ভাসছিল হাওয়ায়। ঝাউবনে আলো কম ঢোকে দিনের বেলায়। সবখানে ছায়াছায়া পরিবেশ। ঝাউয়ের ফল ছড়িয়ে আছে যত্রতত্র। উঁচা বালিয়াড়িতে ফাঁকা জায়গা দেখে মালপত্র নামাল ভরত। একটু ভেবে নিয়ে সে বলল, এ জায়গাটা খারাপ হবে না। আরও এগোনো যেত কিন্তু তাতে মেহনত বেড়ে যেত। এখানে রোদ আসবে। হাওয়াও আছে। আমার মনে হয় এই জায়গাটাই সব চাইতে ভাল।

নকুল ঘাড় ঝুঁকাল, তুমি ঠিকই বলেছ। মাছখটী সমুদ্রের ধারে কাছে হলেই ভাল হয় এতে বাঁকে করে কাঁচা মাছ বয়ে আনার সুবিধা হবে। তাছাড়া এখানকার বালিচড়া

সমতল। মাছ শুকোতে দেবার সুবিধা হবে।

বালিয়াড়িতে অস্থায়ী ঘর উঠল দ্রুত হাতে। ঝাউগাছের খুঁটি হল। চারপাশ ঘিরে দেওয়া হল হোগলায়। ঘরের মাথায় পলিথিন বিছিয়ে দিল নকুল। দড়ি দিয়ে বেঁধে দিল সেই পলিথিন যাতে হাওয়ায় না উড়ে যেতে পারে। খেজুর পাতার চাটাই বিছিয়ে ওরা যখন আয়েশ করে বসল, তার আগেই বালি খুঁড়ে তিন ঝুঁটির চুলা বানান শেষ হৈমবুড়ির। তিনটে আধলা ইট বালির উপর চেপে বসে আছে। নকুল গেল টিউকলে জল আনতে। লোহার বালতি ভরে জল নিয়ে এল সে। হাঁড়ি ধুয়ে রান্না চড়াল হৈমবুড়ি। ভরত শুকনো ঝাউকাঠ কুড়িয়ে আনল আশপাশ থেকে। এখানে কোন কিছুর অভাব নেই। ভাত ফুটল আগুনের ছোঁয়ায়। আলু সেদ্ধ ভাত আর ডিম-ভাজা। প্রথম দিন এর বেশী কেউ আশা করেনি। হৈমবুড়ি টিনের থালায় ভাত বেড়ে দিল যত্ন করে। তার রুগ্ন শরীরের হাসিটাই কেবল সতেজ। সে ঠোঁট ভরিয়ে হাসতে হাসতে বলল, মন্দ লাগছে না জায়গাটা। যেখানে হাওয়া-বাতাস খেলে সেখানে মনের শান্তিতে কাজ করা যায়। দেখ, কত তাড়াতাড়ি রাঁধাবাড়ার কাজ হয়ে গেল।

ওরা পাশাপাশি খেতে বসল চট বিছিয়ে। গ্লাস ভরে জল দিল হৈমবুড়ি। খাওয়া যখন শেষের দিকে তখন দূরের ঝাউবনের দিকে তাকিয়ে বিষম খেল ভরত। মুখ ভর্তি ভাত নিয়ে সে কেমন বিকৃত গলায় বলল, হা দেখ, মীরা দাঁড়িয়ে আছে।

নকুল-সুদাম দেখল মীরা ছুটছে বালিয়াড়ি ধরে সমুদ্রের দিকে। ও পালিয়ে যেতে চায় ওদের নাগালের বাইরে। খাওয়া ফেলে সুদাম দৌড়ে গেল মীরার দিকে।

।। তেইশ ।।

মীরাকে ধরা গেল না অত সহজে।

সুদামও ছাড়বার ছেলে নয়। হঠাৎ করে মীরাকে সে জুনপুটের বালিয়াড়িতে দেখতে পাবে স্বপ্নেও ভাবেনি। দেখামাত্রই চলকে উঠেছিল রক্ত। যে করেই হোক ধরতে হবে ওকে। সোনালী বালিচর পেরিয়ে মীরা চলে যাচ্ছিল নারকেল বাগানের দিকে। ও জানে না কোথায় যেতে হবে ওকে। সুদাম চিৎকার করে উঠল, মীরা, থেমে যা। আমি তোকে মারব না বোন। থেমে যা। হাওয়ায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল কথা। মীরা একবার পিছন ফিরে তাকাল। তারপর শুরু হল তার প্রাণ বাঁচানোর দৌড়।

জেদটা চেপে বসেছিল সুদামের ঘাড়ে। তার প্যাংলা শরীর ভাসতে লাগল হাওয়ায়। মিনিট দশেক ছোটার পরে সে মীরার কাছাকাছি পৌঁছে গেল। ধরতে যাবে এমন সময় ঢেউয়ের মাথায় নিজেকে ছুঁড়ে দিল মীরা। এদিকটায় ঘাট নেই। ঝাউবন আর দু'একটা নারকেল গাছের মাথা দেখা যায়। বালিয়াড়ি ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে সমুদ্রের তলপেটে। হায়-হায় করে ঢেউয়ের দিকে ছুটে গেল সুদাম। মীরা ভেসে যেত যদি না সে ঠিক সময় পৌঁছাত। দু'হাত উচ্চতার ঢেউ মীরাকে আছড়ে দিল কোমর জলে।

সুদাম গিয়ে অতি তৎপরতায় চেপে ধরল মীরার চুল। হ্যাঁচকা টানে মীরা ভাসমান ফুলের মত আছড়ে পড়ল চেটো ডোবা জলে। তার ফর্সা গালে জড়িয়ে গেল সমুদ্রের ফেনা। ভেজা শাড়ি চিপকে গেল শরীরে। দু'হাতে মুখ ঢেকে কঁকিয়ে কেঁদে উঠল মীরা, আমাকে কি তোরা বাঁচতে দিবি না?

মীরার প্রশ্নে খুবই অবাক হল সুদাম, বোনের হাত ধরে সে-ও ভেঙে পড়ল কান্নায়, তোকে কে মরতে বলেছে, কেন তুই ঘর ছেড়ে এলি বল?

মীরা হতভম্ব। তার চোখের ঘূর্ণায়মান তারা সুদামকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। এক সময় সে বলল, বৌদি আমাকে মারে তখন তুই তো কিছু বলিস না? এখানে আমাকে কেউ মারে না। সমুদ্র আমাকে কত আদর করে। আমি সারারাত সমুদ্রের ধারে গান গেয়ে বেড়াই। জানিস দাদা, সমুদ্র আমার গান শোনে। ঢেউগুলো হাত তালি দেয়। ঝাউবন কোমর নাচায়। আকাশের তারা আমাকে দেখে পিটপিট করে। ওরা কত আমাকে ভালবাসে। ওদের ছেড়ে আমি কেন গাঁয়ে ফিরব? গাঁয়ের মানুষ আমাকে বলে পাগলী? সত্যি করে বলতো আমি পাগলী? যে গান গায় হাসে কাঁদে সে আবার পাগলী হয় নাকি?

কথাবার্তায় বোঝার উপায় নেই মীরা পাগলী কিনা! শুধু ওর এলোমেলো চেহারাই বলে দেয় মীরা মানসিকভাবে সুস্থ নেই। যে এত সুন্দর করে কথা বলে সে আবার পাগল হয় নাকি? সমুদ্রের ধারে মীরা ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছে। লক্ষণটা ভাল বলে মনে হয় সুদামের। রোদের তেজ কমলে মীরার পাগলামী প্রতি বছরই কমে যায়। বিশেষত শীতের মরশুমে মীরা অনেকটাই সুস্থ থাকে। এখন তার মার্জিত কথা শুনে বিস্মিত হয় সুদাম।

মীরা ভেজা শাড়ির জল নিংড়ে সমুদ্রের দিকে তাকাল, আপন মনে হাসল, বিড়বিড়াল। তারপর হাসতে-হাসতে চলে গেল জলের কাছে, উবু হয়ে ঝিনুক কুড়াল এক মুঠো। তারপর সেই ঝিনুকগুলো ছুঁড়ে দিল জলের দিকে। শূন্য চোখে তাকিয়ে হা-হুতাশ করে বলল, সব ঝিনুক আমি নোনা জলে ফেলে দিলাম। জানিস দাদা, নোনাজলে গা খুব চিড়বিড়ায়। জলে বিষ, জলে জীবন। আমি জীবন নেব না বিষ নেব? বিষ খেলে মানুষ মরে নাকি? আমি তো রোজ বিষ খাই, কই মরি না তো?

সুদাম কি বলবে কথা খুঁজে পেল না। ইতিমধ্যে আবার ভেজা গায়ে দৌড়ে এল মীরা, হাত শূন্যে তুলে, ভেজা কাপড় হাওয়ায় উড়িয়ে বলল, যা, আমার কাছ থেকে চলে যা। আমার কাউকে চাই না, কাউকেই না। সবাই আমার শত্রু। তুই শত্রু, বৌদিও শত্রু। আমি কার ভরসায় গাঁয়ে-গাঁয়ে ঘুরব? গাঁ থেকে আমার টাউন ভাল। এখানে আমাকে খাওয়ার জন্য ভাবতে হয় না। খিদে পেলে মাছখটীর লোকগুলো আমাকে জাউভাত খেতে দেয়। চা-দোকানী পাউরুটি দেয়, চা দেয়। টিউকলের জল কত মিষ্টি, আমি পেট ভরে খাই। আর সারাদিন এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াই। কেউ বাধা দেয় না। মারে না, বকে না।

সুদাম অস্থির হয়ে উঠল কথার জ্বালায়, ঘরে চল। বাবা এসেছে। কতদিন বাবা

তোকে দেখেনি।

না দেখেছে, ভাল হয়েছে। দেখে কি হবে? বেশি দেখা ভাল নয়। মীরা দাঁত বের করে হাসল। তার হাসির ধরণ ভাল নয়। হাসিতে সুদাম বুঝতে পারে মীরা এখনও আগের মত আছে, তার বিন্দুমাত্র উন্নতি হয়নি।

পথ চলতে চলতে মীরা বলল, দাদা, আমার খিদে লেগেছে, খেতে দিবি?

হ্যাঁ, খেতে দেব, আগে খটীতে চল।

মাছখটীতে আমি যাব না। ওখানে গেলে তোরা আমাকে ধরে রাখবি, আমাকে তেলতাপড়ি মাছের "শুকা" করে দিবি। আমার ভয় লাগছে, দাদা!

ভয় কিরে, ওখানে বাবা আছে, তোর নকুলদা আছে। তুই গেলে ওরা কত খুশি হবে। এছাড়া হৈমপিসি এসেছে। সে তোকে কত ভালবাসে।

কে কত ভালবাসে সব আমার জানা আছে। মীরা ফিক করে হাসল, অদ্ভুত কায়দায় চোখের মণি ঘুরিয়ে বলল, পিসি আমার উকুন বেছে দেয়। নিজে ভাল চোখে দেখে না অথচ রোজ তার উকুন মারা চাই। হে-হে-হে! সব মিথ্যে। আমি বুঝি কিছু জানি না।

হ্যাঁ, তুই সব জানিস। এবার চুপ কর।

মীরা কান্নার গলায় বলল, আমি চুপ করলে কি সবাই চুপ করে যাবে? আমাকে কেন মিছিমিছি ধমকাস? আগে সমুদ্রকে চুপ করতে বল, তারপর আমি চুপ করব। নাহলে চেঁচাব। গলা ছেড়ে চেঁচাব। রাগের ঘোরে পা থেবড়ে ভেজা বালিতে বসে পড়ল মীরা। কানে আঙুল ঢুকিয়ে বলল, ওই দেখ, সমুদ্র কেমন বকরবকর করছে। লোকে কেন সমুদ্রকে পাগল বলে না? আর আমি একটু কথা বললেই তোরা আমাকে ধমকাস! আমি তোদের কোন কথা শুনব না। আমি এখানেই বসে থাকব।

নোনা জলে ঠাণ্ডা লেগে যাবে যে—। সুদাম অসহায় চোখে তাকাল।

লাগুক ঠাণ্ডা, তবু আমি যাব না। মীরা দূরের সমুদ্রের দিকে তাকাল, ঐ দেখ, কত ডিঙা ভেসে আসছে। ঝড় হবে। সব ডিঙা ডুবে যাবে টুপটুপ করে। ঐ দেখ— পানকৌড়ি পাখি। ওরাও ডুবছে, উঠছে। ওরা সব ডিঙার ছোট ভাই। তুই পানকৌড়ি পাখি নিবি দাদা? আমি তোকে পাখি ধরে দেব। জানিস পাখিরা আমাকে ভয় পায় না। সমুদ্রের সব পাখি আমার পোষা। তুই চাইলে আমি তোকে হাজারটা পাখি দিয়ে দেব। পাখি নিবি দাদা?

সুদাম অবাক হয়ে ভাবল, একী তার বোন মীরা? এ মীরাকে সে তো চেনে না। সমুদ্রের হাওয়া গায়ে লাগিয়ে সে কি তাহলে বদলে গেছে পুরোপুরি? এ কেমন করে সম্ভব। সে কাকুতি-মিনতি করে বলল, চল বোন, আর দেরি করিস না। ওরা ভাত নিয়ে বসে আছে সবাই। আমিও পুরোটা খেতে পারিনি।

কী মনে করে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল মীরা। টেনে টেনে বলল, আমি শিস দিতে পারি, দাদা শুনবি, আমার শিস কত দূর চলে যায়—।

মীরা শিস দিতে লাগল ঠোট সঙ্কুচিত করে অদ্ভুত কায়দায়। ক্লান্ত হয়ে নিজেই

একসময় সে থেমে গেল। সুদাম অস্থির হয়ে বলল, এবার চল। আর দাঁড়াস নে। যা রোদের তেজ মাথা ঘুরে যাবে।

মাথা কেন ঘুরবে, মাথা তো একজায়গায় থাকে। মীরা খিলখিল করে হেসে উঠল। বালিয়াড়ি ধরে ছুটে গিয়ে আবার ফিরে এল। তারপর মাথা চুলকে বলল, নোনা হাওয়ায় শিস ভাল দেওয়া যায় না। তুই এমন জায়গায় চল যেখানে হাওয়া নেই। আমি তোকে শিস দেওয়া শিখিয়ে দেব। তুই শিস দিয়ে গান করবি। কত লোকে তোকে ভিক্ষে দেবে। যাবি দাদা-বাজারের ওদিকটায়। ওখানে ইস্কুল আছে, মাঠ আছে, মাঠের পাশে ধানের খেত আছে। যাবি দাদা, চ। মীরা ছুটে এসে হাত ধরল সুদামের, কেমন ছায়াময় হয়ে গেল তার চোখ-মুখ, আমার খুব ছুটে বেড়াতে সাধ জাগে দাদা। সবাই আমার পিছু ধরে টানে। তার মধ্যে হাওয়া বড় বজ্জাত। আমাকে যেতে দেয় না। যেদিন আমি হাওয়াকে খুন করব— সেদিন বুঝবে। জানে না তো আমার রাগ। রেগে গেলে আমি গোবিন্দর চুলের মুঠি ছিঁড়ে নিই।

বহু কষ্টে মাছখটী পর্যন্ত হেঁটে এল মীরা। তার ভেজা পায়ে জড়িয়ে গিয়েছে সোনালী বালুকণা। মীরা উবু হয়ে বসে হাত দিয়ে ঝাড়ছিল বালিগুলো। তার ফর্সা শরীর দিনের আলোয় দৃশ্যমান ছেঁড়া-শাড়ির ফাঁক-ফোকর দিয়ে। এই একটা শাড়ি কতদিন পরে আছে মীরা তা কেউ জানে না। মাথার চুলে চিরুনি নেই কতদিন। চুলে জট লেগেছে, যা আঙুলের জোর খাটিয়েও ছাড়ানো যায় না। হৈমবুড়ি তার পাশে গিয়ে বসল। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, অমন কেন করিস? ভাল হয়ে থাক, আমি তোর বাবাকে বলে ভাল ছেলে দেখে বিয়ে দিয়ে দেব।

মীরা বিয়ের কথা শুনে কেমন নীরব হয়ে গেল। দু'হাত মাথায় উঠিয়ে সে ঘোমটা দেওয়ার চেষ্টা করল। ভেজা শাড়ি মাথায় তুলতে গিয়ে বিপদ হল। নখের খোঁচায় ছিঁড়ে গেল শাড়ির আঁচল। প্যাড়প্যাড় শব্দ হতেই গলা সপ্তমে তুলে হেসে উঠল মীরা, পিসি গো, দেখ বিয়ের বাজনা বাজছে। পাকা ঝাউফলগুলো কেমন বাজনা বাজায় দেখ। এমন বাজনা গাঁয়ে ঘরে তুমি কোথাও শুনতে পাবে না।

গামছাটা গায়ে দিয়ে নে। হৈমবুড়ি এগিয়ে দিল পাঁচহাতি গামছা, যা কলে গিয়ে গা-হাত-পা ধুয়ে আয়। বিকেলে আমি তেল দিয়ে তোর চুল বেঁধে দেব।

উকুন মারবে না? মীরা প্রশ্ন করেই হ্যাঁ-হ্যাঁ করে হাসল, সুচ বলে চালুনীকে তোর কত ফুটো! আমি জানি গো পিসি তুমি চোখে দেখতে পাও না। যদি চোখে দেখতে পাও তাহলে বলো ভাতের রঙ সাদা না কালো? আকাশের রঙ লাল না নীল? বলতে পারলে না তো? জানতাম তুমি পারবে না। কি করে পারবে? তুমি কি ইস্কুলে গিয়েছ? হা-হা-হা।

বাতাস গায়ে মেখে নেয় মীরার হাসি। ঝাউবন মন দিয়ে শোনে সেই হাসির লহর। ঢেউ নেচে ওঠে বাতাসের সুড়সুড়িতে। ঢেউ ডিঙা ভেসে চলে যায় কোন দূর সমুদ্রে। ঝিনুকের দল হামাগুড়ি দিয়ে উঠে আসে বালির কিনারায়। ভাঁটার সময় এখন সারণি জাল টানবে জেলেরা। কুড়ি জন মৎস-শ্রমিক কোমরে কাছি বেঁধে পিছনে

হাঁটবে তীরের দিকে। জোয়ারে যে জাল ফেলা হয় মাঝ দরিয়ায়, ভাঁটার টানে সেই জাল কেমন গুটিয়ে আসে হাতের টানে। জালভরা মাছ খলবলায়। এক ঝাঁক পাখি ওড়ে মাছের লোভে। কেরিপাখি আর টেঁটিয়া পাখির সাহস কম নয়। ওরা মানুষের কাছাকাছি ওড়ে। মানুষের ঘামের গন্ধ বুঝি ওদের ভাল লাগে। মেছো চিল ওৎ পেতে আছে নীচের আকাশে। বকগুলোর হয়েছে মহা জ্বালা। গাঙ শালিকও তাদের পাত্তা দিচ্ছে না। থপথপ করে হেঁটে যাচ্ছে জলের দিকে। পা ডুবে গেছে ঘোলা জলে। তবু তাদের প্রাণে একফোঁটা ভয়-ডর নেই। ওরা দল বেঁধে উড়ছে, খেলছে, হাসছে। ওদেরও কথা ফুরোয় না। ওরাও সমুদ্রের মত বাচাল। রাত নামলে এত পাখি সব কোথায় যায়? কোথায় ওদের ঘর? যেখানে নৌকো যেতে ভয় পায় সেখানেও উড়ে যায় ওরা। এত সাহস ওদের কি করে জন্মায়? তাহলে কি পাখিকে সাহস জোগায় সমুদ্রমাতা? এই সাহস কি চরতে আসা নয়নশোভন শামখোল পাখির আছে? ওরা তো পিছু নাচান পাখিগুলোর চেয়েও চালাক। ওদের সাথে মীরার কি করে ভাব হল? হৈমবুড়ি কলপাড়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিল। মেয়েরা পাগল হলে তার রূপ বেশি খোলতায় হয়। চাকুলিয়া সাবানে হৈম বুড়ি পিঠ ঘষে দেয় মীরার। ছোপ ছোপ ময়লা উঠে গিয়ে বেরিয়ে পড়ে শরীরের জ্যোৎস্না। মীরা আব্দার করে বলল, পিসি, সাবানটা দাও মুখে মাখি। হা দেখ— মুখে কত ময়লা! ময়লা থাকবে না কেন? চাঁদে যদি ময়লা দাগ থাকে তবে আমার মুখে থাকলে দোষ হবে কেন?

চুপ কর ক্ষেপি। অত বকিস্ না।

বকব না কেন? হাওয়াকে তুমি নিষেধ কর, ও যেন আমার কানের কাছে বকর বকর না করে।

ঠিক আছে হাওয়াকে আমি মানা করে দেব।

এখনি মানা কর। এক্ষুণি, নাহলে আমি কাঁদব।

মীরাকে কাঁদতে দিল না হৈমবুড়ি, লোহার বালতিতে জল ভরে সে হড়হড়িয়ে ঢেলে দিল মাথায়। এক পাইপের টিউবওয়েল, তার ভারী জলে ঠাণ্ডার ছোঁয়া, মীরা লাফিয়ে উঠল, তার বুক থেকে খসে পড়ল ভেজা শাড়ি, হা করে সেইদিকে অপলক তাকিয়ে থাকল হৈমবুড়ি। এক সময় সম্বিত ফিরতেই সে ছুটে গেল মীরার কাছে। গামছাটা জড়িয়ে দিল তার নগ্ন বুকে, কড়া স্বরে বলল, তোর লাজ লাগে না? তুই না মেয়ে?

মীরা হাসল, লাজ লাগবে কেন গো পিসি? তুমিও তো মেয়েমানুষ—

আমার কথা বাদ দে। আর যদি কেউ —

আর কে দেখবে, বড়জোর সমুদ্র দেখবে! সমুদ্র তো মেয়েমানুষ। মেয়েমানুষকে আবার লাজ কিসের গো পিসি?

তুই চুপ কর মুখপুড়ী। আর পোড়ামুখ সবাইকে দেখাস নে। মাছখটীর মানুষরা ভাল হয় না। তারা তোকে ছিঁড়ে খাবে।

খেলেই হল! যে আসবে আমি তার গালে কামড়ে দেব। কাঁকড়ার কামড় বোঝ

পিসি? আমি হলাম সমুদ্র কাঁকড়া! মীরা শব্দ করে হাসল। তার মুখের দু'পাশে সাদা ঘা। জল লেগে সেই ঘা আরো সাদা। হাসিতে টান ধরে চামড়ায়। ঘা ফেটে রক্ত বেরয়। সেই রক্তের সরু ধারা চিবুকে গিয়ে ঠেকে। মীরা তর্জনীতে বুলিয়ে নেয় পানসে রক্ত। লম্বা জিভে রক্তের স্বাদ নিয়ে বলল, নোনতা। সমুদ্রের জলও এমন নোনতা! পিসি গো, শরীরে তাহলে কি নোনা জল পোরা?

আমি জানি নে, তুই চুপ কর। চুল শুকোলে আমি তোর মাথায় ঠাণ্ডা তেল ঘষে দেব। তখন দেখবি আরামে ঘুম এসে যাবে। তোর ঘুমের দরকার।

হ্যাঁ পিসি, তুমি ঠিকই বলেছ—আমার ঘুমের দরকার। তাহলে পিসি— আমি ঘুমোলে কি সমুদ্র ঘুমিয়ে যাবে? সমুদ্র না ঘুমোলে আমি ঘুমোবে কেমন করে?

সমুদ্র ঘুমায় না, জেগে থাকে

তাহলে আমিও জেগে থাকব সারারাত। জানো পিসি, রাতে আকাশে কত তারা ফোটে। তারাগুলো সব সমুদ্রের কে হয় জানো? ওরা সব ভাই-বোন। মিলেমিশে থাকে। সমুদ্রকে পাহারা দেয়। সমুদ্র কত সুখী বল তো?

হৈমবুড়ির কানে কিছু ঢোকে না। যা ঢোকে তার অর্থ বোঝে না। শুধু ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকায়। মীরার গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, চুপ কর মা। বেশি কথা বলা ভাল নয়। যারা বেশি কথা বলে তাদের কেউ ভালবাসে না।

মীরা সমস্যায় ভরা মুখ তুলে তাকাল, কোন কথা না বলে সে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে খুঁড়তে লাগল নরম বালি। মজা পেয়ে আনন্দ-ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল তার পুরো শরীরে। খেলাটা মনে ধরেছে তার। সে খেতে বসে উদাস চোখে তাকিয়ে থাকল ঢেউ-সমুদ্রের দিকে।

নতুন জায়গার সূর্যাস্ত সুদামের চোখ ধাঁধিয়ে দিল নিমেষে। আলো কমে এলে জুনপুটের সমুদ্র যেন মায়াবী যাদুকরের দায়িত্ব পালন করে। কোথা থেকে উড়ে আসে ঝাঁক ঝাঁক জোনাকি পোকা। তরল আঁধারে ওদের ক্ষুদ্র আলোয় রাতের খোঁপায় কে যেন যত্ন করে সাজিয়ে দেয় আলোর পুঁতির মালা। সন্ধ্যার মুখে হ্যারিকেন ডিবরি বা লম্ফো জ্বলে মাছখটীর ঝুপড়িগুলোয়। দামাল হাওয়া কাঁপিয়ে দেয় আলোর শিরদাঁড়া। দূরের সমুদ্রে মাঝিদের চটজলদি ঘরে ফেরার আয়োজন শুরু হয়। হ্যারিকেনের আলো দূর থেকে দেখা যায় যাদুকরের আলোকবাতির মত। হাওয়ায় দোলে নৌকা-ডিঙা, নেচে ওঠে দূরের আলোকবিন্দু। হা করে সেই দিকে তাকিয়ে থাকে সুদাম। জলের যে অবর্ণনীয় রূপ সে কি এর আগে কোনদিন দেখেছে মনে করতে পারে না। রাতের দীঘা তার চোখে সেজেগুজে থাকা রাতের মেয়ের মত, জুনপুটকে দেখে তার এমন চিন্তা হয় না। জুনপুট যেন সেই অভাবী ঘরের দুলালী যার রূপ দেখে পাগল হল খোলা প্রকৃতির বুকে বেড়ে ওঠা আদরের দুলাল। লোক কেন যে দীঘার দিকে ছুটে যায় বুঝতে পারে না সুদাম। জুনপুটের এই একলা-সমুদ্র রূপের পসরা সাজিয়ে অপেক্ষায় থাকে। কেউ তার কাছে আসে না। শুধু ঝাউবাগান রাত জেগে শোনে তার মনের কথা। আকাশের তারা সমুদ্রের ভালবাসায় অবলীলায়

রাত জাগে। ওদের কি সম্পর্ক তা জানে না সুদাম। সে শুধু লক্ষ্য করে বুনো হাওয়ায় ঝাউগাছের চেরা পাতা নড়ছে হাতের ইশারা করে। ঝাউপাতা কাকে ডাকে? কে তার ডাক শোনে এই তরল অন্ধকারে? সুদামের কানে আসে টিউকলের ঘটাং ঘটাং শব্দ। দূরে কেউ দাঁড়িয়ে জোরে জোরে কথা বলে, আর তাতেই যেন বিরক্তি চেপে রাখতে পারে না ঢেউ সমুদ্র। মাছখটীর কুকুরগুলো ডাকতে ডাকতে চলে যায় সমুদ্রের দিকে। ঢেউ তাড়া করলে ভয়ে ফিরে আসে ওরা। এ দৃশ্য সুদামের মনে হাসির সঞ্চার করে। মুহূর্তে চোখ জ্বালা করে ওঠে তার, প্রায় ত্রিশঘরের চুলার ধুঁয়ো সমুদ্র বাতাসকে বিষাক্ত করে তোলে। সারাদিন যারা জলে জলে ছিল তারা ফিরে এসেছে ডাঙায়। ক্ষুধার্ত পেটে ভাত পড়া চাই— সেই জন্য এই আয়োজন। স্ত্রী-পুরুষের কথায় চঞ্চল হয় মাছখটীর বাতাস। মানুষের উপস্থিতিতে গমগমিয়ে উঠছে চারপাশ। ঠিক তখনি সমুদ্র বয়ে আনে ঠাণ্ডা বাতাস। হৈমবুড়িও চুলা জ্বেলে দিয়েছে ভাত ফোটানোর জন্য। মীরা বসে আছে আগুনের দিকে মুখ করে। সব চাইতে অসুবিধা বোধ করছে ভরত। দুপুরে বেড়া দিয়েছে সে মাছখটীর। আগে মাছের এবং মানুষের নিরাপত্তা দরকার তারপর অন্য কথা। এই কারণে সে ঝাউগাছ কেটে বেড়া দিয়েছে চারধারে। মাছ শুকোনোর ক্ষেত্রটা তাদের খুব ছোট নয়। ঝাউবনের ঝাঁটা বানিয়ে পুরো এলাকা ঝাঁট দিয়েছে সুদাম। নকুল গিয়েছে ব্যবসার কাজে জুনপুটে। বাজারে শুঁটকি মাছের মহাজন রমজান আছে। তার পাকা বাড়ি, মোটর-বাইক, রঙ্গিন টিভি সব আছে। সে শুঁটকি মাছের সিজিনে দাদন দেয় মাছখটীর মালিকদের। সুদ ছাড়াও তার একটা শর্ত— সব শুকনো মাছ তাকেই দিতে হবে। অন্য কেউ সেই শুকনো মাছে ভাগ বসাতে পারবে না। যদি কোন কারণে এমন ঘটে তাহলে মন কষাকষি থেকে হাতাহাতিও হতে পারে। নকুল ফিরে এল সন্ধ্যা পার করে, সঙ্গে এখনকার বড় মহাজন হরিশঙ্কর। তার পরনে ধুতি-পাঞ্জাবী, চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। সে এসে খেজুর পাতার চাটাইয়ের উপর বসল, সিগারেট ধরিয়ে প্যাকেটটা এগিয়ে দিল ভরতের দিকে, নাও কত্তা, ধরাও। তারপর রয়ে সয়ে সে বলল, আমি তোমাদের কী ভাবে সাহায্য করতে পারি তা একবার যদি বলো তাহলে ভাল হয়। তবে একটা কথা শুনে রাখো— আমি কারবারী। লাভ না হলে আমি সেই কারবারে থাকব না। তবে আমার সাথে কথা বললে আর কারোর সাথে কথা বলা চলবে না। এই জুনপুটে হাজারটা মহাজন ঘুরঘুর করছে দাদন দেবার জন্য। তোমরা যেতে চাইলে যেতে পার, আমি মানা করব না। তোমাদের মা-বাবার আশীর্বাদে আমরা কোন কষ্ট নেই। মৌখিক কথা হল, মাছখটীর সব শুকনো মাছ তুলে দেওয়া হবে হরিশঙ্করের ট্রাকে। টাটা বডির হেভি-ট্রাক আসে পনের দিন অন্তর। তখন শুটকি মাছ দিতে কোন অসুবিধা হবে না নকুলের।

হরিশঙ্কর মহাজন দাদন দিয়ে চলে যেতেই নকুল বলল, যাক, বাঁচা গেল। আমার এখন ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়েছে। আজ রাতে বিশ্রাম নিয়ে ভোর ভোর আমরা চলে যাব সমুদ্রের ধারে। ভোরবেলায় সারণি জাল আসে কিনারে। বালিতে অস্থায়ী দাড়ি-

পাল্লা লাগিয়ে ওজন করা হয় মাছ। দামে পরতা হলে কিনে নেয় মাছখটীর লোকে। পরতা না হলে কেউ ফিরেও তাকায় না। কাঁচা মাছ এতখন চলে যায়, কাঁথি, কলকাতায়। এখানকার মানুষ এটাই চায়। ফলে সমুদ্রমাছের দাম বাড়ছে। এটা শুভ লক্ষণ।

খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকতেই ঝাউবনের চেহারা পাল্টে গেল, হাওয়া এসে বাঁশি বাজাল চেরা পাতার ভেতরে। সোনালী বালিকণায় সোহাগে ঢলিয়ে পড়ল জ্যোৎস্না। তাই দেখে চাঁদের সেকি স্ফূর্তি! চাঁদ বলল, আমিই বা কম কিসে, আমারও তো সমুদ্র আছে, ঢেউ আছে। চাঁদের অলৌকিক ছায়া পড়ল সমুদ্রের জলে। মাছ ধরতে যাওয়া জেলে নৌকোগুলো দুলে উঠল জোয়ারের টানে। জোনাকি পোকার হয়েছে যত জ্বালা, তাকে কেউ দেখার নেই। তারা মন খারাপ করে ফিরে যাচ্ছিল উপকূলবর্তী ঝোপঝাড়ের দিকে। তাদের ঝিঁঝিঁ পোকা বলল, অত অভিমান কেন ভাই? এসো আমার এখানে থাক। এখান থেকে কি চমৎকার সমুদ্র দেখা যায়! তুমি চোখ ভরে দেখ, তোমার মন ভরে যাবে। সমুদ্রে রাতের বেলায় কোন পাখি ডাকে না। তবু কোথা থেকে একটা মেছো চিল স্বপ্ন দেখে আনন্দে চিল্লিয়ে উঠল রাতের নৈঃশব্দকে খান খান করে।

নতুন জায়গায় ঘুম আসছিল না সুদামের। বালির উপর চাটাই বিছিয়ে তার উপর বিছানা পেতেছে ওরা। বালি ছড়িয়ে দিচ্ছে জবার শরীরের উত্তাপ। টিমটিম করে জ্বলছে ঝুপড়ির এক কোনে রাখা হ্যারিকেনটা। লালচে আলোয় ঘর হয়ে গেছে স্বপ্নসৌধ। মানুষ কত রকমভাবে বাঁচে। বাঁচার বুঝি কোন শেষ নেই। অনেক রাত পর্যন্ত গান গেয়েছে মীরা। ভরত তাকে বকে বকেও শান্ত করতে পারেনি। হৈমবুড়ি রাতের অবশিষ্ট খাবারগুলো বেঁধে রেখেছে ঝুপড়ির খুঁটিতে শিকে বানিয়ে। মাছখটী চত্ত্বরে বিড়াল আর কুকুরের ভয়ানক উৎপাত। ওরা মাছের লোভে ছুঁকছুঁক করে। সুযোগ পেলেই খাবলা মেরে মাছ নিয়ে পালায় দূরের ঝাউবনে। মানুষ ওদের সঙ্গে দৌড়ে পারে না। ওরা বুঝি নোনা-হাওয়ার আত্মীয়।

সুদাম বাইরে বেরিয়ে এল কী মনে করে। তার চোখে আছড়ে পড়ল সৌন্দর্যের ঢেউ। সে আর চোখের পাতা ফেলতে পারছে না। অপার্থিব সৌন্দর্য তাকে যেন স্নান করিয়ে দিচ্ছে বারবার। রাতের সমুদ্র কি মায়া বা যাদুটোনা জানে! নাহলে কেন ঢেউয়ের ইশারায় কাছে ডাকে! সুদাম ধীর পায়ে এগিয়ে যাচ্ছিল জলের দিকে। ভেজা বালিতে নিপুণ শিল্পীর তুলির টান। সমুদ্র ফেনায় লুকিয়ে আছে সর্পিল বিষধর সাপ। সমুদ্রের কাছে ছোটবড় কেউ নেই। সে যেমন ঢেউ ডিঙাকে স্থান দেয় তেমনি বিশাল জাহাজকেও। সে যেমন কেরি পাখিকে ভালবাসে তেমনি শামখোল পাখিও তার কম প্রিয় নয়। তার নোনা জলে খেলা করে, ইলিশ, বাউল আর পমপ্লেট মাছ। শাগনপাটিয়া, লহরা কিংবা বুলি মাছেরা দিব্যি সুখে আছে তার সংসারে। গলদা চিংড়ির পাশাপাশি বেঁচে থাকে পাবদা চিংড়ি বা মটকা চিংড়ি। কারোর সাথে কারোর কোন বিরোধ নেই। নীল জলরাশি সবাইকে সমান সুখ বিলিয়ে দিয়েছে। সেখানে ভুঁড়ি মগরের

যা অধিকার ছিলা মগরের তাই। চালুনিয়া মগর কিংবা করাতীয়া মগর— কেউ কারোর সঙ্গে লড়াই ঝগড়ায় মাতে না। সুদাম জ্যোৎস্নার-স্নান সেরে ফিরে আসার সময় দেখল একটা লোমওঠা, খেয়ো কুকুর দাঁড়িয়ে আছে ঝুপড়ির সামনে। কুকুরটার চোখ জ্বলছিল। ছুটে এসে কামড়ে দিলে সুদাম নিজেকে বাঁচাতে পারবে না। সমুদ্র মাছের তৈলাক্ত বিক্রিয়ায় এখানকার বেশির ভাগ কুকুরের লোম উঠে গেছে। দূর থেকে দেখলে ঘৃণার উদ্রেক হয়, চোখ টনটন করে ওঠে। কি মাছ খেলে কুকুরের পেটে সহ্য হয় না— এটা এখনও সঠিকভাবে জানে না মাছখটীর লোকেরা।

নিঃঝুম মাছখটী জেগে উঠল ভোরবেলায়। ঘেয়ো কুকুরগুলো পালিয়ে গেল সমুদ্রের দিকে। এখন ওদের শরীর গরম হয় সৃষ্টির উন্মাদনায়। জোড়া বেঁধে ঘুরঘুর করে সমুদ্রধারে কিংবা ঝাউবাগানে। শীতের শুরুতেই বাচ্চা দেবে মাদীগুলো। কুকুরের সঙ্গে সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় সমুদ্র কাছিমের অদ্ভুত মিল আছে। ওরা পশ্চিমের দ্বীপে ডিম পাড়তে যায় শীতের আগে, তার আগে চলে শরীর তাতানোর খেলা। যৌনতার ব্যাপারে সমুদ্রের কাছিমের ব্যবহার বড় অদ্ভুত ধরণের। ওরা প্রতীক্ষার ধার ধারে না, শুধু সুযোগ পেলে তার সদ্ব্যবহার করে দেয়। সুদামের হাসি পেল ভোরবেলায়। পুবকোনে যেন জেগে উঠছে কাঁচা ফোঁড়া। ধীরে ধীরে ফোঁড়া ফেটে ছড়িয়ে যায় লাল রক্ত। নীল জলরাশিতে মিশে যায় সেই পুঁজ-রক্ত। এই সূর্যোদয় দিনের ঘোষণা করে। রাতে মাছ ধরতে যাওয়া নৌকাগুলো দলবেঁধে ফিরে আসে কূলে। নোনা মাছের গন্ধে মেতে ওঠে চারপাশ। শত মানুষের ভিড়ে জেগে ওঠে সমুদ্রধার। সারণি জালের মালিক মাছের ডাঁই করে দাম হাঁকায়। চলে দর কষাকষি। দ্রুত হাতে বাছা হয় মাছ। বড় মাছ বেশি দামে বিক্রি হবে। বাজারে বড় মাছের চাহিদা বেশি। কুঁচো মাছ সময় মত বরফ না পেলে পেট গলিয়ে দুর্গন্ধ ছাড়ে। তাপড়া, খয়রা, লহরা বা মটকা চিংড়ির ঢিপির কাছে ঘুরঘুর করে ভরত আর নকুল। বাড়তি সব মাছ তারা কিনে নেবে। হরিশঙ্কর টাকা দিয়ে গেছে মাছ কেনার। দু'ঝুড়ি খয়রা আর তাপড়া মাছ কিনে নকুল কিছুটা স্বচ্ছন্দবোধ করছিল নিজেকে। ভরত ঝুড়ি দুটো ধরে দাঁড়িয়ে আছে বালিচড়ায়। কেটলিতে গরম চা-নিয়ে ফেরি করতে এসেছে চা-ওয়ালা। তার এক হাতে কেটলি অন্য হাতে মাটির ভাঁড় আর কমা বিস্কুট। ভরতকে এক ভাঁড় চা দিয়ে নকুল বলল, তুমি এখানে দাঁড়াও। আমি আর সুদাম ঘুরে আসি আর কিছু মাছ পাওয়া যায় কিনা। চা-খেয়ে ওরা দ্রুত চলে গেল চেটো ডোবা জলে হাঁটতে হাঁটতে। একলা ভরত মাছের ঝুড়ি পাহারা দিতে গিয়ে ভাবল তার যৌবনকালের কথা। তখন সমুদ্রের ধারে অত মাছ ব্যাপারীর আনাগোনা ছিল না। গ্রামের সম্পন্ন লোকেরা সমুদ্রমাছকে ঘৃণার চোখে দেখত। যারা সমুদ্র মাছ খেত তাদের সমাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল অনেক নীচে। সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীরাই বেশি ভালবাসত সমুদ্রের মাছ। মাত্র কুড়ি বছরের ব্যবধানে কত কি যে বদলে গেছে। ভরতের চোখ কুঁকড়ে গেল ভাবতে গিয়ে। সেই সঙ্গে আতঙ্কিত হল সে। দীঘা-তমলুক রেলপথ হলে এই মাছখটীর রমরমা কারবার চলবে তো? এক ভয়ার্ত প্রশ্নে হিম হয়ে গেল ভরত। দীঘা জুনপুট, তালসারি কিংবা

শঙ্করপুরের মাছ ট্রেনে করে কলকাতার আড়তে চলে গেলে এখানকার স্থানীয় মহাজনদের ফায়দা হবে। বরফ-কল চলবে রমরমিয়ে। কিন্তু স্থানীয় মানুষগুলো যারা নোনামাছকে কেন্দ্র করে বেঁচে আছে— তাদের কি হবে? তারা কি ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে ঘুরবে? তারা পেরে উঠবে না কাঁচা টাকার লড়াইয়ে। তাদের চোখের সামনে মাছ কিনে নিয়ে ট্রেনে চাপবে সম্পন্ন ব্যাপারী। ভরত ঘেমে যাচ্ছিল দরদরিয়ে, কপালের কাছটা টনটনিয়ে উঠছিল ব্যথায়। রোদের রঙ বদলে গেল ধীরে ধীরে, কৃষ্ণচূড়া রোদ এক সময় হয়ে গেলে কাঁসার বরণ। আর ঠিক তখনি দুটো বাঁকে মাছ নিয়ে ফিরে এল নকুল আর সুদাম। ভরত আগ্রহ নিয়ে ঝুঁকে পড়ল সেই মাছের দিকে। সুদাম বাঁক নামিয়ে ঘাড়ের ঘষে যাওয়া চামড়ায় মুখের থুতু লাগিয়ে বলল, লহরা মাছগুলো ভারি সস্তায় পেলাম। যে দামে পেয়েছি তাতে আমাদের ভাল লাভ থাকবে। নকুলের ঝুড়িতে লাল কুঁচো চিংড়ি বোঝাই। সেও হাসতে হাসতে বলল, জান, একদম জলের দামে পেয়ে গেলাম। কষ্ট করলে কেষ্ট মেলে। চলো এবার যাওয়া যাক।

ওরা বাঁক নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল মাছখটীর দিকে। মাছের গন্ধে উড়ে এসেচে কেরিপাখির দল। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা ভরত ভাবল, পাখির মত তাদেরও খুঁটে খাওয়ার দিন শুরু হল। এ এক নতুন জীবন।, যে জীবনে শুধু নোনা ঘাম।

॥ চব্বিশ ॥

নোনা ঘাম, নোনা মাছ আর নোনা জল নিয়ে মাছখটীর মানুষগুলোর দিনরাত্রির কারবার। দুটো ভাতের জন্য যে যার মত ছুটছে। বড় পূজোতেও মাছ বাছল সুদাম। মীরা তার সঙ্গে ছিল। হৈমবুড়ি রাঁধাবাড়ার কাজ সেরে হাত লাগাচ্ছিল সময় পেলে। বয়স হয়েছে, সে আর কত করবে। তবু মাঝে মধ্যেই রাগে গজগজ করে ভরত। আড়ালে আবডালে সে বলে, দিদিকে দিয়ে আর কোন কাজ হবে না। দুটো ভাতডাল সিজানো ছাড়া তার তো কাজ নেই। রাতদিন সে মীরার সাথে বকর বকর করে। এরকম চললে আমার মাথাটা কোনদিন খারাপ হয়ে যাবে।

কথাটা কানে যায়নি হৈমবুড়ির তাহলে অশান্তি বাঁধত চরম। সুদাম বুঝিয়েছে তার বাবাকে, ওভাবে কারোর নামে কিছু বলো না। সবাই এখানে পেটের ধান্দায় এসেছে। নোনা হাওয়ায় কারোর মনে সুখ নেই। গাঁ-ছাড়া হয়ে থাকতে কারই বা ভাল লাগে বলো?

ভরত তবু থামবার লোক নয়। সে আপন মনেই গজগজ করে, তার যত রাগ হৈমবুড়ির উপর। এমনিতে বয়সের কামড়ে হৈমবুড়ির আঠার মাসে বছর। তার উপর ভরতের অকারণ গজগজানী তার মনে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। বিষ ফোঁড়ায় তেল লাগার মত ফুলে ওঠে ঠোঁট অভিমানে। একটা বয়সের পরে মানুষের কথার কোন ধার বা ওজন থাকে না। সেই বয়সটাতে দাঁড়িয়ে আছে হৈমবুড়ি। তার চোখের কোল

বসা, গালের চামড়া কুঁচকান, এমন কী মাথার চুলগুলোও কাশফুল রঙা। সে এখন ঈষৎ কুঁজো হয়ে হাঁটে। মাছখটীর লোকগুলো তাকে বলে, কুঁজি বুড়ি। কেউ বলে মন্থরা বুড়ি। যে যাই বলুক সুদামের চোখে সে পিসি। এই বুড়ির কাছে তার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। এই হৈমবুড়ি পথে এনেছে মীরাকে। এই প্রথম মীরা এক জায়গায় এতদিন থেকে গেল। মা যা পারে নি হৈমবুড়ি তা কিভাবে করে এটাও আশ্চর্যের কথা। খামখেয়ালী মীরা যখন যা চাইবে তখনই হাতের কাছে তা দিতে হবে। নাহলে লঙ্কাকাণ্ড বাঁধবে মাছখটীতে। মীরা শুঁটকি মাছ পোড়া দিয়ে পান্তাভাত খেতে চাইলে হৈমবুড়িই তা জোগান দেয়। রাত দশটায় ডিম ভাজা খেতে চাইলে হৈমবুড়ি আঁখা ধরিয়ে ডিম ভেজে দেয়। রোজ সে মীরাকে স্নান করায় কলতলায়। তখন মাছখটীর ছোকরাগুলো হা করে গিলতে থাকে মীরাকে। হৈমবুড়ির ধমক খেয়ে তারাও পালিয়ে গিয়েছে। মীরা এখন শান্তিতে স্নান করতে পারে।

মহালয়ায় হপ্তাখানেক আগে ঘর গিয়েছিল সুদাম, তার যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না, ভরতই তাকে ঠেলেঠুলে পাঠাল। জবার জন্য শাড়ি, যোগমায়ার শাড়ি-সায়া-ব্লাউজ সবই কিনে দিয়েছিল ভরত। পুজো আসছে, সময়মত না দিলে কবে আর পরবে তারা। কেনা-কাটা সব জুনপুট থেকেই হয়ে গেল। মহাজন হরিশঙ্করই দেখিয়ে দিয়েছিল দোকান। দু-পয়সা কম পেল ভরত। সেই কাপড় পৌঁছতে সুদামকে যেতে হল বাধ্য হয়ে। জবা তার অপেক্ষায় ছিল কিনা সে জানে না তবে অভিমানে জবার ঠোঁট ফুলে ফুলে উঠল। সজল চোখে বাষ্পরুদ্ধ কান্নাকে বশে এনে বলেছিল, সমুদ্র আমার পিছু ছাড়ল না! সমুদ্র এখন আমার সতীন গো! তার জ্বালায় আমি তোমাকে কাছে পাই না। চার মাস কি কম কথা, আমি এখানে কি করে একা থাকি বলতো? মা তো বিছানায় গেলেই নাক ডাকতে শুরু করে। অত বড় রাত, আমার কিছুতেই ঘুম আসে না। শুধু তোমার কথা মনে পড়ে। কত দিন বিয়ে হল অথচ তেমনভাবে তোমাকে পেলাম কই?

জবার কথাগুলো মিথ্যে নয়। সুদাম সে রাতে হারিয়ে দিল জবাকে। দীর্ঘ প্রতীক্ষায় তার যুবক রক্ত পোষ না মানা ঘোড়ার মত। জবা গা এলিয়ে পড়ে রইল বিছানায়। বাঁশ ঝাড়ে কটরা ব্যাঙ ডেকে উঠতেই তার সে কি ভয়। সুদামকে বুকের কাছে টেনে এনে আঙুর টুসটুসে রক্তাভ ঠোঁট দিয়ে চুমু খেল পরপর। তারপর আবেশী গলায় আব্দার করে বলল, পুজোর সময় আসতে হবে। তুমি না এলে আমি নতুন শাড়ি পড়ব না। যদি আস তাহলে এই শাড়ি পরে দীঘায় বেড়াতে যাব। কতদিন বাবাকে আমি দেখিনি।

বড় পুজোয় নকুল ঘর গেল, সুদামের আর আসা হল না। ঘর যাওয়া নকুলের প্রয়োজন ছিল। মেনকার একটা মেয়ে হয়েছে। গ্রাম থেকে গোবিন্দ এসে খবর দিয়ে গেল। গোবিন্দকে দেখে চাপা রাগে ফুঁসছিল নকুল। সে কেন বয়ে আনবে মেনকার খবর, গাঁয়ে কি কোন পুরুষ ছিল না? তবে কি গোবিন্দর মন ঝুঁকেছে মেনকার দিকে? তা কি করে সম্ভব? মেনকা গর্ভবতী। শুধু মন ছাড়া গোবিন্দ এখন তার কাছে কিছু

পাবে না। যার চোখে শরীরের নেশা, সে কি শুধু মনে ভোলে? অসম্ভব। ধীরে ধীরে মেঘ কেটে গেল নকুলের। গোবিন্দ বলল, আমি আসতাম না কিন্তু শুধু জীবন মাষ্টারের জন্য আমাকে আসতে হল। ঐ একটা মানুষের কথা আমি ফেলতে পারি না। সে এত করে বলল তাই আমি চলে এলাম। এত কিছুর পরেও লোকে আমাকে ভুল বুঝবে।

এরপর নকুল কোন কথা বলার সাহস পায়নি। শুধু মীরা গোবিন্দকে দেখে ধারাল বটি নিয়ে তেড়ে গেল। হৈমবুড়ি না থাকলে রক্তকাণ্ড ঘটত। ভয়ে কাঁপছিল গোবিন্দ। পাগলীকে বিশ্বাস নেই। চোট খাওয়া মানুষ চোট খাওয়া সাপের মত। বদলা নিতে ভুল করে না। গোবিন্দর গেঞ্জি ভিজে গিয়েছিল শরীর নিঃসৃত ঘামে। হৈমবুড়ি অনেক বলে কয়ে শান্ত করল মীরাকে। ইশারায় গোবিন্দকে বলল মাছখটী ছেড়ে চলে যেতে। বাধ্য ছেলের মত মাছখটী থেকে বেরিয়ে এসেছিল গোবিন্দ। তবু ভয় তার পিছু ছাড়েনি। নকুলকে নিয়ে বাসে চড়ার পর তার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

জবা পথ দেখছিল সুদামের। যখন জানতে পারল তার ঘরের মানুষটা দুর্গাপূজোয় আসবে না তখন দেওয়াল ধরে সে কাঁদল অনেকক্ষণ। নকুল তাকে সান্ত্বনা দিল, আমি যাই, গিয়ে তাকে পাঠিয়ে দেব।

ক'দিন থেকে আকাশ মেঘলা, রোদ লুকোচুরি খেলছে এলাকা জুড়ে। ধড়ধড় করে নেমে গেছে মাছের দাম। বরফ-কল বিকল হয়ে পড়ে আছে। বরফ না এলে মাছ চালান যাবার উপায় নেই। বালিচড়ায় ডাঁই হয়ে পড়ে আছে সারণি জালের মাছ। আকাশ পরিষ্কার না হলে কেউ সেই ঢিপির দিকে তাকাবে না। অথচ ঝুঁকি নিয়ে সেই মাছগুলো জলের দরে কিনে নিল সুদাম। ভরত তার বোকামী দেখে রাগারাগি করল। সুদাম শুধু বলল, মেঘ কেটে যাবে। আশ্বিনের এই মেঘ বেশিদিন আকাশ চটকাবে না।

তার কথাই সত্যি হল। এলোমেলো মেঘ কেটে গিয়ে রোদ উঠল চতুর্দিকে। হাওয়ার তোড়জোর কমে গেলে শান্ত হয়ে এল সমুদ্র। এরই মাঝে পাঞ্জাব-ট্রাক এসেছিল শুঁটকি মাছ নেবার জন্য। মোট কুড়ি বস্তা মাছ লোড করা হল ট্রাকে। হরিশঙ্কর কথামত হিসাব বুঝিয়ে দিল সাথে সাথে। নগদ পয়সায় শরীর তেতে উঠল সুদামের। সে এতদিন যে স্বপ্ন দেখেছিল— তা পূরণ হতেই মন খুশিতে ভরে গেল। মীরাকে সঙ্গে নিয়ে সে ঘুরে এল পূজাপ্যাণ্ডেলে।

শুঁটকি মাছের কারবারে ক্ষতির আশঙ্কা খুবই কম। মাছ এক রোদ, দু-রোদ খেলেই গন্ধ ভাসিয়ে দেয় হাওয়ায়। তখন মাছখটীতে থাকা দায়। পুরো বালিয়াড়িতে মাছ শুকোয়। অত বড় বালিয়াড়ি পাহারা দেয় মাছখটীর মেয়েগুলো। ওদের সমস্যা সমুদ্র ধারের কুকুরগুলোকে নিয়ে। একটু ফাঁক পেলেই মাছ তুলে নিয়ে পালিয়ে যায় ওরা। তখন ঝামেলা বাড়ে। ঘেয়ো কুকুরে মুখ দিলে সেই মাছ মানুষের পাতে যাবে কি করে? হৈমবুড়ির ভাবনার সাথে আর কারোর ভাবনা মেলে না। ওরা কুকুরে মুখ দিলেও ভাবলেশহীন। কোন প্রতিক্রিয়াই হয় না। এসব যেন ওদের গা-সওয়া। বড়

ট্রাকে পুরো মাছখটীর শুঁটকি মাছ চলে যায় বাংলাদেশ, আসাম-বিহার। এছাড়া আরও অনেক রাজ্য আছে যেখানে নিয়মিত শুঁটকি মাছের ট্রাক যায়। গ্রামের মানুষ তৃপ্তি সহকারে খায় শুকনো মাছ। দামে কম, স্বাদে অপূর্ব। তাই শুঁটকি মাছের কারবার কোনদিন বন্ধ হবার নয়। যতদিন সমুদ্র আছে ততদিন রমরমিয়ে চলবে এই ব্যবসা।

শিবশঙ্কর মহাজন বলে, এ মাছ শুধু মানুষই খায় না, পোলট্রির মুরগিরাও খায়। শুঁটকি মাছের গুঁড়ো দিয়ে তৈরী হয় পশু পাখির খাবার। এছাড়াও সার হিসাবে এর ব্যবহারও কম নয়। শুটকি মাছের কোন কিছুই ফেলা যায় না। ঝোলেও লাগে, অম্বলেও লাগে এই মাছ।

নকুল যে রাতে ফিরে এল সে রাতেই শুরু হল এলোমেলো ঝড়ের তাণ্ডব- লীলা। প্যাণ্ডেলের কাঠামো দুমড়ে-মুচড়ে পড়ল মাঠে। চাল উড়ে গেল কত ঘরের, টিন, এ্যাসবেসটাস ছিটকে পড়ল এদিক সেদিক। গ্রামের কলাগাছগুলো ধরাশায়ী হল ঝপাঝপ। মাছখটীর রেডিওতে ভেসে উঠল ঘোষিকার সতর্ক কণ্ঠস্বর ঃ ঝড়ো হাওয়া সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় ছুটে যাবে ঘণ্টায় একশ পঞ্চাশ কিলোমিটার বেগে। মৎসজীবীদের জানান হচ্ছে তারা যেন কেউ আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সমুদ্রে না যায়।

যারা সমুদ্রে গিয়েছে দুপুরে নৌকো নিয়ে, তাদের কাছেও রেডিও থাকে খবর শোনার জন্য। যারা হাওয়া অফিসের সংবাদকে গুরুত্ব দেয় তারা ঝটপট ফিরে এসেছে কিনারায়। যারা সে সময় রেডিও শোনেনি, তারা এগিয়ে গেছে মাছের নেশায়। ভুটভুটি, ট্রলার ফিরে এসেছে বিপদের গন্ধ পেয়ে। মানুষের জীবনের দাম ইলিশ মাছের চাইতে অনেক বেশি। মোট চারটে নৌকা ফেরে নি, এই নিয়ে টানটান উত্তেজনা মাছখটীতে। রাত জেগে কপালে ভাঁজ ফেলে বসে আছে রমজান মহাজন তার দলবল নিয়ে। যে কোন সময় কোন একটা নৌকা ফিরে আসতেও পারে। ব্যথায় ওদের চোখ টনটনিয়ে ওঠে। অন্ধকারে ডুবে আছে সমুদ্র। জল দেখা যায় না শুধু ক্রুধিত তাণ্ডব শোনা যায়। মাছখটীর লোকের কাছে এটা কোন নতুন খবর নয়। গতবছর প্রায় ২৫টা ঝুপড়ি ঘর উড়ে গেল সামুদ্রিক ঝড়ে। জোয়ারের ফুলে ওঠা জল উঠে এল মাছখটীর ভেতর। বস্তা বস্তা সমুদ্রমাছ আবার ভিজে গেল নোনাজলে। হাজার হাজার টাকার ক্ষতি হল মৎস্য-শ্রমিকদের। সে ঘা শুকোতে সময় নিয়েছিল অনেকদিন। হরিশঙ্কর সেদিন তার ক্ষতির পরিমান আঁচ করে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠেছিল। সেদিন তার পাশে ছিল প্রতিদ্বন্দ্বী রমজান। রমজান প্রতিযোগিতার কথা ভুলে শিবশঙ্করকে বলেছিল, মরদ মানুষ তুমি, চোখের জল ফেলবে কেন? আল্লা যাকে মারে কে তাকে বাঁচাতে পারে? তবে একটা কথা মনে রেখো-সমুদ্র যা নেয় তা ফিরিয়ে দেয়। তুমি যদি সৎপথে থাকো তাহলে তোমার এ ক্ষতি নিশ্চয়ই একদিন পুষিয়ে যাবে। আল্লার উপর ভরসা রাখো ভাই।

সমুদ্র ক্ষেপলে তাকে চট করে থামান কঠিন।

ঝড় থেমে গেল ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে, কিন্তু ঝড়ো হাওয়ার রেশ থেকে গেল

উপকূলবর্তী এলাকায়। সবচেয়ে ক্ষতি হল ঝাউবনের। ঝড় নয়ত যেন এক পাল বুড়ো হাতি তছনছ করে দিয়ে গেল ঝাউবাগান। মাছখটীর লোকগুলোর মাথায় হাত। শুকনো মাছ ভিজে যাওয়ার অর্থ কড়কড়ে টাকাগুলো ক্ষারে চুবিয়ে দেওয়া। সেই সঙ্গে গোড়া কেটে দেওয়া হল আশার গাছটার। ক্ষয়-ক্ষতির পরিমান হিসাব হয় সাতদিন ধরে। হারানো নৌকোর মাঝিগুলোর বউ আসত রোজ সমুদ্রধারে। রোজই সমুদ্র ফিরিয়ে দিত একটা-দুটো লাশ। কান্নায় মুর্চ্ছা যেত সদ্য শাঁখা ভাঙা, সিঁদুর তোলা বউগুলো। ওদের উপার্জনের স্তম্ভ ভেঙে গেল। জমি-জিরেত নেই— কে ওদের পুষবে? কে দেবে পরণের বস্ত্র, পেটের অন্ন? এ প্রশ্নের সদুত্তর কখনও দিত না ঝাউবন, বালিয়াড়ি।

সুদাম নিজের চোখে দেখল সমুদ্রপাড়ে ভিন্ন চিত্র। ব্যথায় মুচড়ে উঠল তার বুক। সন্ধ্যা নামলে ঘেয়ো কুকুরগুলো ডেকে উঠত এক সাথে। ওরা ডাকত না, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদত। সেই অশুভ কান্নায় গায়ের লোভ চেগে উঠত সুদামের।

ঝড় জল থেমে যেতেই নকুল একদিন কে চা-দোকানে নিয়ে গেল জোর করে। আব্দার করে বলল, সুদাম, তুই এবার বাবা হবি! কাকিমা আমাকে সব বলেছে। জবা নাকি একদম কিছু খেতে পারছে না। বমি করছে। তোর একবার গ্রামে যাওয়া দরকার।

সুদাম এই ভয়টাই করছিল। তবু খুশি হল বাবা হতে পারবে বলে। বিয়ের পর থেকে বাঁধনহারা জীবনকে সে বাঁধ দিতে পারে নি। জবাও এসব ব্যাপারে কৃপণ নয়, বিছানায় সে খোলামেলা আকাশ, নয়ত সমুদ্র। সেও চটজলদি নারী জীবনের পূর্ণতা চেয়েছিল। ফল পেয়ে জবা নিশ্চয়ই খুশি।

ঘুঘনি পাউরুটির অর্ডার দিয়েছিল নকুল। তারপর হাসতে হাসতে বলেছিল, জীবন ছোট নয়, জীবনকে ঘুড়ির মত ছেড়ে দেওয়া দরকার। জবা এবার জব্দ হল। সে তোর সংসারের আঠায় জড়িয়ে গেল। সত্যি বলতে কি আমি এই দিনটার আশায় ছিলাম। আমার খুব আনন্দ হচ্ছে বুঝলি।

তোর আনন্দ হলেও আমার বুক শুকিয়ে যাচ্ছে। সুদাম নীরস চোখে তাকাল, বউকে খেতে দিতে পারি না, বাচ্চা হলে তাকে কি খেতে দেব?

নকুল কিছুটা উত্তেজিত, তুই কি খেতে দেবার মালিক নাকি! যা চুপ কর, পাগলের মত বকিস না। প্রতিটি দানায় লেখা থাকে খানেবালার নাম। তুই ভয় পাচ্ছিস কেন? সব ঠিক হয়ে যাবে।

ঠিক হলেই ভাল না হলে তুই 'মামা' — তোকেই সামলাতে হবে।

আমি কোনকিছুকে আর ভয় পাই না। নকুল বুকের ভেতর থেকে হাসল, তুই কালই ঘরে চলে যা। বাড়িতে টাকা-পয়সা দিয়ে আয়। আমি এদিকটা সামলে নেব।

এত বড় খবর শোনার পরে সুদামের বুকের ভেতর আনন্দের ঢেউডিঙাটা নেচে ওঠে। সন্ধেবেলায় সে বাস ধরে চলে আসে জবার কাছে।

জবা পুকুরঘাট থেকে চাল ধুয়ে ফিরছিল। সুদাম আবছা আঁধারে জড়িয়ে ধরল জবাকে, কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, আমি জানতাম তুমি খুব

তাড়াতাড়ি মা হবে।

জবা নরম হাসি ছড়িয়ে দিল ঠোঁটে, তুমি যাওয়ার আগে আমি টের পেয়েছিলাম কিন্তু তখন সাহস করে বলতে পারিনি। আন্দাজে ঢিল মারলে যদি না লাগত তাহলে লোক হাসত। কিন্তু এখন আর কিছু করার নেই, আমি ধরা পড়ে গেছি। আমার হাবভাব দেখে মা সব বুঝতে পেরে গিয়েছে।

জবা মুখ গুঁজে দিল সুদামের বুকে।

বিড়বিড় করে বলল, কবে আসবে গো, আমার একা থাকতে ভাল লাগে না।

রাতে জবা নদী হয়ে গেল, ঢেউডিঙা হল সুদাম।

শরীর মন জুড়িয়ে যেতেই জবা হাই তুলে বলল, ঘুম পাচ্ছে বড্ড। রাত কত হল কে জানে।

ঘুম পেলে ঘুমিয়ে পড়ো। সুদাম জবার তৃপ্ত চোখের দিকে তাকাল।

জবা চোখ নামিয়ে নিল না। বিছানায় না শুয়ে সে মাথাটা শুইয়ে রাখল সুদামের কোলের উপর।

চুপচাপ কেটে যাচ্ছিল সময়। হঠাৎ জবা বলল, কাল তুমি যাবে না। তাপস মাষ্টারের বউ তোমাকে দেখা করে যেতে বলেছে। সে আমাদের ঘরে এসেছিল। মা তার সাথে ভালমত কথা বলেনি। আমি তাকে সঙ্গ দিলাম। জানো, সে খুব কথা বলতে ভালবাসে।

ফুড়কুনী কি কিছু বলে গিয়েছে? সুদামের ক্লান্তি সরে গেল পেছনে, খুব দরকার না পড়লে সে এখানে আসত না।

জবা সুদামকে লক্ষ্য করল গভীরভাবে, অত অস্থির হবার কিছু নেই। সকালে একবার দেখা করে নিও। আমাকে কিছুই বলল না।

সুদামের রাত কেটে গেল চিন্তায়।

সোনাঝুরি গাছের নীচে দাঁড়িয়ে সে ভাবল তার যাওয়া উচিত হবে কিনা। তাপস মাষ্টার ঘরে থাকলে অন্যরকম ভাবতে পারে। যার মনের স্থিরতা নেই সে অন্যের মনকে শ্রদ্ধা করতে জানে না। সুদাম বেলা বাড়ার অপেক্ষায় থাকল। চা খেল দোকানে গিয়ে। জীবন মাষ্টার দোকান খুলেছে। পাঁচুর সাইকেলের দোকানে পুরনো টায়ার ঝুলছে। এগরা থেকে একটা টিনের বোর্ড লিখিয়ে এনেছে পাঁচু। বোর্ড-এর লেখাগুলো পড়ল সুদাম, পাঁচুর সাইকেল দোকান। প্রোঃ পাঁচু জানা। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বেলা বাড়তেই সুদাম পেরিয়ে এল মাঠখানা। তার পা কাঁপছিল, ঢিসঢিস করছিল বুক অস্বস্তিতে। কড়া নাড়তেই দরজা খুলে দিলে ফুড়কুনী। এত সকাল তার স্নান সমাপ্ত। চুলের ডগায় ঝুলে আছে জলের বিন্দু। ভুরভুর করে গন্ধ আসছিল শরীরের বেড়া ভেঙে। সুদাম কথা না বাড়িয়ে বলল, তুমি আমাকে ডেকেছিলে?

আলতো ঘাড় নাড়ল ফুড়কুনী, হ্যাঁ ডেকেছি। ক'দিন থেকে আজেবাজে স্বপ্ন দেখেছি তোমাকে নিয়ে। মনটা কেমন করছিল ..... তাই .....।

সুদাম চুপ করে থাকল। ফুড়কুনী কাছে সরে এসে বলল, ঘরে এসো। তোমার

সাথে আরো কিছু কথা আছে আমার।

কাঠের চেয়ারে সুদাম গা এলিয়ে দিতেই ফুড়কুনী বলল, আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি কলকাতায়। কেন যাচ্ছি জান? আমার ঘরের লোকটা তোমাকে সন্দেহ করে সেইজন্য। আগামী সপ্তাহে লরী আসবে। লরীতে মাল যাওয়ার আগেই আমরা কলকাতায় পৌঁছে যাব। তাপস মাষ্টার ওখানে একটা ভাল চাকরী পেয়েছে। ফুড়কুনী চুপ করে গেল ক'মুহূর্ত। সুদামের মুখে কোন ভাষা নেই। সে শুধু বুঝতে পারল— তার পায়ের তলায় মাটি সরে যাচ্ছে।

॥ পঁচিশ ॥

মাটি সরে গেলে মানুষের আর দাঁড়াবার জায়গা থাকে না। তখন বালিয়াড়ি হয় তার ভরসা। চোরাবালিতে পা-ডুবে গেলে তলিয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। তাহলে জীবনও যেতে পারে মানুষের।

নকুল চাটাই পেতে শুয়েছিল পিঠে রোদ লাগিয়ে। মাছখটীতে এখন আর তেমন কোন উত্তেজনা নেই, পৌষ মাসের শেষের দিকে মাছখটীর অবস্থা যেন ভাঙা মেলার মত। যারা পুরো পরিবার নিয়ে এসেছিল তারাও হাঁপিয়ে উঠেছে ঘরে ফেরার জন্য। এই জীবন তাদের কাছে টবে লাগান কাঁটা লতার মত। এক জায়গার মানুষ আরেক জায়গায় চলে যায় জীবিকরা সন্ধানে। হৈমবুড়ির এ সংসারে কেউ নয় তবু সে হাঁপিয়ে উঠে বলল, আর মন ধরছে নারে সুদাম, এবার ঘরপানে চল। কতদিন গাঁটা আমি দেখিনি। এখানে সুখের ভাত খেলেও মনটা আমার গাঁয়েই পড়ে থাকে। খেতে না পাই সেখানে যে কত শান্তি তা তোদের কী করে বোঝাই।

পাশে বসে থাকা ভরত হৈমবুড়ির কথা মেনে নেয়, তুমি ঠিকই বলেছ, দিদি। জীবনে টাকা-পয়সা সব নয়। এ ক'মাসে আমি একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছি। খালি মনে হচ্ছে কবে ঘর যাবো! ঘরের জন্য মনটা বড় ছটফটায়।

সুদাম চুপচাপ শুনছিল ওদের কথা। নোনা হাওয়ায় সেও কেমন করে হাঁপিয়ে উঠেছে। সমুদ্রধারের লোম ওঠা কুকুরগুলোকে দেখে তার মনের ভয় আরো গাঢ় হয়। বুড়ো খুড়োরা বলে— নোনা হাওয়া সবার নাকি সয় না। এখানে বেশিদিন থাকলে গায়ের চামড়া কালো হয়ে যায়। শরীর কেমন ঝিমিয়ে পড়ে। তারও মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে ঘরে ফেরার জন্য। কতদিন চেনা-জানা মানুষের সঙ্গে তার কথা-বার্তা হয়নি। মাছখটীর লোকেরা যেন সবসময় ঘোড়ায় লাগাম চড়িয়ে আছে, খবর এলেই ছুটে যেতে হয় কাজের জন্য। এই ব্যস্ততা সবদিন মন থেকে মেনে নিতে পারে না সুদাম। সে ভাবল— যারা বাইরে চাকরি করে তারা কিভাবে শান্তিতে বেঁচে থাকে?

ভাঙা মেলার রেশ যেন ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে মাছখটীর উপর। এখন সবাই

হিসেব মেলাতে ব্যস্ত। ঘন ঘন মাছখটীতে আসছে রমজান আর হরিশঙ্কর। পাওনা-গণ্ডা তারাও বুঝে নিতে চায়। মানুষগুলো একবার নাগালের বাইরে চলে গেলে কারও কিছু করার থাকবে না। যা করার এখনই সব মিটমাট করে নিতে হবে। আগামী মরশুমের জন্য কথাবার্তা এখনই বলে নেওয়া দরকার। যে লাইনে কাঁচা পয়সা ওড়ে, সে লাইনে ফড়েবাজ আর দালালের উৎপাত বেশি। শুকনো মাছ কেনা-বেচায় গোবর-গণেশ হলে চলবে না। চোখ-কান খোলা রাখা দরকার। রমজান মহাজনের চেয়েও এসব লাইনে হরিশঙ্করের বুদ্ধি আরো বেশি। সে একটা ফোন করেই এক ট্রাক মালের যথাযথ দামে সদ্‌গতি করে দিতে পারে।

শীতের হাওয়ায় সমুদ্র শুধু জড়োসড়ো হয় না মানুষও কুঁকড়ে যায় পাতা ঝরা গাছের মত। কুয়াশার চাদর সরে গেলে রোদ ওঠে সমুদ্রতটে। শীতের সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ভাল করে দেখতে পায় না সুদাম। কুয়াশার দল ভাসতে থাকে হাওয়ায়। এরা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ভাসতে ভাসতে চলে যায় ফলে সাময়িক জটিলতার সৃষ্টি হয় বায়ুমণ্ডলে। হৈমবুড়ির জন্য সুদাম একটা সুতির চাদর কিনে দিয়েছে। সেই চাদের গায়ে জড়িয়ে পরপর দু'রাত্রি যাত্রা দেখল সে। মহাজনদের উদ্যোগে পরপর দু'রাত্রি ব্যাপী যাত্রা হল মাছখটীর সামনে। ছেলে বুড়ো মেয়ে যুবক সবাই দু'দিন আনন্দে মেতে ছিল। বেলদার যাত্রাপাটি এ অঞ্চলে বিখ্যাত। মাছের মহাজনরা প্রতি বছরের মত এবছরও আনন্দ স্ফূর্তির ব্যবস্থা করেছিল। মাছখটীর সবাই জয়গান করেছে হরিশঙ্কর আর রমজানের। হৈমবুড়িও খুশি হয়ে বলেছে,এমন যাত্রাগান বহুদিন শুনিনি বাবু। মন ভরে গেছে—

শীতের কুয়াশা সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দেয় ধোঁয়ার বাষ্প। থিকথিকে কুয়াশা ভাসতে থাকে জলের উপর। সারণি জাল ফিরে আসার সময় হল। অভ্যাস মত নকুল আর সুদাম ঝুড়ি আর বাঁক নিয়ে চলে গেল জলের কাছে। এই এত সকালে পাখিরা উড়ে এসেছে ডানা ঝাপটিয়ে। পৌষমাসে যা শুকনো মাছ হবে তা ডাঁই করে রেখে দেবে মহাজন। এই মাছগুলো বর্ষায় কাজ দেবে। তখন শুকনো মাছের দাম হবে আকাশছোঁয়া। ভাল লাভ পাবে তারা।

শীত হাওয়ার ঝাপটা এসে লাগে সুদামের পায়ে। তার খালি পা ছুঁয়ে ভেজা বালি শীতের লহরকে ঠেলে দেয় শরীরের ভেতর। যদিও সমুদ্র ধারে শীতের বিষদাঁত এত ধারাল নয় তবু সকালের দিকে ভারী হাওয়ায় হাঁটা চলায় জড়তা আসে সবার। যারা একটু আরাম প্রিয় তারা দেরি করে বিছানা ছাড়ে। পরপর সারণি জাল এসে জড়ো হয় সমুদ্রের কিনারায়। কুড়ি-পঁচিশজন মানুষের ব্যস্ত হাঁটা চলায় সমুদ্রের ধার যেন আবার প্রাণ ফিরে পায়। সকালের দিকে সমুদ্রের গর্জন কেমন নিস্তেজ হয়ে আসে, ঘুম ভেঙে হাই তোলা মানুষের মত সমুদ্রও যেন হাই তোলে ঘন ঘন।

কুঁচো চুনো চাঁদা মাছ যা পায় ঝুড়ি মাপে কিনে নেয় সুদাম আর নকুল। মাছগুলো শুকিয়ে ঘরে নিয়ে যেতে হবে। সারা বছরের ঘরখরচের শুকনো মাছ এখান থেকে না নিয়ে গেলে বোকামী হবে। নকুল এত কাঁচা ছেলে নয়। সে যখনই ঘর গিয়েছে

দু' পাঁচ কিলো শুক্‌নো মাছ ঝোলায় ভরে নিয়েছে। সুদামও বার কয়েক ঘরে পৌঁছে দিয়েছে শুকনো মাছ। যোগমায়া বেগুন আলু দিয়ে শুকনো মাছ খেতে ভালবাসে। সে সুদামকে বলেছে— আমার জন্য লহরা মাছের শুকা আর ইল্‌শা মাছের শুকনা আনবি।

মায়ের জন্য সব বেঁধে রেখেছে সুদাম।

বেলা বাড়লে খেলা জমে ওঠে সমুদ্রের ধারে।

ভরত ঝাউবনের ভেতর আলো-ছায়া পরিবেশে বসে-বসে ঝিমোয়। হৈমবুড়ি তার হাত দুয়েক দূরে বসে আছে। ঝুপড়ির মাথার উপর রূপাপাটিয়া আর শাগনা-পাটিয়া মাছ শুকোতে দিয়েছে। দূর থেকে মনে হয় কেউ যেন রূপোর পাত কেটে বিছিয়ে দিয়েছে ছাউনির উপর।

ভরত বিড়বিড় করে বলল, আর মাত্র দু'দিন বাকি, এখনও কেরি পাখির মাংস খাওয়া হল না!

হৈমবুড়ি হাসল, কেরি পাখি ধরা অত সহজ নয়। কালও তো সুদাম গিয়েছিল, খালি হাতে ফিরে এল।

কাঁটা-বঁড়শিতে মাছ গেঁথে লম্বা সুতোটা সুদাম ছুঁড়ে দিয়েছে সমুদ্রের অনেকটা দূরে। জলের উপর ভাসছে ছোট মাছ। সুতো ধরে পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকল সুদাম। মাছ দেখে কেরি পাখি খেতে গেলে গলায় বঁড়শি ঢুকে যাবে। তখন আস্তে করে টেনে আনলে পাখির দফা-রফা। আজ সুদামের বরাত ভাল। মাত্র দুঘণ্টার পরিশ্রমে সে সাতটা পাখি ধরে ফেলেছে। মৃতপ্রায় পাখিগুলোর ডানা বেঁধে সে ঝুলিয়ে নিয়েছে কোমরে। পাখির শরীর ওম উঠে আসছে তার শরীরে। পাখি ধরার নেশা বেজায় নেশা। যেখানে ঝাঁক ঝাঁক পাখি ওড়ে সেখানে বঁড়শির টোপ গেঁথে বেশিক্ষণ বসে থাকতে হয় না। নারকেল বনের ওদিকটায় কেরিপাখির ঝাঁক বেশি ওড়ে। ওদিকে জাল গুটিয়ে চলে গেছে জেলের দল। প্রায় পঁচিশ-ত্রিশটা পাখি গোল হয়ে উড়ছে, খুঁটে খাচ্ছে কুঁচো মাছ। ওরা আবার খুশিতে উড়ে যাচ্ছে জলের দিকে। সমুদ্রের জল বুঝি পাখিদের মনে নেশা ধরায়। সুদাম হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল সেই দিকে। নির্জন বালিচড়ায় সে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখল। দুটো বালিগড় হাঁটু ডোবা জলে এসে শরীরের খেলায় মেতেছে। নর ও মাদী বালিগড় শরীরের আদিম নেশা মেটাতে এমনভাবে পড়ে আছে যেন উপেক্ষা করছে সুদামের পায়ের শব্দ। সুতো-কাঁটা ফেলে দিয়ে সুদাম ভাবল— ছুটে গিয়ে সে জড়িয়ে ধরবে সমুদ্র কাছিম। এখন ওরা এমন অবস্থায় পড়ে আছে যেন ওদের নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই। বারকতক ভাবল সুদাম তারপর নিজেই ভয় পেয়ে পিছিয়ে এল। জলে সমুদ্রকাছিমের শক্তি হাতির সমান। ওরা কামড়ে দিলে সহজে ছাড়তে চায় না। এসময় ওরা অন্য খেলায় মেতেছে। অদ্ভুত একটা গন্ধ আসছে সমুদ্রের বুক থেকে। জীবগুলোর কাম-উত্তেজনার শব্দ তার কানে এসে পৌঁছায়। এমন দৃশ্য সে কি জীবনে দেখতে পেত? সুদাম পাড়ে দাঁড়িয়ে হাঁ-করে দেখছিল এই আজব খেলা। তার শরীরেও ঝড় উঠল অন্য নেশার। সহসা তার মনের কোণে ভেসে উঠল

জবার মুখখানা। গরম নিঃশ্বাস নেমে এল তার বুক ছুঁয়ে। সুদাম আর কেরি পাখি না ধরে ফিরে এল ঝুপড়ি ঘরে। হৈমবুড়িকে পাখিগুলো ধরিয়ে দিয়ে বলল, পিসি, কোরিপাখিগুলো ভাল করে রাঁধো। যে কটা আছে তাতে সব বাদ দিয়েও কেজির উপর মাংস হবে। ভাল করে ঝাল-মশালা দিও। পোলট্রি মুরগির মাংস খেয়ে মুখে অরুচি ধরে গেছে। আর শোন—আজ বিকেলে আমি ঘর যাবো। কাল সকালে ফিরে আসব।

দু'দিন পরেই তো খটী ভেঙে যাবে! হৈমবুড়ি অবাক গলায় বলল, বিরক্ত হল সুদাম, সে ভাঙুক। আজ আমার যাওয়ার দরকার। আমার মন বড় টানছে।

বুঝেছি! হৈমবুড়ির চোয়াল ঢোকা গালে ছড়িয়ে পড়ল নির্মল হাসি।

সুদাম বিকেলের বাসে চলে গেল। ঘরে গিয়ে শুনল জবা চলে গেছে তার বাপের ঘর। দশরথের শরীর খারাপ। দীঘা থেকে লোক এসে তাকে নিয়ে গেছে। যোগমায়া নিষেধ করতে পারেনি। কি করে করবে? বাবার অসুস্থতার খবর পাওয়ার পর মেয়েকে কি আটকে রাখা শোভা দেয়। তাছাড়া বিয়ের পর থেকে জবা একবারও তার বাপের ঘর যায়নি। দীঘা থেকে দু-তিনটে চিঠি এসেছিল। সেই চিঠিকে গুরুত্ব দেয়নি যোগমায়া।

যে আশায় ছুটে আসা তা ব্যর্থ হতেই ভোরের বাস ধরে মাছখটীতে ফিরে এল সুদাম। নকুল তাকে দেখে বেশ অবাক হল। একথা-সেকথার পর নকুল বলল, অনেকেই মাছখটী ভেঙে চলে গেছে। আমিও ভাবছি চলে যাব। মহাজন হিসাব বুঝিয়ে দিয়েছে। আমরা যে কোন দিন চলে যেতে পারি।

ঘরে গিয়ে কি করব, এখানেই তো ভাল আছি। সুদাম বলল।

নকুল ম্লান হেসে বলল, আবার মাছের ঝুড়ি, আবার সাইকেল চালান, আবার সেই মাছের আড়ত তালসারি আর শঙ্করপুর করতে হবে। এছাড়া আর কী-ই বা করব? লেখাপড়া ভাল করে শিখলাম না। এখন তো বাঁচার জন্য শরীর নিংড়াতে হবে।

সুদাম দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল, আমাদের বেঁচে থাকাটাই আশ্চর্যের জিনিস। কোনদিন ফুট করে চলে যাব কেউ জানে না।

মাছখটীর আশি ভাগ লোক চলে গেছে যে যার গ্রামে।

এবার আর বাসের মাথায় যাবে না সুদামরা। হরিশঙ্কর মহাজন দুটো ভ্যান-রিকশা ঠিক করে দিয়েছে অল্প পয়সায়। মালপত্তর সব চাপিয়ে দিয়েছে ভরত ভাগাভাগি করে দুটো ভ্যান-রিকশোয়। একটা ভ্যানে পাশাপাশি বসে আছে সুদাম আর নকুল। অন্যটায় হাত-পা কুঁকড়ে জুবুথুবু হয়ে বসে আছে হৈমবুড়ি আর ভরত।

ভ্যান ছাড়ার সময় হরিশঙ্কর কাজ ফেলে ছুটে এল, আবার এসো। আমি তোমাদের সময়মত চিঠি লিখব। চিঠি পেলে দেরি করো না, চলো এসো।

আসি বাবু। হাত জোড় করে ভরত কেমন ছলছলে চোখে তাকাল।

ভ্যান গড়াল সামনের দিকে।

দুপুরের অনেক পরে ভ্যান রিকশো দাঁড়াল সোনাঝুরির গাছের ছায়ায়। সুদাম ভ্যান থেকে নেমে গা-হাত-পা ঝেড়ে নিয়ে ফুড়কুনীদের ঘরের দিকে তাকাল। সে দেখতে পেল চার পাঁচজন মজুর শ্রেণীর লোক মাল তুলছে ছোট্ট ট্রাকে। তাপস মাষ্টার দু'আঙুলের ফাঁকে সিগারেট ধরে দাঁড়িয়ে আছে। আর নির্দেশ দিচ্ছে এভাবে রাখো, সেভাবে রাখো।

সুদামের বুক ভেঙে গেল হঠাৎ ঝড়ে। সে পাগলের মত ছুটে গেল ফুড়কুনীর ঘরের দিকে। তার পথ আটকে দিলেন তাপস মাষ্টার। সুদামের হাত ধরে তিনি বললেন, আমরা আজ কলকাতায় চলে যাচ্ছি। তোমরা সবাই ভাল থেকো।

সুদামের চোখ ভরে জল এল। সে দেখল জানলার শিক ধরে উদাস চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে ফুড়কুনী।

।। ছাব্বিশ ।।

ছ'মাস পেরিয়ে গেল তবু খবর এল না ফুড়কুনীর।

তাপস মাষ্টার যাওয়ার সময় বলে গেল, প্রতি সপ্তাহে একটা করে চিঠি লিখবে। মাসে দু'মাসে ফুড়কুনীকে নিয়ে আসবে গ্রামে। দু'একদিন থেকে আবার ফিরে যাবে কলকাতায়।

কথা দেওয়া সহজ কিন্তু কথা রাখা বড় কঠিন। জীবন মাষ্টার দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে পাকা রাস্তার দিকে তাকাল। সুধাময়ী চিন্তা করে শুকিয়ে ফেলেছে তার শরীর। এমনিতে সে বাতের রুগী, তার উপর এই অশান্তি তাকে কাবু করে ফেলেছে প্রচণ্ড। জীবন মাষ্টার এখন সুধাময়ীর মুখের দিকে তাকাতে পারে না, তার বুক ভেঙে যায় কষ্টে, মনে মনে আফশোষ করে সে, নিজের ভুল সিদ্ধান্তের জন্য। মাত্র একদিনের দুধের শিশুকে কোলে-পিঠে মানুষ করে তোলা মুখের কথা নয়। ফুড়কুনী এ সংসারের একজন। সে চলে গেল, সেই সঙ্গে সুধাময়ীর মুখের হাসিকেও কেড়ে নিয়ে গেল! এখন ফি-কথায় তার চোখে জল চলে আসে, ঝিম ধরে বসে থাকে পথের দিকে তাকিয়ে। জীবন মাষ্টারের মুখেও কোন ভাষা নেই, সেও বোবা হয়ে গেছে ফুড়কুনীর এই হঠাৎ চলে যাওয়ায়। বলা নেই, কওয়া নেই মেয়েটা হঠাৎ কেন চলে গেল— এই প্রশ্নটা সবসময় কুরে খাচ্ছে জীবন মাষ্টারের হৃদয়। বড় গাছে ভাঁড় বাঁধতে গিয়ে পা পিছলে পড়েছে শক্ত ডাঙায়, হাড়গোড় ভেঙেছে— এখন যন্ত্রণা তো হবেই।

এ ঘটনায় সুদামও বিষণ্ণ গলায় বলল, কাকা, তুমি একবার কলকাতায় চলে যাও। নিজের চোখে দেখে আসো ফুড়কুনী কেমন আছে। যদি সম্ভব হয় ওকে সঙ্গে করে এনো। দু-দিন থেকে আবার চলে যাবে।

ভাবছি তো অনেকদিন থেকে কিন্তু হচ্ছে কই? জীবন মাষ্টার হেরে যাওয়া চোখে তাকাল, কলকাতা যাওয়া কি মুখের কথা? তাছাড়া আমি ভাল পথঘাটও চিনি না।

সেই কবে মান্ধাতার যুগে গিয়েছিলাম, এখন সব পাল্টে গিয়েছে। কাউকে যদি সঙ্গে পেতাম তাহলে আমি ঠিক চলে যেতাম। মেয়ে ভাল আছে শুধু এইটুকু জানতে পারলেও মনে শান্তি পেতাম। এখন সব আমার নাগালের বাইরে। অন্ধকারে আমি কোথায় হাতড়াবো বল? কি উত্তর দেবে নিজেই বুঝে পেল না সুদাম। তাপস মাষ্টারের ব্যবহার যত দিন গেছে তার কাছে আশ্চর্য লেগেছে। দিনে দিনে রহস্যময় হয়ে উঠেছেন তিনি। ফুড়কুনীর উপর তার যে দয়া-মায়া ছিল না এটা সে নিজের চোখে দেখেছে। ভাব-ভালবাসার বিয়েতে গায়ে যে কেউ হাত তোলে এটা তার প্রথম শোনা। ফুড়কুনী কখনও স্বামী নিন্দে করেনি, সে মানিয়ে নিতে চেয়েছে। সম্পর্ক জটিল-কুটিল হয়ে গেলে তাকে আর সোনালী সুতোর গেরোয় বাঁধা যায় না। ফলে আপোস করতে চেয়েও হেরে গেছে ফুড়কুনী। তার এই পরাজয়ের কথা জীবন মাষ্টারকে বলা যায় না অকপটে। তাহলে আরো মুষড়ে পড়বে সে। অনেক আশা করে জীবন মাষ্টার ফুড়কুনীর বিয়ে দিতে চেয়েছিল শিক্ষিত ছেলের সাথে, তার পেটে যে এত বিদ্যে কে জানত তখন। কলকাতার ছেলেটা জীবন মাষ্টারের চোখে ঠুলি পরিয়ে দিয়ে চলে গেল। সুধাময়ীর আফশোষ ভাসে কানে। সে আক্ষেপের স্বরে বলে, আজ তোমার জন্য ফুড়কুনীকে হারাতে হল। ওগো, আমাদের তো ঐ মেয়েটি ছাড়া আর কেউ নেই। ওরও এত বড় পৃথিবীতে কেউ নেই। তবু কেন এমন হল বল তো?

খরায় জ্বলছে গা। বছর ঘুরে আবার বছর এল। উচ্চ ফলনশীল ধানগাছের গোড়ায় আবার শ্যালো মেশিনের জল। বক উড়ে এসেছে পশ্চিম থেকে। রোজ একটু একটু করে বাড়ছে ধানচারা। একদিন থোড় আসবে এই ধানগাছে অথচ ফুড়কুনী এখনও মা হতে পারল না। তার মা হওয়ার বড় সখ ছিল। সে বেড়ালকে দুধ খাওয়াত কোলে নিয়ে, ছাগলছানা বুকে চেপে ধরে আদর করত। তার ভেতরের মা মনটা তখন প্রকাশ হয়ে যেত সবার সামনে। তার রকমসকম দেখে হাসত সুধাময়ী, চোখ বুজলেই সে স্পষ্ট দেখতে পেত যেন ফুড়কুনীর প্রথম মা হওয়ার দৃশ্যাবলী। সুধাময়ী নিজে মা হতে পারেনি, সেই সুখ যদি তার পালিত কন্যা পুষিয়ে দেয়-- তাহলে আর আনন্দ রাখার জায়গা থাকবে না।

সুধাময়ীর কাছে এসে সুদামের মুখ দিয়ে কোন ভাষা সরে না।

সুধাময়ী আফশোস করে বলে, মানুষকে কাঁদিয়ে মানুষ কোনদিন সুখী হতে পারে না। সুদাম, তোকে আমি বড় চোট দিয়েছি, তুই আমাকে ক্ষমা করে দে। আর তোর ঠাকুরকে বল আমার ফুড়কুনীর যেন কোন ক্ষতি না হয়। ওর কিছু হলে আমি পাগল হয়ে যাব, বাবা!

সুধাময়ী ভেঙে পড়ল কান্নায়। সুদামের হাত ধরে বলল, আমি জোড় ভেঙে দিয়েছি তোদের। ফুড়কুনীর ইচ্ছে ছিল না তাপসকে বিয়ে করার। আমিই তাকে জোর করেছি বিয়ের পিঁড়িতে বসার জন্য। এমন কী সে অবাধ্য হতেই আমি অত বড় মেয়ের গায়ে হাত-ও তুলেছি।

চুপ করো কাকিমা, যা হবার তা তো হয়েছে।

চুপ করব কেন, আমার পাপ আমাকে উগলাতে দে। সেদিন আমি যা করেছি তার কোন ক্ষমা নেই। সুধাময়ী কপাল চাপড়ে বলল, শুধুমাত্র আমার জন্য আজ এত সব ঘটে যাচ্ছে। আমিই ফুড়কুনীর জীবনটাকে নষ্ট করে দিলাম। কথা শেষ হল না কান্নায় ভেঙে পড়ল সুধাময়ী।

বাইরে হাওয়া ফুটছে সূর্যের শাসনে। ঠিক এই গরমের সময় ফুড়কুনীর সাথে ঘনিষ্ঠতা বেড়েছিল সুদামের। সেই ঘনিষ্ঠতা ধীরে ধীরে বদলে গেল ভালবাসায়। কে জানত সেই ভালবাসাও বাসি ফুলের মতো ঝরে পড়বে একদিন। ফুড়কুনী যে কোনদিন অন্যপথে হাঁটবে এমনটা আজও বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় সুদামের। দেওয়ালে আঁকা পাখি প্রজাপতি আর পালকির ছবি অস্পষ্ট হয়ে গেছে আজ। হয়ত মুছে যাবে সময়ের সাথে। সব মুছে যাবে কিন্তু ফুড়কুনীকে সুদাম কি কোনদিন মুছে ফেলতে পারবে মন থেকে? আজ এখনও ফুড়কুনীর জন্য তার বুকের ভেতরে ভূমিকম্প শুরু হয়, আর সেই কাঁপনে অস্থির হয়ে ওঠে সুদামের হৃদয়। তার মাথা ঝুঁকে আসে মাটির দিকে। অনবরত অদৃশ্য রক্তক্ষরণে প্লাবিত হতে থাকে তার মনের উঠোন। খরার মরশুমে পুড়ে গেছে ঘাস। মাটির হা-মুখে ঢুকে গেছে সূর্যের উত্তাপ। গাছ-গাছালি ঝিমিয়ে গেছে, সবখানে পাতা পোড়ার বদঘ্রাণ। সুদাম তীব্র রোদের প্রকোপ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে ফিরে এল ঘরে। তবু তার গায়ের চিড়বিড়ানী কমল না। অসহ্য রোদে এখন রাস্তায় মানুষজন খুব কম দেখা যায়। চাষীরা বলছে— তীব্র খরায় কমে গেছে জলের লেয়ার। শ্যালো মেসিনের মুখ থেকে উঠে আসছে শুধু কাদা-জল। এরকম আর এক মাস চললে শুকিয়ে যাবে ধান গাছ। হাহাকারে ভরে যাবে গ্রাম-সমাজ।

সুদাম আসার সময় দেখল জীবন মাষ্টার দোকান বন্ধ করে তৈরি হচ্ছিল ঘরে যাবার জন্য। একবছর আগেও সে দোকান ছেড়ে এত গরমে খেতে যেত না। তার ভাত দোকানে পৌঁছে দিত ফুড়কুনী। মেয়েটা চলে যাবার পর কেউ তার জন্য জল খাবারও আনে না। সুধাময়ী সাত সকালে চা ছাড়া আর তেমন কিছু করে দিতে পারে না। সে বেতো রুগী, সারাদিন শুধু ঘরে গজগজ করে। আগে ফুড়কুনী থাকলে তার সাথে কথা বলত। এখন সে দেওয়ালের সাথে কথা বলে। এরকম চললে হয়ত একদিন পাগল হয়ে যাবে সুধাময়ী। ফুড়কুনীর বিচ্ছেদ-ব্যথা তাকে ভীষণ কাতর করে চলেছে।

চারিদিকে গরম হাওয়ার স্রোত। মাটি উগলে দিচ্ছে চুলার উত্তাপ। এই খটখটে দুপুরে বিশেষ দরকার না পড়লে কেউ বাইরে বেরোয় না। চরতে বেরনো গোরুগুলো হার মেনে বিশ্রাম নিচ্ছে গাছের ছায়ায়। এই তীব্র খরায় শুধু মাঠ নয় পুকুরও জল শুকিয়ে বের করে দিয়েছে পাঁকমাটি। দোকান বন্ধ করে জীবন মাষ্টার ভাবল আজ আর রোদ না পড়লে সে ঘর থেকে বেরবে না। আগুন হাওয়ার মধ্যে হেঁটে যাওয়া তার এই বয়সে পোষাচ্ছে না। কাল থেকে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। সুধাময়ী না পারলে সে ভোরে উঠে নিজের ভাত-ডাল ফুটিয়ে আনবে। আসলে ফুড়কুনীর জন্য

সব অভ্যাস নষ্ট হয়ে গেছে সুধাময়ীর। এখন তাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। মেয়েটা একার ঘাড়ে তুলে নিয়েছিল সংসার। সে চলে যাওয়ার পর চোখে অন্ধকার দেখছে সুধাময়ী।

ক'পা হেঁটে আসার পরেই গরম হাওয়ার ঝাপটা এসে লাগল জীবন মাষ্টারের চোখের উপর। সঙ্গে সঙ্গে জ্বালা-পোড়া করে উঠল চোখ-মুখ। মাথাটাও কেমন যেন ঘুরে উঠল। পাতা পোড়ার গন্ধ নাকে এসে ধাক্কা মারল, অমনি পেটগুলিয়ে ঠেলে উঠতে চাইল বমির ভাব। চোখে মুখে ভেসে উঠল অন্ধকার। এই অন্ধকার এখন তার জীবনের সঙ্গী। ফুড়কুনীর বিয়ে হয়ে যাবার পর থেকে এই অন্ধকার সে তাড়াতে পারছে না চোখ থেকে। মেয়েটার কথা ভাবলে তার বুকের ভেতরটা কেমন মোচড় দিয়ে ওঠে। এতদিন হয়ে গেল তবু স্বাভাবিক হল না তার এই চেতনা। যখনই ফুড়কুনীর কথা মনে পড়ে তখনই সে কেমন নিরুৎসাহবোধ করে। আজও হাঁটতে হাঁটতে জীবন মাষ্টার যেন শুনতে পায় ফুড়কুনীর কথা।

বাবা, আমাকে ভুলে যেও না। তোমরা ছাড়া আমার যে আর কেউ নেই।

ফুড়কুনী কলকাতায় চলে যাবার দিন দেখা করে গেল ঘরে। সেদিন দোকান খুলতে একদম ইচ্ছে ছিল না জীবন মাষ্টারের। মেয়েটাকে খেতে বলেছিল দুপুরে। ওরা এল অনেক পরে। কেমন গা-ছাড়া ভাব ওদের। কারোর মুখে হাসি নেই। যেন জোর করে ধরে আছে স্বামী-স্ত্রী'র সম্পর্ক। এই সম্পর্ক যে কোন মুহূর্তে আলগা হয়ে যেতে পারে। জীবন মাষ্টার ফুড়কুনীকে আড়ালে ডেকে বলেছিল, তোর যদি কোন অসুবিধা থাকে তাহলে যাস নে, আমার এখানে থেকে যা। মন ভাল হলে তারপর যাস। আমি নয়ত তোকে পৌছে দিয়ে আসব।

ফুড়কুনী অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিল, না বাবা, আমার চলে যাওয়াই ভাল। আমি আবার পরে সময় করে আসব। তবে তোমাদের জন্য আমার মন ভীষণ কাঁদবে। তোমরা ছাড়া তো আমার কথা ভাববার মত কেউ নেই। ফুড়কুনীর কথায় বিষাদ লুকিয়ে ছিল যার গভীরতা পরিমাপ করার সামর্থ জীবন মাষ্টারের ছিল না। সে নিজেও ব্যথা পেয়েছিল ফুড়কুনীর কথায়। টুকরো কিছু কথা তার কানেও এসেছে। তাপসের সঙ্গে ফুড়কুনীর সম্পর্ক ভাল নয়। প্রায়ই তাপস হাত তোলে ফুড়কুনীর গায়ে। তাপস যে অন্য মহিলার সাথে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত আছে—এমন সংবাদও জীবন মাষ্টারের কানে এসেছে। এরকম একটা জটিল পরিস্থিতিতে মেয়েকে একা ছেড়ে দিতে তার মন সায় দেয়নি। সে তাপসকে একান্তে ডেকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলেছিল, মেয়েটাকে দেখো বাবা। ওর প্রতি একটু নজর রেখো। এত বড় হল তবু আজ পর্যন্ত ও গ্রামের বাইরে যায় নি। কলকাতা খুব বড় জায়গা। সেখানে ও যে কিভাবে থাকবে একথা ভেবে ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে যাচ্ছে।

হাসতে হাসতে তাপস মাষ্টার বলেছিলেন, আপনার চিন্তার কোন কারণ নেই। কলকাতাতেও মানুষ থাকে ফলে ফুড়কুনীর কোন অসুবিধা হবে না। তাছাড়া সে আমার স্ত্রী। তার সব দায়-দায়িত্ব আমার।

খাওয়া-দাওয়ার পরে ওরা আর থাকল না, তাড়াহুড়ো করে চলে গেল বাসায়। ট্রাক বোঝাই হয়ে সংসারের জিনিসপত্র চলে গেল আগে। ওরা গেল দীঘা-কলকাতার স্টেট-বাসে ভোরবেলায়। যাওয়ার সময় ফুড়কুনী সুধাময়ীর সাথে দেখা করে যেতে পারেনি, শুধু জীবন মাষ্টারের পা ছুঁয়ে কেঁদে উঠেছিল হাউ-হাউ করে। তার কান্না দেখে জীবনমাষ্টারও চোখের জল আটকে রাখতে পারে নি। চোখের জল ধুতির খুঁটে মুছে নিয়ে সে ফুড়কুনীর মাথায় হাত রেখে বলেছিল, সুখী হ মা। তুই সুখে থাকলে আমরাও ভাল থাকব এখানে।

হাঁটতে হাঁটতে কত কথা মনে পড়েছিল জীবন মাষ্টারের। নির্জন ধূ ধূ পথে সে ছাড়া আর কেউ নেই। পথের পাশের ডোবায় একটা কুকুর জিভ বের করে হাঁপায়। জীবন মাষ্টার থমকে দাঁড়াল। হঠাৎ-ই তার গলা শুকিয়ে জিভ যেন ঢুকে যেতে চাইল ভেতরে। মাথা ঘুরে উঠল বনবন। দু-চোখের হলুদ আলোর রশ্মিগুলো ছিটকে বেরিয়ে গেল বাইরে। সে পা ফেলার চেষ্টা করল সামনে কিন্তু পারছে না। বারবারই গলা শুকিয়ে চ্যাটচ্যাট করে উঠল ভেতরটা। অসহ্য একটা কষ্ট বুক ঠেলে চলে গেল মাথায়। শ্বাস নিতে কষ্ট হল প্রচণ্ড। জিভ জড়িয়ে গেল মুখের ভেতর। দরদরিয়ে ঘেমে গেল সে। হাত থেকে খসে পড়ল কাপড়ের থলিটা। ওটা তুলতে যাবার চেষ্টা করতেই আলপথ থেকে ছিটকে পড়ে গেল সে ধান খেতে। শ্যালো-মেসিনের জলে কাদা হয়ে আছে মাঠ। জীবন মাষ্টার মুখ থুবড়ে পড়ে আছে মাঠে। তার মুখ ভর্তি গ্যাঁজলা, উল্টে গেছে চোখ। নাকের ছিদ্রে উঠে এসেছে রক্ত। মুখের দু'পাশে ক্ষীণ রক্তের ধারা। হাত-পা অসাড় এবং টানটান। তার পড়ে থাকার বীভৎস ভঙ্গি দেখে ভয়ে উড়ে গেল কানা বক।

বেলা গড়াতেই খবরটা জানাজানি হয়ে গেল গ্রামে, হুড়মুড়িয়ে ছুটে এল মানুষের ঢল। সুধাময়ীও এল কাঁদতে কাঁদতে। সে এসে কিছুটা তফাৎ-এ দাঁড়াল। তাকে কাছে যেতে দিল না গ্রামের বউরা। ধরাধরি করে কাদা মাখামাখি জীবন মাষ্টারকে যখন শুইয়ে দেওয়া হল ধানক্ষেতের আলে তখন তার শরীরে প্রাণের কোন স্পন্দন নেই। তবু গ্রামের ডাক্তার এল তাকে পরীক্ষা করার জন্য। সুধাময়ীর দিকে তাকিয়ে তিনি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নীরবে সরে গিয়ে দাঁড়ালেন ভিড়ের একপাশে। তার বোবা চাহনি ছড়িয়ে পড়ল সবার চোখে চোখে। ডুকরে কেঁদে উঠল সুধাময়ী। এত বড় সংসারে একা হয়ে যাবার যন্ত্রণা তাকে কুরে কুরে খেল।

গোবিন্দ গেল ঠিকানা নিয়ে ফুড়কুনীর কাছে কলকাতায়। সে না ফিরে আসা পর্যন্ত লাশ দাহ হবে না। এই গরমে লাশ পচে গেলে দুর্গন্ধ ছাড়বে, লাশ ঠিক রাখার জন্য পাঁচু গেল এগরায় বরফের চাঁই আনার জন্য। সেখানে বরফ পাওয়া গেল না, ফলে নকুলকে নিয়ে তাকে যেতে হল আবার দীঘায়। দীঘা থেকে বরফের চাঁই এল বাসের মাথায় লোড হয়ে। সুদাম সেই বড় বড় বরফের চাঁইয়ের উপর শুইয়ে দিল জীবন মাষ্টারকে। সারারাত সে আর নকুল লাশ আঁকড়ে পড়ে থাকল জীবন মাষ্টারের আঙ্গিনায়।

সকাল দশটার বাসে ফিরে এল গোবিন্দ। তার চেহারায় রাত্রি-জাগরণের চিহ্ন। তাকে একা দেখে বুকটা ফাঁকা হয়ে গেল সুদামের।

গোবিন্দ ভাঙা গলায় বলল, রাতে আমি তাপস মাষ্টারের বাড়িতে গেলাম। সে তখন ঘরে ছিল না। ফুড়কুনীকে আমি তখনও কিছু বলিনি। রাত এগারটা নাগাদ তাপস মাষ্টার অন্য আর একটা মেয়েকে নিয়ে ঘরে এল। আমি তাকে চিনি না। তাপস মাষ্টার আসতেই আমি তাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে সব বললাম। সে বলল, বয়স হয়েছিল, মারা গিয়েছে এতে আর শোক করার কি আছে। ঘরে যাও, গিয়ে পুড়িয়ে ফেল। ফুড়কুনী এখন যেতে পারবে না। কাল সকালের ট্রেন ধরে আমি আর মানসী দার্জিলিং যাচ্ছি। ফিরতে দশ দিন দেরি হবে। ফিরে আসার পর যদি কেউ নিতে আসে তাহলে শ্রাদ্ধে আমি ফুড়কুনীকে পাঠিয়ে দেব। তার আগে ফুড়কুনীর যাওয়া সম্ভব হবে না। ঘরে কাজের লোক নেই। ফুড়কুনী ঘর পাহারা দেবে। এর পরে আমি আর কী বলব? আমার মাথা নীচু হয়ে এল। ভোর হতেই আমি থ্রু-বাস ধরে চলে এলাম। বড় কষ্ট পেয়েছি ফুড়কুনীর অবস্থা দেখে। কাকার শেষ সময়ে সে থাকতে পারল না।

গোবিন্দ ফিরে এসেছে এই সংবাদে সুধাময়ী যাবতীয় শোক ভুলে যেন আগের অবস্থায় ফিরে যেতে চাইল কিন্তু যখন শুনল ফুড়কুনী আসেনি তখন সে বুক চাপড়ে বাতাস বিদীর্ণ করে কেঁদে উঠল, আমি জানতাম তাকে পাঠাবে না! তুই কেন শুধু শুধু গেলি গোবিন্দ। আমি মরে গেলেও ফুড়কুনী আসবে না, তোরা দেখে নিস। আমাদের জামাই তাকে পাঠাবে না। তার মন বলে কোন জিনিস নেই। সে একটা পাথর।

জীবন মাষ্টার বাজারের সবার প্রিয় ছিল, তার কোন শত্রু ছিল না এ অঞ্চলে। তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে স্থানীয় বাজার বন্ধ থাকবে বারো ঘণ্টা। শ্মশানে যাবার আয়োজন শেষ। খাটিয়ায় কাঁধ দিল সুদাম। নকুলের হাতে খৈয়ের ধামা। সে খুচরো পয়সা আর খৈ ছিটিয়ে দিল শ্মশান যাবার পথে। ভরত এসে দাঁড়িয়েছে সোনাঝুরি গাছের তলায়, তার দু-চোখে উপচে পড়ছে জল। বহুদিনের সঙ্গী তার চলে গেল। শুধু ভরত নয় আশেপাশের গ্রাম ভেঙে জড়ো হয়েছে প্রায় শ'খানিক মানুষ জীবন মাষ্টারকে শেষ দেখা দেখবে বলে। লাশ নামান হল পাকা রাস্তায়। হুমড়ি খেয়ে পড়ল সবাই জীবন মাষ্টারের উপর। জীবন মাষ্টারকে চোখের জলে বিদায় দিল গ্রামের মানুষ।

শ্মশানে দাউ-দাউ করে জ্বলছে বাবলা গাছের কাঠ। সেই ফনা তোলা আগুনের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে সুদাম। তার চোখে ছাপান জল, সবকিছু আবছা দেখায়। মনে পড়ে কত কথা। এই মানুষটাই তার দায়ে অদায়ে পাশে এসে দাঁড়াত সবসময়। সৎ উপদেশ দিত। টাকা-পয়সার দরকার হলে স্বেচ্ছায় এগিয়ে দিত। আজ সে নেই, একথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না সুদাম। দুপুরে খেতে যাওয়ার সময় তার সাথে দেখা হয়েছে। মাত্র একঘণ্টার মধ্যে একটা সুস্থ মানুষ কি করে পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়— এটা ভাবতে গিয়ে শিউরে ওঠে সুদাম। জীবন মাষ্টারের ইচ্ছে ছিল

গোবিন্দকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় যাবে। ফুড়কুনীর ঘরে দু'একদিন থেকে তাকে নিয়ে আবার ফিরে আসবে। তার সেই ইচ্ছা আর কোনদিন পূরণ হবে না। ফুড়কুনীও আর কোনদিন তার বাবাকে দেখতে পাবে না। মৃত্যুর খবর পেয়েও ফুড়কুনীকে আসতে দিলেন না তাপস মাষ্টার। একজন শিক্ষিত মানুষের কাছে এতটা রূঢ়তা আশা করেনি এ গ্রামের মানুষ। তারা যেন মন থেকে তাপস মাষ্টারকে ক্ষমা করতে পারছে না। তাদের সবার চোখে শত্রু হয়ে গেছে তাপস মাষ্টার। কেউ-কেউ বলছে, কাজঘর মিটে যাক তারপর আমরা এর একটা বিহিত করব। জীবন মাষ্টার এই যে হঠাৎ করে মারা গেল এর পেছনে তাপস মাষ্টারের অমানুষিক ব্যবহারই দায়ী। আমরা সব কিছুর হিসাব কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে নেব। ফুড়কুনী আমাদের গ্রামের সবার মেয়ে। সে জীবন মাষ্টারের একার মেয়ে নয়। তাকে এই গ্রাম কুড়িয়ে পেয়েছে। জীবন মাষ্টার তাকে মেয়ের মত মানুষ করেছে। আমরা ফুড়কুনীর জীবন নষ্ট হতে দেব না। যদি দরকার পড়ে রাজনীতির সাহায্য নেব আমরা। তাপস মাষ্টারকে উচিত শিক্ষা না দিলে এ গ্রামের অপমান হবে।

জীবন মাষ্টারের চিতায় আগুন দিয়েছিল সুদাম ফলে তাকে কাছা পরতে হল নিয়মমত। কাছা পরার সময় কিছুটা ইতস্তত করছিল সুদাম। নকুল তাকে বুঝিয়ে বলল, এ তো পুণ্যের কাজ। পুণ্য করার সৌভাগ্য সবার হয় না। তাছাড়া কাকা তোকে ছেলের চেয়েও ভালবাসত। তুই শ্রাদ্ধ করলে তার আত্মা শান্তি পাবে।

সুদামের মন ফুড়কুনী না আসার জন্য ভেঙে পড়েছিল ভেতরে ভেতরে। এমনটা যে ঘটবে সে কল্পনাতেও স্থান দেয়নি। বাবার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ফুড়কুনী যে আসবে না—এটা কেমন করে সম্ভব হয়। সুদামের মাথার ভেতর হাজার চিন্তা জট পাকিয়ে গেল। সে তাপস মাষ্টারকে এত নীচ ভাবতে পারে না। মানুষ কি করে পারে—এমন কসাইয়ের মত সিদ্ধান্ত নিতে। সুদামের বুকের ভেতর ঠেলে ওঠে রাগের বহ্নি। তার রুগ্ন মুখের চোয়াল জেগে ওঠে। হাতের মুঠি পাকিয়ে লাল চোখে সে তাকিয়ে থাকে দূরের দিকে। নিশ্চয়ই খুব বিপদে আছে ফুড়কুনী। মানসী নামের মহিলাটি আবার তাপস মাষ্টারের জীবন জুড়ে বসেছে। এত ছোট হৃদয় যার সে কি পারবে দু'জন মহিলাকে সুখী করতে? সুদাম যেন স্পষ্ট দেখল ফুড়কুনী কাঁদছে নীরবে। মানসিক অত্যাচারে নষ্ট হয়ে গেছে তার সুন্দর শরীরখানা। ক্রমশঃ রোগা হয়ে যাচ্ছে সে। তিল তিল করে নিজেকে ক্ষয় করে ফেলছে ফুড়কুনী। তাকে যে করেই হোক বাঁচানো দরকার। কঠিন জেদে হাতের মুঠি শক্ত হয়ে ওঠে সুদামের। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল — তাপস মাষ্টারকে সে কিছুতেই ছাড়বে না। তার মুখোশ খুলে দিতে হবে।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান মিটে যাবার পর সুদাম ভাবছিল সুধাময়ীর কথা। শোক আর একাকীত্ব সুধাময়ীকে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে এ কয়দিনে। সে কথা বলে কিন্তু তার কথা স্পষ্ট শোনা যায় না। অস্পষ্ট সেই কথার ধ্বনি শোকে মাখামাখি হয়ে এক বিপন্নতার জন্ম দেয়। সেই বিপন্নতার ঢেউয়ে ভেসে যেতে থাকে সুদাম। সে ভাবে সুধাময়ী একা কি করে থাকবে এত বড় ঘরে? জীবন মাষ্টারের দোকানটারই বা কি হবে? ফুড়কুনীকে

কিভাবে বাঁচান যাবে ঐ রাক্ষসের হাত থেকে? কপাল টনটন করে ওঠে সুদামের। সে সুধাময়ীর মুখোমুখি দাঁড়াতে ভয় পায়। তবু সুধাময়ী তার সামনে এসে দাঁড়াল; অস্ফুটে বলল, সুদাম, তোর ঋণ আমি কীভাবে শোধ করব জানি না। তুই আজ ছেলের কাজ করলি। গত জন্মে তুই নিশ্চয়ই আমার ছেলে ছিলিস। সুধাময়ী ফুঁপিয়ে উঠল, ফুড়কুনীর জন্য আমার মনটা ভীষণ কাঁদছে। মেয়েটা ওর বাবার শ্রাদ্ধতেও এল না! আমার মনে হয় ওকে তাপস আসতে দেয় নি। আর মনে হয় কোনদিন কলকাতা থেকে মেয়েটা আমার আসতে পারবে না। লোভে পড়ে কী ভুল যে করলাম, এখন আফশোষ করা ছাড়া কোন পথ নেই। সুধাময়ী চোখের জল সাদা শাড়ির আঁচলে মুছে নিয়ে তাকাল। সুদাম কি বলবে ভাবছিল। সে-ও তো ফুড়কুনীর চিন্তায় ভাল মতন ঘুমাতে পারে না। রাতে স্বপ্নে সে ফুড়কুনীর নাম ধরে চেঁচিয়ে ওঠে। জবা তাকে সন্দেহ করে এখন। মুখ ভার করে ঠোঁট উল্টিয়ে বলে, আমি জানি ফুড়কুনীই তোমার জীবনে সব। ওকে তুমি এক মুহূর্তের জন্যও মন থেকে সরাও না। তোমার মন জুড়ে শুধু ফুড়কুনী, আমি তো তোমার কাছে আগাছা! জবা যা বলে তা মিথ্যে কথা নয়। সব মেয়েই পুরুষের মন বুঝতে পারে এক ঝলকে। ওদের বোঝার ক্ষমতা পুরুষের চাইতে বুঝি হাজার গুণ বেশি। সুধাময়ীর যে চিন্তা সেই একই চিন্তা কাবু করে ফেলেছে সুদামকে। এই মুহূর্তে ফুড়কুনীর উপস্থিতি সুধাময়ীকে মনাসিকভাবে চাঙ্গা করে তুলত। কিন্তু সেই সুযোগ সুধাময়ীর হাতের মধ্যে নেই। পর হয়ে গেছে ফুড়কুনী। তার উপর এখন জোর খাটান যায় না। তাপস অনুমতি না দিলে সে-ই বা এখানে আসবে কি করে? সে যে এখন পরাধীন।

সুদাম নিজের সাথে যুদ্ধ করল অনেকক্ষণ, পরে বলল, গোবিন্দর মুখে যা শুনেছি তাতে ফুড়কুনী এখানে কোনদিন আসবে বলে আমার মনে হয় না। ওকে তাপস মাষ্টার আটকে রেখেছে। আমরা কেউ এখান থেকে না গেলে ওর মুক্তি নেই কাকিমা, তুমি একবার গোবিন্দর সঙ্গে কোলকাতায় যাও। তাপস মাষ্টারকে বলে-কয়ে একবার এখানে নিয়ে আসো। নাহলে ফুড়কুনীকে তুমি বাঁচাতে পারবে না। ও যা মেয়ে নিজেকে শেষ করে দেবে অভিমানে।

ও কথা বলিস না সুদাম। আর্তনাদ করে উঠল সুধাময়ী, ফুড়কুনীর কিছু হলে আমি পাগল হয়ে যাব। ও ছাড়া আমার যে আর কেউ নেই। তুই গোবিন্দকে খবর দে—ও যেন আমার সঙ্গে একবার কলকাতায় যায়।

সুদাম ঘাড় নাড়তেই সুধাময়ী বলল, এ ঘরে তোর কাকার স্মৃতি ছড়িয়ে আছে, আমি একা একা হাঁপিয়ে উঠেছি। আমি আর পারছি না। যদি গোবিন্দ কাল যেতে চায় তাহলে আমি কালই চলে যাব। মেয়েটা এলে আমি দু'দিন কথা বলে বাঁচব। নাহলে আমি যে বুক ফেটে মরে যাব সুদাম।

সম্পর্ক কি ভাবে আগাম গড়ে ওঠে তা কেউ জানে না। ফুড়কুনীর জন্মবৃত্তান্ত এখনও এ গ্রামের মানুষের কাছে একটা রহস্যময় ঘটনা। পরের মেয়েকে কোলে তুলে নিয়ে যে মায়া-মমতা, স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে তাকে মানুষ করে তুলল তার দা-

তাপসের মত অবিবেচক ছেলেরা কোনদিন দিতে পারবে না। সুধাময়ীর নির্দেশে সুদাম গিয়েছিল গোবিন্দর কাছে, অনেক বলে-কয়ে তাকে রাজি করিয়েছে সে।

ওরা কলকাতায় যাওয়ার পরই একটা অঘটন ঘটল। ভরত বাতা কাটতে গিয়ে বুড়ো আঙুলের অনেকটাই কেটে ফেলল ধারাল দায়ে। রক্ত দেখে জবার মূর্চ্ছা যাবার উপক্রম। ভরতকে শেষ পর্যন্ত পানিপারুল হাসপাতালে নিয়ে যেতে বাধ্য হল সুদাম। ডাক্তারবাবু তিনটে সেলাই দিলেন আঙুলে। ইনজেকশন দিলেন একটা। সেই সঙ্গে ওষুধ লিখে দিলেন যা হাসপাতালে পাওয়া যায় না।

একদিন পরপর ভরতকে আসতে হয় পানিপারুলে ড্রেসিং করাতে। সুদামের ঘর ছেড়ে এখন কোথাও যাওয়ার উপায় নেই। ঘরে জবাও অসুস্থ। যে কোনদিন তার ব্যথা উঠতে পারে। হৈমবুড়ি জবার অবস্থা দেখে বলে গেছে, ভয় নেই, আমি আছি। ব্যথা উঠলে আমাকে খবর পাঠাস। তার আগে গরম জল, কাঁথাকানি সব তৈরি রাখিস।

নকুল আবার মাছ ব্যবসায় মেতে গেছে। সে এখন গ্রাম থেকে একাই যায় দীঘায়। হাট সেরে মাছ বেচে রাত নটার আগে সে ঘরে ফেরে না। ওই অত রাতে সুদাম যায় তার বাড়িতে। দীঘার গল্প-গুজব হয়। বাইরের হাওয়া মনে ঢুকিয়ে ফিরে আসে সে। ফেরার পথে পাঁচু একদিন সুদামকে ডেকে বলল, দু-দিন থেকে তোকে খুঁজছি, পাচ্ছিই না। একটু দাঁড়িয়ে যা। তোর সাথে আমার দুটো কথা আছে।

সুদাম আবছা অন্ধকারে দাঁড়াল। তার মুখে বাজারের আলো এসে পড়েছে। পাঁচু বেশ গদগদ গলায় বলল, জীবন মাষ্টারের দোকানঘরটা খালি পড়ে আছে। ও দোকান আর কেউ খুলবে না। আজ প্রধানবাবু এসেছিল আমার কাছে। বারবার করে বলেছে দোকানঘরটা ভাড়া দেওয়ার জন্য। ওখানে ওরা পার্টি অফিস খুলবে, তুই একবার বৌদিকে বলে দেখ— যদি ভাড়া দিতে রাজি থাকে তো ওরা গিয়ে দেখা করবে।

জীবন মাষ্টারের সাধের দোকানঘরে পার্টির অফিস হলে সুধাময়ী কি তা মেনে নেবে? এনিয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে সুদামের। তবু সে বলল, কাকিমা তো এখন গ্রামে নেই। গোবিন্দকে নিয়ে কলকাতায় গিয়েছে। ফিরতে মনে হয় দেরি হবে।

সে ফিরবে তো? পাঁচু সন্দেহ নিয়ে তাকাল, আমি শুনেছি তাপস মাষ্টার ভাল লোক নয়। সে নাকি আবার বিয়ে করেছে! ওরকম জামাইঘর বৌদি না গেলেই ভাল করত।

সুদাম আকাশ থেকে পড়ল, এসব খবর তুমি কোথা থেকে শুনলে? কই আমি কিছু শুনিনি!

পাঁচু চোখ ছোট করে হাসল, আমরা গ্রামে থাকি ঠিকই কিন্তু শহরের অনেক কথাই কানে আসে। এই বাজার হল একটা রেডিও সেন্টার। এখানে কোন খবর গোপন থাকে না। পাঁচু ব্যস্ত হয়ে উঠল, সেই যাই হোক, তোকে যা বললাম খেয়াল রাখিস। সাতদিন পরে গ্রাম-প্রধান আবার দোকানে আসবে বলে গিয়েছে। আমার হয়েছে যত জ্বালা।

পাঁচু হনহনিয়ে চলে যেতেই সুদাম অন্ধকারেই জীবন মাষ্টারের টেলারিং দোকানটার দিকে তাকাল। সে যেন শুনতে পেল সেলাই মেসিনের ঘড়ঘড় আওয়াজ। জীবন মাষ্টার বসে আছে চেয়ারে হেলান দিয়ে। তার পায়ের চাপে ঘুরছে ছন্দোবদ্ধভাবে সেলাই মেসিনের চাকা। গা কাঁটা দিয়ে ওঠে সুদামের। একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল তার শরীরে। যে মানুষটা নেই অথচ তাকে নিয়ে এখন সুদাম ভয় পাচ্ছে অন্ধকারে পথ হাঁটতে। কিছুটা হেঁটে আসার পর তার মনের ভয়টা কেটে গেল। ঘরের কাছে আসতেই সে যোগমায়ার ব্যস্ত গলা শুনতে পেল, তাড়াতাড়ি আয়, বউমার ব্যথা উঠেছে।

কেমন ঘাবড়ে গেল সুদাম। বুকের ভেতর ভয় ঝাঁপিয়ে পড়ল সহসা। দাওয়ায় উঠতেই সে শুনতে পেল জবার যন্ত্রণা মাখা চিৎকার। তার গলা শুকিয়ে গেল। এখন, এই মুহূর্তে তার কী করণীয় সে বুঝতে পারল না। সে ফ্যালফ্যাল করে যোগমায়ার বার দুয়েক আসা-যাওয়া দেখল। এক সময় হতভম্ব গলায় বলে ফেলল, মা আমি কি এখন জবার কাছে যেতে পারি?

শত ঝামেলার মধ্যেও যোগমায়ার মুখে হাসি ফুটে উঠল, তোর বাবা গিয়েছে হৈমবুড়িকে ডাকতে। হৈমবুড়ি না আসা পর্যন্ত কিছু করা যাবে না। বুড়ি যদি জবাব দেয় তাহলে আমাদের এগরা হাসপাতালে যেতে হবে। এখন এত রাতে কী ভাবে যাওয়া যাবে সেই ব্যবস্থা কর। আমি এঁদিকটা সামলাচ্ছি।

পাঁচুর ভাই খেঁচুর ম্যাটাডোর চলে এই লাইনে। সুদাম নকুলকে নিয়ে চলে গেল খেঁচুর বাড়ি। ম্যাটাডোর এখনও লাইন থেকে ফেরেনি। খেঁচুর স্ত্রী আরতি বলল, আজ ফিরতে একটু রাত হবে। বেলদায় চাল নিয়ে যাবে তিন ট্রিপ। রাত এগারটার আগে মোনার বাবা ফিরবে না।

বোকার মত ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে কোন লাভ নেই। ওরা ফিরে এল সোনাঝুরি গাছের তলায়। সুদাম দরদরিয়ে ঘামছিল। কথা বলতে গিয়ে জড়িয়ে গেল কথা। নকুল তার ঘাড়ের উপর হাত রাখল, সাহস দিয়ে বলল, এত ভয় পাবার কিছু নেই। দেখবি সব ঠিক হয়ে গেছে।

ঘরের কাছে আসতেই ওরা শুনতে পেল নবজাতকের কান্না। কে যেন চেঁচিয়ে বলছে, ছেলে হয়েছে গো, একেবারে দুধ-সাদা!

॥ সাতাশ ॥

দীঘা থেকে মাছ নিয়ে ফেরার সময় মনটা বড় প্রফুল্ল থাকে সুদামের। নতুন পাতা গজানো গাছের মত সে থাকে সব সময় সতেজ এবং চনমনে। গত সিজনে তার যা লাভ হয়েছে, সেই লাভের টাকায় খড়ের চাল সারিয়ে দিয়ে ঘরের মাথায় টালি দিয়েছে সুদাম। ভরত ছেলের গর্বে এখন রীতিমতন গর্বিত। শুধু জবার মুখ ভার

থাকে সব সময়। জবা যে কী চায় এখনও ঠিকঠাক বুঝে উঠতে পারে নি সুদাম। কিছু বললেই ঝাঁঝিয়ে ওঠে জবা, মুখ গোমড়া করে বলে, তোমার রুচি আমার জানা আছে। তুমি নোনা মাছের ব্যাপারী। নুনজল ঘাঁটতে ঘাঁটতে তোমার মনটাও নোনা হয়ে গেছে এখন। তোমার কাছে বসলে এখন শুধু নোনা মাছের আঁশটে ঘ্রাণ বেরয়।

কথা শুনে হতাশ সুদাম আঁধার দেখে চোখে, জবা যে কি চায় তার কাছে সেটা আর জানা হয়ে ওঠে না। জবা যা চায় চাক, সে তার নিজের কাজ থেকে সরবে না। পুরুষমানুষের হাতে কাজ না থাকলে গ্রামাঞ্চলের মানুষ তাকে ভেড়া ভাবে। আর সেই ভেড়ার যে এক পয়সা দাম নেই— এটা সে বুঝে যায় ধীরে ধীরে। সুদাম আর যাই হোক ভেড়া হতে পারবে না। রোজ সে হাট থেকে ঘরে ফিরে জবার হাতে ভেজা টাকাগুলো ধরিয়ে দেয়। চাপা গলায় বলে, ভাল করে গুছিয়ে রেখো, দরকার হলে চাইব।

মাছ ব্যবসায় কখন কি হয় আগাম বলা যায় না। মাছ ব্যবসা হল মাঝদরিয়ার ছোট্ট ঢেউ ডিঙাটার মতন, কখন যে গোঁত্তা খেযে ডুবে যাবে কেউ জানে না। দু'পয়সা বেশি কামাই হলে সুদামের মন ভাল থাকে একথা সত্যি কিন্তু তাই বলে পয়সা নয়-ছয় হোক এটাও সে চায় না।

তার ছেলেটার বয়স এখন দু'বছর। ভরত তাকে 'রাম-রাম' বলে ডাকে। দু'বছরের রাম এখন দৌড়ে বেড়ায় সারা উঠোনময়। সুদামের সাইকেলের শব্দ পেলেই সে ঐ অত রাতে ছুটে আসে বেড়ার ধারে। তখন সুদাম হাত বাড়িয়ে ছুঁয়ে দেয় রামের শরীর। কিংবা সাইকেল বেড়ায় ঠেস দিয়ে ছেলেকে তুলে নেয় কোলে। চুমু খেয়ে আদর করে বলে, তোর মুখ দেখে গেলে আমার না হওয়া কাজও হয়ে যায়। তুই আমার পয়মন্ত ছেলে।

রোজ রামের জন্য দুটো করে রসগোল্লা আনে সুদাম। রাম খুব মিষ্টি খেতে ভালবাসে। রসগোল্লা দেখলেই তার চোখ খুশিতে নেচে ওঠে। জবা এতে অসন্তুষ্ট। গলা সপ্তমে তুলে বলে, অভ্যাস খারাপ হয়ে যাচ্ছে ছেলেটার। তোমার প্রশ্রয় পেয়ে ও মাথায় উঠে গিয়েছে। আমাকে আর মোটেও মানে না। সারাদিন শুধু ধুলো মাখছে আর বদমায়েশী করছে। জানি না বাবা, শেষে ওর কী হবে? রামের রসগোল্লা খাওয়ার নেশাটা সে বুঝি তার বাবার কাছ থেকে পেয়েছে। সুদাম যখন ছোট ছিল তখন ভরত রোজ হাট থেকে এনে দিত খেসারী ভাজা। যেদিন ভরত আনতে ভুলে যেত সেদিন সুদামের কান্না থামাতে হিমসিম খেতে হোত যোগমায়াকে। যোগমায়াও অভিমান করে বলত, তুমিই ছেলেটাকে নষ্ট করে দেবে। রোজ খেসারি ভাজা খাইয়ে তুমি ওকে নেশা ধরিয়ে দিয়েছ। এটা ভাল নয়। এখন থেকে বশ না করলে এই ছেলে একদিন মাথায় চড়ে বসবে।

যোগামায়ার কথা শুনে সহজভাবে হেসে উঠত ভরত, মাথা চুলকে বলত, আট আনার খেসারি ভাজা কিনে আনি, এ আর এমন কি বড় কথা! আমার দশটা নেই, বিশটা নেই একটাই তো ছেলে। তুমি ভেব না, বড় হলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

সাইকেলের প্যাডেল ঘোরে বনবন। যে করেই হোক আজ তাকে দুপুরের আগে মোহনপুরের হাটে পৌঁছাতে হবে। আজ রুলি মাছ পেয়েছে ত্রিশ সের একদম জলের দামে। এছাড়াও আছে সের দশেক পারা মাছ। সব বিক্রি হলে দু'দিনের লাভ একদিনে উঠে আসবে। সুদাম প্যাডেল ঘোরান থামিয়ে পলকের জন্য আকাশের দিকে তাকাল। কোনের দিকে এক খাবলা মেঘ জড়ো হয়ে আছে সেই কখন থেকে। যদি ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামে তাহলে বিক্রির বারোটা বেজে যাবে। মাছ থেকে গেলে বরফ দেবার সুযোগ নেই। যা করার এই হাটেই তাকে করতে হবে। নকুল আগে ভাগে চলে গিয়েছে, সে আর কোন ঝুঁকি নিতে চায়নি। মাছ কিনতে আড়তেই দেরি হয়ে গেছে সুদামের তাই তার এখন ব্যস্ততার কোন শেষ নেই।

সাইকেল ছুটছিল পাকা রাস্তার উপর। ফোঁটা ফোঁটা ঝুড়ি চুঁয়ান জলের দাগ পিছনে পড়ে থাকল। চেনা-জানা কারোর সাথে দেখা হলেই এড়িয়ে যাচ্ছিল সুদাম। তার এখন সময় নষ্ট করার উপায় নেই। সময় নষ্ট মানে মাছ নষ্ট, ব্যবসা নষ্ট। অনেক টাকার ক্ষতি। পানিপারুল পেরিয়ে এসে দম ছাড়ল সুদাম। এখানে এলেই তার বেশি করে মনে পড়ে ফুড়কুনীর কথা। বিষ খেয়ে এখানকার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল ফুড়কুনী। সেই দিনটা যেন তার কাছে অভিশাপের দিন।

সুধাময়ী বার তিনেক ঘুরে এসেছে কলকাতা থেকে তবু তাপস মাষ্টার ফুড়কুনীকে গ্রামে যাওয়ার অনুমতি দেননি। কেন দেননি সেটা তার নিজস্ব মামলা। তবে প্রতিবার কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এসেছে সুধাময়ী। গ্রামের লোকের কাছে সে মিথ্যা কথা বলেছে। সুখে আছে ফুড়কুনী। এই কথাটা আদৌ সত্যি নয়। সুদামের মন বলে ফুড়কুনী ভাল নেই কলকাতায়। সে তাপস মাষ্টারের খপ্পরে পড়ে গিয়েছে। তাকে সেই জাল থেকে বের করে আনা খুবই কঠিন কাজ। বারবার আসা যাওয়ায় গোবিন্দর গুরুত্ব বেড়েছে সুধাময়ীর কাছে। ফলে গোবিন্দ সুধাময়ীকে হাত করে নামমাত্র টাকায় কিনে নিয়েছে দোকানঘর। টেলারিং দোকানের সব কিছু বদলে দিয়ে সে সেখানে করেছে জুতোর দোকান। সুদাম কিছুতেই বোঝাতে পারে নি সুধাময়ীকে। বরং উল্টে চাপ দিয়ে সুধাময়ী বলেছে, গোবিন্দ আমার জন্য অনেক করেছে। ও কাজ কামাই করে আমার সাথে কলকাতায় গিয়েছে। কোনদিন না করেনি। তাই দোকানটা ওকেই আমি বেচে দিলাম। কি হবে দোকান থেকে? কি লাভ হবে দোকান রেখে? তোর কাকা শুনত না, তাই রোজ দোকানে যেত। গিয়ে তার কোন লাভ ছিল না। এতে শুধু সময় নষ্ট, আর পয়সা নষ্ট। এর চেয়ে জমিতে চাষ করা ঢের ভাল। তাতে অন্তত দুটো পয়সার মুখ দেখা যেত।

সুধাময়ীর মুখ থেকে এমন কথা শুনতে হবে সুদাম কোনদিন ভাবেনি। গোবিন্দ দোকানটা কিনে নেওয়াতে তারও মন মুচড়ে গেছে। সে যতদূর জানত— জীবন মাষ্টারের কাছে ওই দোকানটা ছিল মন্দিরের মত। চৌকাঠের বাইরে চপ্পল রেখে সে রোজ দোকানে ঢুকত। তার এই আবেগের দাম কে দেবে এখন? যে দিতে পারত,

সেই-ই এখন গ্রামছাড়া। শহরের মাটি তাকে আশ্রয় দিয়েছে। পুরোপুরি শহরের মানুষ হয়ে গিয়েছে সে। যদি না হোত তাহলে একবার কি আসত না ফুড়কুনী। জবার ছেলে হওয়ার সংবাদ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে ফুড়কুনীকে। এমন সুখের খবর শুনেও সে কোন মন্তব্য করেনি। আসলে সব কিছু ভুলে যেতে চাইছে ফুড়কুনী। সে এখন বুঝি নিজেকে নিয়ে বাঁচতে চায়? কিন্তু সে জানে না একা বাঁচায় জ্বালা কত!

সুদাম সোনাঝুরি গাছের কাছে দিয়ে সাইকেল নিয়ে চলে গেল। ঝুড়ি চুঁয়ান জলের দাগ কালো পিচের উপর জ্বলজ্বল করে উঠল। মাঝ রাস্তায় ভরতের সঙ্গে দেখা হল সুদামের। দেখা হয়ে যেন ভাল হল। ঘর খরচের মাছগুলো সে দিয়ে যেতে পারল। যে মাছ হাটে যায় সেই মাছের উপর দোকানদারের আর কোন হক নেই।

মোহনপুরের হাট জমে গিয়েছে দিনের বেলায়। গিজগিজ করছে মানুষের ভিড়। খদ্দেররাই ঝুড়ি নামায় সাইকেলের কেরিয়ার থেকে। পারা মাছ দেখে খদ্দের বলে, এ মাছের দেহে টেষ্ট আছে, কাঁটাও কম। আমাকে দু'কিলো দাও ভাই, ঝটপট ঘরে যাই। ঘরে কুটুম এসেছে।

মাত্র ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল ঝুড়ি বোঝাই মাছ। পাল্লা বাঁটখারা গুছিয়ে ঝুড়িতে ভরে রাখল সুদাম। হাটবারে বাঁটখারা হারিয়ে যাওয়ার ভয়। কেউ নিলে আর মনে করে দিতে চায় না। আর মনেও পড়ে না তাড়াহুড়োতে যাওয়ার সময়। চাপা কলে হাত-মুখ ধুয়ে এসে চায়ের দোকানে এগিয়ে গেল সুদাম। পকেটে খুচরো পয়সা ভারী হয়ে আছে। ওগুলো চা-দোকানে দিয়ে টাকা নিয়ে নেবে সে। নবীনের সাথে সুদামের অনেকদিনের জানা-শোনা। সেদিন কথায় কথায় নবীন বলল, সে সুদামের দূর সম্পর্কের আত্মীয় হয়। ভরত তার পিসেমশাই। সুদাম অত আমল দেয়নি তবু তার ভাল লেগেছিল শুনতে। পয়সা দিতে গেলে নবীন চায়ের দাম নিতে অস্বীকার করল। জোর খাটিয়ে বলল, সব জানার পরে তোমার কাছ থেকে কি করে পয়সা নিই বলো। ধরতে গেলে তুমি আমার ভাই হও। জান, মা তোমাকে একদিন ঘরে নিয়ে যেতে বলেছে। তোমার যেদিন সময় হবে বলো— আমি তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব। মা তোমাকে দেখলে খুশি হবে।

নবীনের উচ্ছ্বাস সুদামকে ছুঁয়ে দিল। কাঠের বেঞ্চিতে চা খেতে-খেতে সে আড়চোখে দেখছিল নবীনকে। কতই বা বয়স হবে নবীনের। সুদামের মনে হল এই বুঝি নবীন কুড়ির ঘর ছুঁয়েছে। অথচ তার চেহারা দেখে মনে হবে— তার বয়স বুঝি ত্রিশ-বত্রিশ।

ভাল করে চা বানিয়ে নবীন দিয়ে গেল সুদামকে। সুদাম দুটো বিস্কুট চেয়ে নিল তার কাছ থেকে। আজ দীঘায় ভাতের হোটেলে যাওয়ার সময় পায়নি সুদাম। কুয়াশা থাকায় সারণি জাল আজ অনেক দেরিতে ডাঙা ছোঁয়। মাছের আড়ত থেকে মাছ কেনা আর সমুদ্রের ঢেউ গোনা যেন একই কাজ। দশরথের ভাতের হোটেলে সে এখন আর যায় না। জামাইয়ের কাছ থেকে পয়সা নিতে পারে না শ্বশুর। একদিন

হলে অন্য কথা। যখন রোজকার প্রশ্ন তখন সে কেন শ্বশুরকে ঠকাতে যাবে? যারা পারে পারুক— কিন্তু এই কাজ সুদামের দ্বারা হবে না। ফলে শ্বশুরকে সে এড়িয়ে চলে দীঘায় গেলে। এতে সম্পর্ক গাঢ় হবে, নষ্ট হবার ভয় কম।

চা-দোকানের মরা আলোয় সুদাম নবীনের সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা বলছিল হেসে হেসে। মাছ-ব্যবসা ছাড়া আর কোন ব্যবসা করা যায় কিনা এই আলোচনা গুরুত্ব পায় ক্রমশ। আলো কমে আসা পৃথিবীতে স্বপ্ন দেখতে শুরু করে সুদাম। নবীনের কাছ থেকে হাসি মুখে বিদায় নিয়ে সে যখন তার মাছের ঝুড়ির দিকে এগোচ্ছিল তখনই হাজার কাঁকড়াবিছার কামড় অনুভূত হল তার পেটের ভেতর। কঁকিয়ে, আর্তনাদ করে সে পেট চেপে সহসা বসে পড়ল ধুলো-মাটিতে। বেশিক্ষণ বসে থাকার তার ক্ষমতা হল না, ডানা ছেঁড়া পায়রার মত ছটফট করতে করতে সে লুটিয়ে পড়ল ধুলোয়। তার এমন অস্বাভাবিক অবস্থা দেখে দোকান ছেড়ে ছুটে এল নবীন, ভিড় জমে গেল তাকে ঘিরে। মিঠে তেল আর জল দিয়ে পেটে ঘষে দিল নবীন এবং তাতেও কাজ না হতে ঘাবড়ে গেল সে। বাজারের হোমিওপ্যাথি ডাক্তারকে ডেকে আনল নবীনের পরিচিত একজন। ডাক্তারবাবু দেখলেন, ওষুধ খাওয়ালেন, আধ ঘণ্টা বিশ্রাম নিতে বললেন এবং তাতেও কাজ না হওয়াতে ঘাবড়ে গেলেন তিনি, হার মানা স্বরে বললেন, কেসটা ভাল বুঝছি না, এখুনি রোগীকে এগরা নিয়ে যাওয়া দরকার। আমার মনে হয় এর পেটে কিছু হয়েছে। টেষ্ট না করালে আগাম কিছু বলা যাবে না। যন্ত্রণায় অধীর সুদামের কথা বলার ক্ষমতা ছিল না তবু সে বহু কষ্টে বলল, আমি আর যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না। মনে হচ্ছে আমার পেটের ভেতর কেউ যেন ক্ষুর দিয়ে নাড়ি-ভুঁড়ি সব কাটছে। নবীন, তুমি আমার টাকার থলিটা রাখো। এতে মনে হয় ছ'সাত'শ টাকা আছে। যে করেই হোক আমাকে এগরা হাসপাতালে নিয়ে চলো। আর যদি সম্ভব হয় বাড়িতে একটা খবর দিয়ে দিও।

এগরার দিকে যাওয়া ট্রাক থামিয়ে সুদামকে ওঠান হল। তার আগে নবীন তার চায়ের দোকানের গনগনে আঁচে জল ঢেলে দিল। দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে সে তার জানাশোনা একজনকে টাকা দিয়ে পাঠাল সুদামের ঘরে খবর দিতে। ট্রাকের ভেতর নবীন শক্ত হাতে ধরে আছে সুদামের যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাওয়া দেহ। মাঝে মাঝে যন্ত্রণায় কেঁপে উঠছে সুদাম, গঙিয়ে উঠছে, আর কাতর আর্তনাদ ভাসিয়ে দিচ্ছে বাতাসে, আমি আর বাঁচব না। মরে যাব। উঃ অসহ্য যন্ত্রণা! আমি আর সহ্য করতে পারছি না। পাকান দড়ির মত বেঁকে যাচ্ছে সুদামের দেহ। নবীন তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, চুপ করো সুদামদা, আর একটু কষ্ট সহ্য করো, এই তো আমরা এসে গেলাম!

এগরা হাসপাতালের সামনে যখন ট্রাক এসে দাঁড়াল তখন চারপাশে আলো জ্বলে উঠেছে, অন্ধকার বিদ্যুৎ-এর আলোর কাছে হার মেনে পালিয়ে গেছে বহুদূর। এ এলাকায় এত বাড়ি-ঘর উঠেছে যেন হাওয়ার প্রবেশ নিষেধ। টিনের সাইনবোর্ড ছেয়ে আছে চারপাশ। লরীর খালাসি আর নবীন ধরাধরি করে সুদামকে নিয়ে গেল

হাসপাতালে। সুদামকে হাসপাতালে পৌঁছে ফিরে গেল লরীর খালাসি। ডাক্তারবাবু এলেন কল-বুক পেয়ে। রোগীর অবস্থা ভাল নেই দেখে তিনি নার্সকে বললেন ইনজেকশন দিতে। মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে ঝিমিয়ে গেল সুদাম। তার চোখের ঘুমের ঘোর। সে যেন চোখ মেলে তাকাতে পারছিল না। ঠিক রাত দশটার সময় হাসপাতালে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ঢুকে এল ভরত।

তার সঙ্গে এসেছে গোবিন্দ। উদভ্রান্ত জবা গোবিন্দকে জোর করে পাঠাল। বাবা ঘরে ফেরেনি বলে রাম শুধোল, মা, বাবা কখন আসবে গো? আমার যে রসগোল্লা খেতে খুব মন করছে। ও মা, বল না বাবা কখন আসবে?

অবুঝ রামকে কি জবাব দেবে জবা। বিপদে তার মাথার কোন ঠিক থাকে না। যোগমায়া খবরটা শোনার পরে কাঠ হয়ে গিয়েছে চিন্তায়। পেটের ব্যথা সুদামের মাঝে মধ্যে হয়। সেবার শীতলা মায়ের মেলায় গিয়ে হয়েছিল। সুদামই নিজের মুখে বলেছে সেই গল্প। শুনে ভয় পেয়েছে যোগামায়া। তার চোখ নেচে উঠেছে অশুভ চিন্তায়। জবা খবরটা শোনার পর থেকে কেমন ঝিমিয়ে আছে। সুস্থ মানুষটা ঘর থেকে গিয়ে এমন বিপদে পড়তে পারে— এটা সে কল্পনাতে স্থান দেয়নি। সুদাম ঘর থেকে মাছের আড়তে চলে গেলে গোবিন্দ আসে তার সাথে গল্প করতে। যোগমায়া কিংবা ভরত কেউ-ই গোবিন্দর আসা-যাওয়া পছন্দ করে না। তাছাড়া মীরা ঘরে থাকলে সেও গোবিন্দকে দু'চোখে দেখতে পারে না। কেন পারে না তা জবার জানা নেই। বাজার লাগোয়া ঘর বলেই গোবিন্দর যাতায়াত বেড়েছে। সময় পেলে ছেলে কাঁখে নিয়ে জবাও চলে যায় তার দোকানে। কত রকমের জুতো দিয়ে দোকান সাজিয়েছে গোবিন্দ। এমন দোকান দীঘা ছাড়া তার আর কোথাও নজরে পড়েনি। আশেপাশের দশ-পনেরটা গ্রামের লোক সামান্য একটা জুতোর জন্য পানিপারুল-এগরা বা রামনগর যেত। গোবিন্দ সেই সমস্ত খদ্দের ধরার চেষ্টায় ফাঁদ পেতে বসে আছে। তার তেষ্টা লাগলে সে এখন কলে গিয়ে জল খেয়ে আসে না। সোজা চলে আসে জবার কাছে, চাতক গলায় বলে, বৌদি, এক গেলাস জল দাও তো, তেষ্টায় ছাতি শুকায়।

জবা কাঁসার গ্লাসে জল দেয়। গোবিন্দ খায় আর আড়চোখে দেখে জবার রূপমাধুর্য। গোপনে সে উত্তেজিত হয়। জবা সহজেই মীরাকেও ছাপিয়ে যাবে। এ গ্রামে জবা শুধু একজনই, যার দিকে তাকিয়ে আর চোখ ফেরাতে পারে না গোবিন্দ। জবাও চোখে-চোখে হেসে কোমরে ঢেউ তুলে চলে যায় রান্নাঘরে।

তিনদিন পরে হাসপাতালের ডাক্তারবাবু ভরতকে ডেকে বললেন, আপনার ছেলে এখন একটু সুস্থ আছে। তবে একে কোন বড় ডাক্তার দেখান দরকার। আমি ওকে ডিসচার্জ করে দিচ্ছি তাইবলে আপনারা অবহেলা করবেন না। ভাল ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে পেটের একটা ফটো তুলুন। এবং সেটা যত তাড়াতাড়ি করা যায় রোগীর পক্ষে তা ভাল হয়।

ভরত সুদামকে নিয়ে ফিরে এসেছে ঘরে। ডাক্তারবাবুর কথাগুলো তার ভাল লাগেনি, মনের চিন্তা বেড়েছে। পেটের ফটো তুলতে গেলে অনেক টাকার দরকার। এখান থেকে কাঁথির যাওয়া-আসা বাস ভাড়াও কম নয়। এ কাজ তার একার দ্বারা হবে না। জবা বলল, তুমি একা যাবে কেন, বাবা! গোবিন্দদাকে নিয়ে যাও। ওসব চেনে-জানে।

টাকা কোথা থেকে আসবে? এই প্রশ্নে ফ্যাকাসে হয়ে গেল জবার মুখ। তার কাছে গচ্ছিত কিছু টাকা আছে সেই টাকা সে দেবে না। ভরত তার মনোভাব বুঝতে পেরে বলল, ঠিক আছে, কাঁসার বড় থালাগুলো বেচে দিই। ওগুলো কোন কাজে লাগে না। গোবিন্দ এগিয়ে এল ওদের কথার মাঝখানে। সে বলল, টাকার জন্য ভেব না। যত টাকা লাগে আমি দেব। আমাকে ধীরে ধীরে শোধ করে দিলে হবে।

॥ আঠাশ ॥

এরকম মহিষবর্ণ মেঘ এর আগে কেউ দেখেনি।

ঘর থেকে বেরিয়ে খুব হতাশ হল নকুল। আকাশের দিকে তাকিয়ে তার রক্ত হিম হয়ে গেল। সাত সকালে মেঘের দৈত্য-যাতায়াত তাকে খুব অসহায় করে তুলল। হাঁপিয়ে উঠল সে। সুদামের মন্দ ভাগ্যের কথা ভেবে সে ঝিমিয়ে গেল মনে মনে। তিন মাস হল এখনও সাইকেল চালাতে পারে না সুদাম। বেশি হাঁটলে চিনচিন করে পেট, জ্বালা করে শরীর, মাথা টলে, গা বমি ভাব ঠেলে ওঠে শরীর ঝাঁকিয়ে। সুদামের যে কি হল এই নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছে নকুল। কাল রাতে গিয়েছিল তার ঘরে, মাথায় হাত দিয়ে বলেছিল, তোর জন্য আমার আর কিছু ভাল লাগছে না। কাঁথির ডাক্তারও শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিল। আমি ভাবছি টাকা-পয়সা জোগাড় করে তোকে বড় কোথাও নিয়ে যাব।

ভরতের চিন্তা সংক্রামিত হয়েছিল নকুলের ভেতর। এ গ্রামে সুদাম ছাড়া তার আর কোন বন্ধু নেই। মাছখটীর কাজে এবার সুদাম যেতে পারেনি। ভরতও সুদামের চিন্তায় যেতে পারল না। বলল, ছেলে আগে না টাকা আগে? ছেলে থাকলে অমন টাকা ঢের আসবে। তুই এবার অন্য কাউকে নিয়ে যা নকুল। এবছর আর আমার যাওয়া হবে না। হৈমবুড়ি আর সঙ্গে দু'জনকে নিয়ে নকুল চলে গিয়েছিল মাছখটীতে। চারমাস তার কাজের মধ্যে কেটে গেল। মাঝে মধ্যে ঘরে এসে সে সুদামের সংবাদ নিত মেনকা বা জবার কাছে। ওরা মন খারাপ করে বলত, কি জানি কী যে হয়েছে কিছু বোঝা যায় না। শরীরটা দিন দিন ভেঙে যাচ্ছে। ঘর থেকে পাকা রাস্তা অব্দি আসতেই তার হাঁটু ধরে যায়। পেট চেপে বসে পড়ে গাছতলায়। কেমন অসহায় চোখে তাকায়। দেখতে খুব খারাপ লাগে। কিছু দিলে খায় না। বলে, বমি হয়ে যাবে।

ডাক্তারী ওষুধে কাজ হচ্ছে না দেখে সুদামকে রামনগরের গুণিনের কাছে নিয়ে

গিয়েছিল নকুল। গুণিনের দেওয়া শেকড়বাঁটা খেয়ে পেট ছেড়েছে সুদামের। তার অবস্থা আরও খারাপের দিকে। শেষে গাছ-গাছড়ার ওষুধ বন্ধ করায় রক্ষে। ভরত অসহায় গলায় বলল, নকুল, আমি তোর কাছে অনেক আশা নিয়ে ছুটে এলাম। তোর জেঠতুতো দাদা ভগীরথ খড়গপুরের বড় হাসপাতালে কাজ করে। শুনেছি ওখানে অনেক বড় বড় ডাক্তার আছে। তুই একবার যা না যদি কিছু উপকার হয়। আমি আর ছেলেটার কষ্ট দেখতে পারছি না। আমার চোখ ফেটে সব সময় জল আসছে। মনটা বড় কু গাইছে। তোর কাকিমাও খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়েছে ছেলের চিন্তায়।

নকুল অন্ধকারে তাকিয়ে থাকল কিছু সময়; তারপর বলল, যেতে আমার কোন আপত্তি নেই। তবে গিয়ে কাজ হবে তো?

কাজ হোক বা না হোক তবু তো যাওয়ার দরকার। মন মানে না। ছেলেটাকে দেখলে আমার বুক ভেঙে যায়। আমি যে কী করব কিছু বুঝতে পারছি না। ভরতের গলা বুজে এল। নকুল তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, তুমি ভেবো না কাকা, আমি কালই ওকে খড়গপুরে নিয়ে যাব। আমার সাথে জবা যেন যায়। আমি একা হয়ত সবদিক সামলাতে পারব না। ও সঙ্গে গেলে আমার অনেক সুবিধা হবে।

ঠিক আছে, তাই হবে। ভরত অন্ধকারে চলে গেল।

খড়গপুরে যাবার জবার ইচ্ছে ছিল না মোটে। রাতে তার ভাল ঘুম হয় না চিন্তায়। সারারাত সুদামও ঘুমায় না, যন্ত্রণায় কোঁকায়। জবা বিরক্ত হয়। সারা দিন তার কাজের শেষ নেই। রাতটুকু যদি এভাবে নষ্ট হয় তাহলে মন-মেজাজ বিগড়ে যেতে কতক্ষণ? জবারও চোখের নীচে কালি জমেছে। সে একটু কাজ করলে হাঁপিয়ে ওঠে। শরীর আনচান করে। ঘুম ঘুম পায় সবসময়। তবু সুদামের প্রতি অমনোযোগী হলে যোগমায়া দাঁত খিঁচায়। মুখের উপর কটু কথা বলে দেয়। আর সেই কথাগুলোই সবসময় কানে বাজে জবার। সে ঘেমে ওঠে। অস্থির চোখে সুদামের দিকে তাকায়। কঙ্কালসার দেহ নিয়ে সুদাম হাঁটু মুড়ে মুখ নীচু করে বসে আছে বিছানায়। দু-চোখ জলে ভরা। মনে বিরাজ করে বিশাল শূন্যতা। এই শূন্যতার ভেতর সে কি দেখে রোগ-যন্ত্রণার কালো ছায়া? তবে নিজের ভবিষ্যৎ ভেবে এখন প্রায়ই আঁতকে ওঠে সুদাম। তার যে এমন কিছু একটা হবে সে বুঝি আগে থেকে জানত। জবার হাতটা ধরে সে প্রায় দিন বলে, রামের দিকে খেয়াল রেখো। আমি থাকি বা না থাকি রামের যেন অনাদর না হয় কোনদিন।

জবা ফুঁপিয়ে ওঠে, এমন কথা কেন বলছ? অসুখ-বিসুখ কারোর কি কোনদিন হয় না? অসুখ যেমন আছে, তেমন ওষুধও আছে। তুমি অযথা চিন্তা করো না। দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।

জবার মনের জোর সুদামের অসুস্থ দৃষ্টির কাছে স্রোতের মুখে অসহায় খড়কুটোর মত। তবু জবা দৃঢ়তা দেখিয়ে বলে, তোমার যে অসুখ হয়েছে, সে অসুখ এখন ঘরে-ঘরে। তেল-মশলা কম খেলে এটা কোন অসুখই নয়।

ভরতের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল জবা। তার জমানো টাকা নিয়ে সে নিজের ব্যাগটা

গুছিয়ে নিল। ভগীরথের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছে মাত্র একবার। হাসপাতালে কাজ করলেও ঐ মানুষটার মধ্যে অহঙ্কারের কোন ছায়া নেই। গ্রামের মানুষ স্বাস্থ্যগত কারণে কোন বিপদে পড়লে তার কাছে চলে যায়। এ গ্রামের সবাই কোন না কোনভাবে তার কাছে উপকৃত। সুদামের সঙ্গে যথেষ্ট সৎভাব আছে ভগীরথের তবু সে ধরা গলায় বলল, নিজের জন্য কারোর কাছে যেতে মন চায় না। ভগীরথদা ভাল মানুষ। আমরা সবাই গেলে তার উপর অত্যাচার করা হবে। সে মুখ ফুটিয়ে কিছু না বললেও মনে মনে নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হবে। শহর-বাজারে জিনিসপত্রের যা দাম তাতে কারোর ঘাড়ে চাপতে আমরা মন থেকে সায় দেয় না।

জবা বলল, আমরা তো রোজ যাচ্ছি না, ঠেকায় পড়ে যাচ্ছি। আপদে-বিপদে মানুষ তো মানুষের কাছে যায়। এতে অন্যায় নেই।

সুদাম নিমতেতো চোখে তাকাল, তবু আমার মন সায় দেয় না। ভগীরথদা গরীব মানুষ। আমরা সবাই গেলে তার উপর অত্যাচার হবে।

ভরত সুদামকে বোঝাল, ভগীরথ আমাদের গ্রামের ছেলে। তার উপর সে আমাদের জ্ঞাতি কুটুম। বিপদে পড়ে কেউ গেলে সে নিশ্চয়ই কিছু মনে করবে না। আমি যত দূর মানুষ চিনি তাতে মনে হয় ভগীরথ খুব উঁচু মনের ছেলে।

ঠিক হল সকালের বাসে ওরা চলে যাবে খড়গপুর। সারারাত নানা চিন্তায় ঘুম হল না সুদামের। জবার তন্দ্রা মতন এসেছিল। তখনই আবার মোচড় দেওয়া ব্যথাটা চাগিয়ে তুলল সুদামকে। তার যন্ত্রণার শব্দগুলো ভরতের কানে পৌঁছে যেতে ছুটে এল সে। ব্যস্ত হয়ে বলল, একটু ঘুমাবার চেষ্টা কর, বাবা। ভোর রাতে আমি তোকে ঠিক তুলে দেব। সারারাত জাগলে অতটা পথ যাবি কিভাবে?

ভরতের এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না সুদাম, কষ্টে মুখ ঘুরিয়ে নিল সে। কাঁথির ডাক্তার বলেছে, অসুখটা ভাল নয়। বেরিয়াম মিল এক্স-রে রিপোর্টে ধরা পড়েছে পেটের ঘা। কড়া কড়া ওষুধ খেয়েও কাজ হল না তিন মাসে। হাল ছেড়ে ডাক্তার বলল, অপারেশন করতে হবে। তবে রোগীর যা হার্টের অবস্থা এই অবস্থায় অপারেশন করলে জ্ঞান না ফিরতেও পারে।

ভরত এসব কথা শুনে কোন ঝুঁকি নিতে চায় নি। মনের কথা সে লুকিয়ে রেখেছে মনের ভেতর। জবা শুধালে সে বলেছে, হ্যাঁ, ভাল হয়ে যাবে ডাক্তার বলেছে। ওর শরীরটা একটু সারুক—তারপর নয়ত কলকাতায় নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে আনবো।

দীর্ঘদিন কাজ বন্ধ সুদামের। যার কাঁচা পয়সা গোনার অভ্যাস, সে হঠাৎ বিছানা নিলে সংসারের চাকা দেবে যাবেই যাবে। জবা তবু কাউকে কিছু বুঝতে দেয় না। গোবিন্দ বার তিনেক তাকে টাকার কথা বলেছে। সে সবিনয়ে বলেছে, দরকার পড়লে নেব। এখন দিন চলে যাচ্ছে। এখন আর কারোর কাছে হাত পাততে চাই না। উধার নিলে তো ফেরৎ দিতে হয়। ধার নেওয়ার আগে ফেরৎ দেওয়ার কথা ভাবা দরকার। না হলে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাবে।

সোনাঝুরি গাছের তলায় সবার আগে হাজির হয়েছে নকুল। এমনিতে তার ভোরে

ওঠার অভ্যাস, ফলে সাত সকালে বিছানা ছাড়তে তার কোন অসুবিধা হল না। মেঘের চেহারা দেখে সে যতটা ঘাবড়ে গিয়েছিল আলোর মুখ দেখে সে ততটাই প্রসন্ন বোধ করল। জোরে হাওয়া বইছিল ধানখেতের উপর দিয়ে। সেই দামাল হাওয়া দীঘার দিকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে মেগের বংশ। এখন ফুটফুটে আলোয় জেগে উঠছে সকাল। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে ঠাণ্ডা আমেজ। শুধু সোনাঝুরি আর আমগাছের তেলা পাতা ভিজে গেছে শিশির-ঘামে। এ সময় ঘাসেরা বড় প্রাণবন্ত। শুধু সুদাম এসে ঝিমুনি ভরা শরীর নিয়ে দাঁড়াল। তার পাশে গায়ে চাদর জড়িয়ে জুবুথুবু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল জবা। শীত যেতে যেতে তার লেজটুকু লুকিয়ে রেখেছে পৃথিবীর ভেতর।

ভরত গায়ে ধুতি জড়িয়ে কুণ্ঠিত শরীরে পাকা রাস্তায় এসে দাঁড়াল। বিড়ির ডিবা থেকে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বের করে নকুলকে দিয়ে বলল, আমার কাছে যা ছিল সব দিয়ে দিলাম। তুই সাবধানে সুদামকে নিয়ে যাস। সেরকম অসুবিধা বুঝলে হোটেলে খেয়ে নিস। যদি সম্ভব হয় হরি জানার বাড়িতে একটু ফোন করে দিবি। আমি সন্ধেবেলায় ওখানে যাব খোঁজ নিতে।

ভরতের চিন্তা নকুলকে কাঁপিয়ে দিল, সে ভাঁজ করা টাকাটা ফিরিয়ে দিয়ে বলল, কাকা, এই টাকাটা তুমি কাছে রাখো। আমার কাছে বাড়তি টাকা আছে, কোন অসুবিধা হবে না।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও টাকা ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হল ভরত। কথার ফাঁকে বাস এসে থামল সোনাঝুরি গাছের ছায়ায়। জবা রামের হাত ধরে আগে উঠে গেল বাসে। নকুলের সাহায্য নিয়ে সুদাম উঠল ধীরে-সুস্থে।

সকালের বাসে ভিড় বেশি নেই ফলে বসার জায়গা পেয়ে গেল ওরা।

অনেকক্ষণ পরে বিরক্ত সুদাম বলল, মিছিমিছি যাচ্ছি আমরা। তবে আমি ভালমতন জেনে গেছি— এ রোগ ভাল হবার নয়। কথাগুলো বলে বাইরের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সুদাম। জলে বোঝাই হয়ে গিয়েছে তার চোখ। চোখের নীচের চামড়া নড়ছে থরথরিয়ে।

নকুল আলতো ভাবে চেপে ধরল সুদামের হাত, তোর এত ভয় পেলে চলবে, রোগ জ্বালা কার না হয়? ও নিয়ে ভাবিস না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

সুদাম বাইরে থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বলল, যা আমি বলছি তা আমার মনের কথা নয়, কেউ যেন আমাকে দিয়ে বলিয়ে নিচ্ছে। আমি চলে গেলে আমার আর কি হবে, আমার চিন্তা শুধু জবা আর রামকে নিয়ে। রাম এখনও ভাল করে তার বাবাকেই চিনল না?

নকুল ধমকে উঠল সুদামকে, সারাক্ষণ বুঝি এসবই ভাবছিস? তোর কি হয়েছে বল তো? মনের জোর হারাসনে তাহলে মানুষের পায়ের তলার মাটি সরে যায়।

মলিন হেসে দুর্বলভাবে তাকাল সুদাম, আমার পায়ের তলায় মাটি নেই, শীতলা মায়ের মেলার রাতেই সরে গেছে। সেদিনই হয়ত প্রাণটা বেরিয়ে যেত শুধু ফুড়কুনীর জন্য হয়ত বেঁচেছিলাম। আসলে ওকে আমি মেলায় নিয়ে গিয়েছিলাম। ঘরে না পৌঁছান

পর্যন্ত আমার সেই দায়িত্ব শেষ হয় কি করে? সেদিন আমি মরিনি, কিন্তু মনে মনে মৃত্যু কি জিনিস তা আগাম টের পেয়ে গিয়েছিলাম। সেই ভয়টা এতদিন আমার ভেতর লুকিয়ে ছিল। মোহনপুরের হাটে সেই ভয়টাই আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পাই দরজা খুলে রেখেছে যমরাজ, সে আমাকে হাতের ইশারায় ডাকছে। আমি যাব যাব করেও যেতে পারছি না তার কাছে। জবা-রাম আর মীরা আমার পিছু ডাকছে।

কৌশল্যা মোড়ে বাস যখন থামল তখন বেলা আটটা। রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে মানুষ ব্যাগ হাতে। দু'ধারের দোকানগুলো জেগে উঠেছে ঘুম ভেঙে। নকুল খুব অবাক চোখে দেখছিল কৌশল্যার পরিবর্তন। মাত্র দশ বছরে কত বদলে গেছে জায়গাটা। বড় বড় বাড়িগুলো উঁচু মাথায় রোদ মেখে নেয়। স্ট্যাণ্ডে এসে নকুল দুটো রিকশা নিল। সে একা থাকলে হেঁটেই মেরে দিত পথটা। কিন্তু সুদামের জন্য সে রিকশা নিতে বাধ্য হল।

হাসপাতালের গেট পেরিয়ে তারা যখন কোয়ার্টারে পৌঁছাল তখন একটু দূরে রেলপথ কাঁপিয়ে পুরীর দিকে ছুটে গেল মেল-ট্রেন। এর আগে রাম বা জবা কোনদিন ট্রেন দেখেনি, ওরা অবাক চোখে দেখল লৌহদানবের ছুটে যাওয়া। নকুল ভগীরথকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল সুদামের অসুখের কথা। সব শুনে ভগীরথ বলল, চিন্তা করিস না। এখানে এনে ভালই করেছিস। দরকার হলে আমি সুদামকে ভর্তি করিয়ে দেব। এই হাসপাতালে অনেক ভাল ভাল ডাক্তার আছে। তারা সবাই আমাকে জানে চেনে। ফলে সুদামের চিকিৎসার কোন অসুবিধা হবে না।

জবা রেল-লাইনের দিকে তাকিয়ে থাকলেও তার কান ছিল ভগীরথের কথার উপর, সে এগিয়ে এসে বলল, আমি বহু আশা নিয়ে এখানে এসেছি। ওকে সুস্থ করে তোলার সব দায়িত্ব তোমাকেই নিতে হবে।

ভগীরথ হাসল, শেষে অভয় দিয়ে বলল, এটা কোন রোগই নয়। ঠিকমত চিকিৎসা করালে আজকাল সব রোগ ভাল হয়ে যায়। যাও, হাত-মুখ ধুয়ে তোমরা কিছু টিফিন করে নাও। তারপর আমরা সুদামকে হাসপাতালে নিয়ে যাব।

ডাক্তার সাঁতরা মাটির মানুষ। তিনি সব রিপোর্ট পরীক্ষা করে গম্ভীর গলায় বললেন, খুব ক্রিটিক্যাল কেস। অপারেশন ছাড়া গতি নেই। বেরিয়োম রিপোর্টে যা দেখেছি তাতে পেটের অনেকটা এরিয়া এফেক্টেড। ফাইন্যাল কিছু করার আগে একবার এ্যাড্রোস্‌কপি করিয়ে নিতে পারলে আরো সিওর হওয়া যায়। আমি লিখে দিচ্ছি— তুমি পেসেন্টকে নিয়ে কালই মেদিনীপুর চলে যাও। এ্যাড্রোস্‌কপির রিপোর্টটা আমাকে দেখিও। তারপর যা করার একটা কিছু করব।

হরি জানার বাড়িতে 'এস.টি.ডি.বুথ' থেকে ফোন করে দিল নকুল। ভরতকে আশ্বস্ত করার জন্য বলল, সুদাম আগের চেয়ে অনেক ভাল আছে। তোমরা চিন্তা করো না। আমাদের যেতে দু-একদিন দেরি হবে।

ডাক্তার সাঁতরা এ্যাণ্ড্রোস্কপির রিপোর্ট দেখে ভ্রু কুঁচকে বললেন, সরি ভগীরথ, এই কেসটা এখানে অপারেট করলে রিস্ক থেকে যাবে। তুমি বরং একটা কাজ কর। পেসেন্টকে নিয়ে কলকাতায় চলে যাও।

ভগীরথ মুখ কাচুমাচু করে বলল, কলকাতায় কোথায় যাব, স্যার। ওখানে আমাদের কেউ পাত্তা দেবে না। তাছাড়া পেসেন্ট-পার্টির বাড়ির অবস্থা ভাল নয়। মাছ-ব্যবসা করে সংসার চলত। এখন প্রায় মাস চারেক বসে আছে।

তা তো বুঝলাম, কিন্তু —

আপনি যা হোক কিছুর একটা ব্যবস্থা করে দিন। ভগীরথ জোর দিল।

ডাক্তার সাঁতরা অনেকক্ষণ ভেবে বললেন, আপাতত যা ওষুধ লাগবে আমি সব স্যামপেল ফাইল দিয়ে দিচ্ছি। এন-আর-এস'-এ আমার এক বন্ধু থাকে— ডাঃ মিত্র, তাকে আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি, তুমি দেরি না করে চলে যাও। আমার চিঠি নিয়ে গেলে মনে হয় কাজ হবে।

ফ্রি'তে যাতে চিকিৎসা হয়— সেই কথাটাও লিখে দেবেন। বড় হাসপাতালের বড় ব্যাপার। না হলে শেষে আমরা বিপদে পড়ে যাব।

চিঠি লিখে দিলেন ডাক্তার সাঁতরা। কোয়ার্টার ফিরে এসে ভগীরথ চিন্তিত গলায় বলল, সুদাম আমার এখানে থাকুক। তোমরা বাড়ি ফিরে যাও। শুধু শুধু তোমরা এখানে থেকে কি করবে? আমি কাল সকাল পাঁচটা-পাঁচের লোকালে সুদামকে নিয়ে কলকাতায় যাব। দেখি, ওখানে কিছু ব্যবস্থা করতে পারি কিনা!

জবা আর নকুল ফিরে এল কৌশল্যায় বাস ধরার জন্য। ছোট্ট রাম কিছুতেই তার বাবাকে ছেড়ে যাবে না। সে কেঁদে-কেটে বলল, আমি বাবার কাছে থাকব। ট্রেন গাড়ি দেখব।

জবা তাকে জোর করে তুলে নিল কোলে। সুদামের কাছে গিয়ে কাঁপা কাঁপা ঠোঁটে সে বলল, ভাল থেকো। ভগবানকে ডাকো। সব ঠিক হয়ে যাবে। চোখের জলে পুরো পৃথিবীটাই ঝাপসা হয়ে গেল জবার।

॥ উনত্রিশ ॥

প্রকৃতির লীলা বোঝা দায়।

ভগীরথের সাইকেলে বসে সুদাম যখন হাসপাতালের গেটের কাছে পৌঁছাল তখন সন্ধ্যার আকাশ ছেয়ে ফেলেছে মেঘে। এলোমেলো বাতাসে দুলে উঠেছিল ইলেকট্রিকের তার। সুদাম ভয় পাওয়া চোখে তাকাল। হু-হু করে ছুটে আসা শীত হাওয়া হঠাৎ-ই কাঁপিয়ে দিল তাকে।

ভগীরথ আকাশের দিকে তাকিয়ে চঞ্চল হয়ে উঠল, বৃষ্টি নামবে মনে হচ্ছে।

চল, তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে যাই। কাল আবার ভোরে উঠতে হবে। পাঁচটা-পাঁচের লোকালটা যে করেই হোক ধরতে হবে। নাহলে ডাক্তারবাবু বেরিয়ে গেলে মহা মুশকিলে পড়ে যাব।

সুদামের এসব চিন্তা ছিল না। সে এখন নিজেকে ছাড়া আর অন্য কোন কিছু ভাবতে পারে না। ক'মাস থেকে মৃত্যুচিন্তা তাকে বড় ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। প্রতিনিয়তই হাতটা তার চলে যায় পেটের কাছে। তখনই দুশ্চিন্তার রেখাগুলো প্রকট হয়ে ওঠে চোখে-মুখে। সে স্পষ্টত অনুমান করতে পারে রক্তহীন হয়ে যাচ্ছে তার চোখ-মুখ। চিনচিনে ব্যথাটা পেট থেকে ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ে সর্বাঙ্গে। এ ব্যথার বুঝি শেষ নেই। সে কি তাহলে হেরে যাবে? রাম তো বাবা বলতেই অজ্ঞান। এ পর্যন্ত জবাও তার সঙ্গে কোন খারাপ ব্যবহার করেনি। তবে তার ব্যবহারে একটা গাছাড়া ভাব এসেছে। এর জন্য জবা হয়ত পুরোপুরি দায়ী নয়। দীর্ঘস্থায়ী অসুখ অনেক সময় সম্পর্কে পাচিল তুলে দেয়। বিরক্ত হয় কাছের মানুষ। রোগশোক কার-ই বা ভাল লাগে এত? সুদাম মনে মনে নিজেকে শক্ত রাখার চেষ্টা করল। দীর্ঘ মেয়াদী যন্ত্রণাকে হজম করার ব্যর্থ চেষ্টায় সে নিজেকে আরও তৎপর করে তুলল। কিন্তু পারল না। বেড়ালের থাবা নয় যেন বাঘের কঠিন থাবা হয়ে অসুখটা ছিঁড়েখুঁড়ে দিতে চায় তার পুরো শরীর। দুবলা পাতলা রোগজর্জরিত সুদাম তা সহ্য করতে পারছে না। ফলে চোখের কোণ দুটো তার ভিজে গেল অক্ষম দুর্বলতায়। ক'পা হেঁটে এসে সে চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়াল। সুস্থ থাকলে সে এক কাপ চা খেত নির্ঘাৎ কিন্তু আজ আর চায়ের কথা সে ভুল করেও মনে আনল না।

ভগীরথ সাইকেল স্ট্যাণ্ড করে অর্ডার দিল চায়ের। সুদামকে চা-খাওয়ার অনুরোধ করতেই অসহায় ভঙ্গিতে সে বলল, না ভগীদা, চা খেলে আবার পেটের ব্যথাটা বাড়বে। সারা রাত তাহলে আমাকে নিয়ে তোমাকে ভুগতে হবে।

ভগীরথ কি বুঝে বলল, তুই অনেকটা দুর্বল হয়ে গিয়েছিস। এখানে মাস খানিক আগে এলে ভাল করতিস। এখন আর পেটের রোগটা কোন রোগ নয়। তোর মতন পেটের রোগ নিয়ে কত মানুষ দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে—

আমি যদি তাদের মত হতে পারতাম? সুদামের মুখ ফসকে বেরিয়ে এল প্রশ্নটা। এত হৃদয়-ছোঁয়া প্রশ্ন যা শুনে ভগীরথ মর্মভেদী দৃষ্টি মেলে সুদামের মুখের দিকে তাকাল। সুদাম আরও অনেকদিন বাঁচতে চায়, এ পৃথিবীর মায়ায় সে জড়িয়ে গেছে, সংসার তাকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধেছে যা তার কথায় স্পষ্ট অনুমান করতে পারে ভগীরথ। তার মনে সুদামের জন্য সহানুভূতি জন্মায়। সে সুদামের ঘাড়ের উপর সান্ত্বনার হাত রেখে বলে, তোর রোগটা কোন রোগই নয়। এ হাসপাতালে আমার পনের বছর চাকরি হল। ডাক্তারদের সাথে থেকে এরকম পেটের রোগ আমি বহুলোকের দেখেছি। তারা আসে, হাসপাতালে ভর্তি হয়। আবার সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরে যায়।

ঘরে ফিরে গিয়ে তারা কি আবার আগের মত কাজকর্ম করতে পারে? সুদাম জানতে চাইল তার ইচ্ছের কথা।

ভগীরথ বলল, প্রথম প্রথম একটু অসুবিধা হলেও পরে সব ঠিক হয়ে যায়। আসলে এ রোগে মনের জোরটা হল বড় কথা।

আমি কেন মনের জোরটা হারিয়ে ফেলেছি ভগীদা?

তুই অনেক ভাবছিস— সেই জন্য। এবার থেকে মনে কর তোর কোন অসুখ হয়নি। তুই পুরোপুরি সুস্থ। দেখবি তাহলে কেমন মনের স্ফূর্তি বেড়ে যাবে। আসলে সব কিছুতেই মানুষের মনের জোরটাই হল আসল কথা।

ভগীরথের কথায় এক মত হতে পারল না সুদাম, ডুবে যাওয়া মানুষ খড়কুটো ধরে বাঁচতে চায়। আমি নিজেও তাদের থেকে আলাদা নই। আমি জানি, আমি ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছি, হাত-পা ছুঁড়ছি কিন্তু ধরবার মত খড়কুটো বা ডাঙা পাচ্ছি না। জান ভগীদা, আমার চোখ থেকে ধীরে ধীরে আলো মুছে যাচ্ছে। কেউ যেন আমার পায়ের তলার মাটি কেড়ে নিচ্ছে। আমার সব সময় শুধু মনে হয় আমার যা হয়েছে তা বুঝি কোনদিনও সারবার নয়। তা যদি হোত তাহলে কি এতদিন লাগে একটা ব্যথা সারতে?

তোর এই ধারণাটাই ভুল।

আমার মন যা বলে তা কোনদিন ভুল হয় না। আমি সব কিছু চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। তোমরা বৃথা চেষ্টা করছ। আমার বিশ্বাস তোমরাও একদিন হেরে যাবে। আমিও হেরে যাব।

কালো ধূমল মেঘের দিকে তাকিয়ে আঁতকে ওঠে ভগীরথ। তবু সে সুদামের কাছে হারবে না। গলায় দৃঢ়তা মাখিয়ে বলল, যার অসুখ করে তার মনে নানান চিন্তা এসে জড়ো হয়। এটাই স্বাভাবিক। তবে এটা ঠিক— সে যা ভাবে সেটাই একমাত্র কথা নয়। কথার সামনে এবং পিছনেও কিছু কথা থাকে। ডাক্তার মিত্র আমাকে বলেছেন, তুই ভাল হয়ে যাবি। আবার আগের মত ব্যবসা করতে পারবি।

জান ভগীদা, আমার মরতে একদম মন চাইছে না। মরে যেতাম আনন্দে যদি ছেলেটা একটু বড় হত। এখন আমার যদি কিছু হয় তাহলে রামের কিছু মনে থাকবে না। সে তার বাবার মুখটা মনে করতেই পারবে না। সুদাম গালে হাত দিয়ে উদাস চোখে তাকাল, সারা জীবন শুধু কষ্টই পেয়ে গেলাম। যখন সুখের মুখ একটু দেখলাম তখন বিরূপ হল শরীর। শরীর না চাইলে মানুষ মনে হয় কোন কিছু করতে পারে না। অথচ [illegible] আমার এই সহজ কথাটা বুঝতে চায় না। সে হয়ত ভাবে আমি ইচ্ছে করেই এসব করছি।

জবার এসব ভাবা উচিত নয়। ও এখানে আসলে আমি সব বুঝিয়ে বলব। ভগীরথ ব্যস্ত হয়ে উঠল বাসায় যাবার জন্য। তাড়াতাড়ি চল। ঘরে গিয়ে নাহলে আবার তোর বৌদির মুখ ঝামটা শুনতে হবে।

ভগীরথের সাইকেলের ক্যারিয়ারে বসে আছে সুদাম। ছায়া ঢাকা পথে অন্ধকার হামাগুড়ি দেয়। স্ট্রীট-লাইটের আলোয় পথ কখনও বা আলোকিত, যেখানে আলো পৌছায় না সেখানেই বুঝি সুদামের চোখ চলে যায়। এতবড় হাসপাতাল সে এর

আগে কোনদিন দেখেনি। বাড়ি থেকে আসার সময় তার মনে বিশ্বাস ছিল—খড়গপুরে সে হয়ত সুস্থ হয়ে যাবে। ডাক্তার সাঁতরার কথা শোনার পর তার মনে ফাটল দেখা দিয়েছে। সেই ফাটলের উপর দাঁড়িয়ে আছে জবা মুখ কালো করে। ও ভয় পেয়েছে নিজের ভবিষ্যৎ ভেবে। দোষ দিয়েছে তার ভাগ্যকে। যার হাত সে ধরল সেই হাত যে এত অল্প সময়ে শক্তিহীন হয়ে যাবে— এটা সে ভাবতেই পারছে না। বাসে ওঠার সময় জবা করুণ চোখে তাকিয়ে ছিল, যেন এ দেখাই তার শেষ দেখা। জবার সেই আর্তিভরা চাহনি আরও বেশি অসহায় করে তুলছে তাকে। এ অবস্থায় সুদাম কোথায় দাঁড়াবে? আর কেউ না থাকুক জবাকে সে পাশে পেলে ঠিক ঘুরে দাঁড়াতে পারবে। কিন্তু জবা যেন ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকার গহ্বরে।

সিঁড়ি ভেঙে চারতলায় উঠে এসে হাঁপিয়ে পড়ল সুদাম। শীত-হাওয়ার মধ্যেও ঘাম ফুটে বেরল তার শরীরে। সুদাম বড় করে শ্বাস ছেড়ে বলল, এইটুকু সিঁড়ি ভেঙে আমি কেমন হাঁপিয়ে গিয়েছি দেখো। আমার শরীরে আর এক ফোঁটা জোর নেই। ভগীরথ বলল, চারতলা অব্দি ওঠা মুখের কথা নয়। আমি রোজ উঠি তবু হাঁপিয়ে যাই। এই দেখ আমার শরীরেও ঘাম বেরচ্ছে। এর জন্য এত ভাবলে চলবে না। যা হবার তা তো হবেই।

ভগীরথের ঘরখানা ছিমছাম, সাজান গোছান। রমা সারাদিন ব্যস্ত থাকে ঘরের কাজ নিয়ে। দুটি মানুষের সংসারে বাড়তি ঝামেলা হয় অতিথির চাপ। গ্রামের চেনা জানা মানুষগুলো দায়ে পড়লে এখানেই চলে আসে। ভগীরথের বাসাখানা তাদের নিরাপদ আশ্রয়। রমা এতে কোনদিনও বিরক্তিবোধ করে না। অতিথি সেবা তার কাছে নারায়ণ সেবা। বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারলে সে খুশি হয়।

ভগীরথ রমার এককাঠি উপরে। সে তার অল্প বেতনে মোটেও অতৃপ্ত নয়। বরং বড় মুখ করে বলে, অভাব না থাকলে মানুষের দুঃখ বুঝব কি করে? টাকা মানুষকে অনেক সময় অমানুষ করে দেয়।

রমা তার কথাকে সমর্থন করে, টুসটুসে ঠোঁটে হাসি ছড়িয়ে বলে, আমাদের দিন চলে গেলেই হল। আমার আর বেশি কিছু চাই না।

ভোর রাতে বৃষ্টি নামল ঝমঝমিয়ে। শীতের বৃষ্টি বরাবরই পীড়াদায়ক। ঠাণ্ডা হাওয়া আছড়ে পড়ে বন্ধ জানালায়। ঐ অত বৃষ্টির মাঝেও চাঁদ উঠেছে মস্ত থালার মত। জ্যোৎস্নায় ধুয়ে আরও ধারাল হয় রেলপাত। কিছুতেই ঘুম আসে না সুদামের। ছেঁড়া ছেঁড়া ঘুমের মধ্যে প্রায়ই সে দুঃস্বপ্ন দেখে বিছানায় উঠে বসে। খুব করে মনে পড়ে জবার কথা। তার ভাগ্যের সঙ্গে এখন জড়িয়ে আছে জবার ভাগ্য। জবা এই সত্যটাকে মেনে নিতে পারছে না মন থেকে। বিরাট এক অতৃপ্তি তাকে ছুঁবলে দেয় সবসময়। সুদাম বুঝতে পারে, বুঝেও চুপ করে থাকে সে।

রমা ঘুম ভেঙে উঠে পড়েছে বৃষ্টির শব্দে। লাইট জ্বেলে সে দেখল পাশের ঘরে জেগে বসে আছে সুদাম। রমা আশ্চর্য হয়ে শুধাল, সুদামদা, কি ব্যাপার— তুমি কি সারারাত জেগে বসে আছো?

সুদাম মলিন হেসে বলল, ঘুম আসে না বৌদি। একটু ঘুমালে হাজার চিন্তা এসে মনটাকে বড় উতলা করে দেয়।

এভাবে রাত জাগলে শরীর আরও খারাপ হয়ে যাবে।

আমি সব জানি। কিন্তু কি করব? ঘুম যে আসতে চায় না।

ডাক্তারবাবুকে বল না কেন? তিনি ঘুমের ওষুধ দেবেন।

ঘুমের ওষুধ অনেক খেয়েছি তবু ঘুম আসে না। জান বৌদি, এরকম রাতের পর রাত আমি জেগে বসে থাকি। আর ভাবি — ভগবান আমাকে কেন সুস্থ করে পাঠাল না!

রমা আর কথা না বাড়িয়ে বাথরুমের দিকে চলে গেল। দেওয়াল ঘড়িটায় তখন চারটে বাজে। শোওয়ার আগে ভগীরথ তাকে বলেছে— ঠিক চারটের সময় তাকে বিছানা থেকে তুলে দিতে। রমা গিয়ে জাগিয়ে দিল ভগীরথকে, তাড়া দিয়ে বলল, সকাল পাঁচটা পাঁচের লোকাল ধরতে হলে তোমাকে এখনই উঠতে হবে। যাও চোখ-মুখ ধুয়ে নাও। আমি চা-করে দিচ্ছি। তাহলে ঘুম আর থাকবে না, শরীর ছেড়ে পালাবে।

ভগীরথ ধড়ফড় করে উঠে বসল বিছানায়। বার চারেক চোখ রগড়ে নিয়ে সে নেমে এল খাট থেকে। অতি দ্রুত তৈরী হয়ে নিয়ে সে সুদামকে বলল, চলো, আর দেরি করা যাবে না। স্টেশন এখান থেকে দশ মিনিটের পথ। আমি সাইকেলেই যাব।

রমা বলল, সাইকেল যে নিয়ে যাবে, রাখবে কোথায়?

ভগীরথ বলল, রাখার কি জায়গার অভাব? সাইকেল স্ট্যাণ্ডে রেখে দিলে এক টাকা নেবে। ফেরার সময় তাহলে রিকশা লাগবে না। দশটা টাকা বেঁচে যাবে। চারতলা থেকে অদ্ভুত কায়দায় সাইকেলটা নামিয়ে আনল ভগীরথ। রমা তার পিছন পিছন এল। রাস্তায় নেমে এসে রমা বলল, তাড়াতাড়ি চলে এসো, রাত করবে না। তুমি না ফেরা পর্যন্ত আমি খুব চিন্তায় থাকব।

কলকাতার পথঘাট ভগীরথের সব জানা। হাসপাতালের চাকরি পাওয়ার আগে সে দমদম-এর গেঞ্জি কারখানায় চাকরি করত। প্রায় চার বছরে কলকাতার প্রধান রাস্তাগুলো চষে ফেলেছে সে। তার চোখের সামনে যেন ভেসে ওঠে এন.আর.এস. হাসপাতাল। কতবার গেঞ্জি কারখানার বন্ধুদের সঙ্গে তাকে যেতে হয়েছে হাসপাতালের আউটডোরে।

পাঁচটা পাঁচের ট্রেনটা সঠিক সময়ে হাওড়া পৌছাতে মনে মনে খুশি হল ভগীরথ। ৪৪নং বাসটা ফাঁকা যায় এসময়। ফ্লাইওভারের সামনে এসে ভগীরথ ভাবল— এ সময় ডাক্তারবাবুকে সে নিশ্চয়ই হাসপাতালে পাবে না। দশটার আগে কোন ডাক্তারবাবুই রাউণ্ড দিতে আসবে না। ডাক্তার সাঁতরার চিঠিটা পকেট থেকে বের করে আনল ভগীরথ। ঠিকানাটা বার দুই পড়ল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। তারপর সুদামকে বলল, হাতে অনেক সময় আছে, চল আমরা ডাক্তারবাবুর ঘরে যাই। ঘরে যদি দেখা পাই তাহলে আমাদের সমস্যার কথা ভালভাবে বুঝিয়ে বলতে পারব। ডাক্তার সাঁতরা

আমাকে ঘরের ঠিকানা দিয়ে দিয়েছেন।

সুদাম নিষ্প্রভ স্বরে বলল, তুমি যা ভাল বোঝ কর, আমি আর কি বলব।

সুদামের ঘোরলাগা চোখ সকালের কলকাতাকে দেখছিল। এখন ভিড় বেশি নেই তবে মানুষের যাতায়াত আছে। শিয়ালদার ফ্লাই ওভারের নিচে এখনও দোকানগুলোর ঘুম ভাঙেনি। ভগীরথ নীলরতন হাসপাতাল ছাড়িয়ে হেঁটে হেঁটে চলে এল মৌলালীতে। সি-আই-টি রোড পাশেই। নাম্বার খুঁজে পেতে তার কোন অসুবিধা হবে না।

ডাক্তার মিত্রের চেম্বার এক তলায়। তারই বয়সী একজন কাগজে নাম লিখছিল রোগীর। ভগীরথ গিয়ে তার মুখোমুখি দাঁড়াল, নমস্কার করে বলল, আমরা খড়্গপুর থেকে আসছি। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই। উনি কখন চেম্বারে আসবেন?

আসার সময় হয়ে গিয়েছে। আপনি রোগীর নাম বলুন। সকালে উনি পনের জনের বেশি দেখবেন না।

ভগীরথ সুদামের নাম লেখাল কাগজে, তারপর পেতে রাখা সোফায় গিয়ে বসল। ডাক্তার মিত্র এলেন মিনিট দশেকের মধ্যে। ভগীরথ তৈরী হয়েই ছিল। ডাক্তারবাবু চেম্বারে ঢোকার মুখেই সে ধরিয়ে দিল ডাক্তার সাঁতরার চিঠিটা। কলেজ বন্ধুর চিঠি ডাক্তার মিত্রের গতি রোধ করে দিল। তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন ভিজিটর রুমে। খাম ছিঁড়ে চিঠিটা পড়লেন মন দিয়ে। তারপর সুদামের দিকে তাকালেন সহানুভূতির সঙ্গে । মুখ তুলে বললেন, আপনারা ভেতরে আসুন। বলেই তিনি চেম্বারে ঢুকে গেলেন। হতভম্ব অন্য রোগীরা সুদামকে দেখছিল ঈর্ষার চোখে। ভগীরথ তাদের দৃষ্টিকে পাত্তা না দিয়ে সুদামের হাত ধরে ঢুকে গেল সুসজ্জিত চেম্বারে।

ডাক্তার মিত্র বসতে বললেন।

ওরা বসতেই ডাক্তার মিত্র বললেন, সুভাষ এখন কেমন আছে? ওকে বলবেন— ডিসেম্বরে আমার এখান থেকে যেন একবার সস্ত্রীক ঘুরে যায়। অনেকদিন ওকে দেখিনি। জানিনা দেখা হলে ওকে চিনতে পারব কিনা। তবে ফোনে কথা হয়। গলাটা আমার চেনা আছে। ডাক্তার মিত্র অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন, দেখি, রিপোর্টগুলো দেখি?

ভগীরথ প্লাস্টিকের মোড়ক খুলে বের করে দিল ডাক্তারী কাগজগুলো।

ডাক্তার মিত্র খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়লেন সব, তারপর হুঁশ্ করে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, ঐ টেবিলটায় শুয়ে পড়ুন, আমি একবার দেখব।

সুদাম টেবিলের উপর শুয়ে পড়তেই ডাক্তার মিত্র গলায় স্টেথো ঝুলিয়ে এগিয়ে গেলেন। প্রায় মিনিট দশেক পরীক্ষা করার পরে বললেন, ভয়ের কিছু নেই তবে সারতে একটু সময় লাগবে। ওষুধে কাজ না হলে ছোট্ট একটা অপারেশনের প্রয়োজন। তখন দিন পনেরোর জন্য হাসপাতালে থাকতে হবে। এখন আপাতত আমি ওষুধ লিখে দিচ্ছে— তাতেই কাজ হবে।

ডাক্তার মিত্র তার ছাপান প্যাডে নাম লিখলেন সুদামের। ভগীরথের দিকে আড় চোখে তাকিয়ে বললেন, একটু দামী ওষুধ লিখে দিচ্ছি অসুবিধা নেই তো?

ভগীরথ সংকোচ ঝেড়ে ফেলে বলল, স্যার, সুদাম নোনা মাছের ব্যবসা করে। ওর বাড়ির অবস্থা ভাল নয়। ওষুধগুলো যদি কোনভাবে ব্যবস্থা করা যায় তাহলে ভাল হোত।

ডাক্তার মিত্র কী যেন ভাবলেন, তারপর ব্যস্ত হাতে প্রেসক্রিপশন ভরিয়ে দিলেন লেখায়, আমি স্যামপেল ফাইল সব দিয়ে দিচ্ছি। বেশির ভাগ ওষুধই আমার কাছে হয়ে যাবে শুধু একটা ওষুধ কিনতে হবে বাইরে থেকে। দাম বেশি নয়। পঁচিশ টাকার মধ্যে। কি পারবেন তো কিনতে?

ভগীরথ ঘাড় নাড়ল। ডাক্তার মিত্র ড্রয়ার ঘেঁটে ছ'রকমের ওষুধ দিলেন। খাওয়ার নিয়ম বুঝিয়ে বললেন। নমস্কার করে ভগীরথ যখন ফিরে আসবে তখন ডাক্তার মিত্র বললেন, আউটডোরে একটা টিকিট করে নিন। আমি আজ আউটডোরে বসব। কাল থেকে আমি পনেরো দিনের জন্য থাকব না। আমেরিকা যাচ্ছি। ওখান থেকে না ফেরা পর্যন্ত অপারেশন করা যাবে না। আপনারা দিন কুড়ি পরে আসুন। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

ভগীরথ নমস্কার করে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

ডাক্তার মিত্রের ব্যবহার সে ভুলতে পারছে না কিছুতেই। এত বড় ডাক্তার অথচ মনের দিক থেকে তিনি গ্রামের মানুষের চেয়েও সরল। সুদাম রাস্তায় এসে বলল, এবার আমি আসল জায়গায় এসে পড়েছি। আমার মন বলছে—এবার আমি ভাল হয়ে যাব।

ঠিক পনের দিনের মাথায় মেডিকেল কনফারেন্স সেরে কলকাতায় ফিরে এলেন ডাক্তার মিত্র। ভগীরথ খড়গপুর থেকে ফোন করে ডাক্তার মিত্রের সাথে কথা বলে নিল। তারই নির্দেশে সুদাম ভর্তি হয়ে গেল হাসপাতালে। সাত দিন পরে তার অপারেশন। ভগীরথ রোজ কলকাতা যাতায়াত করছে খড়গপুর থেকে। জবা গোবিন্দকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল কলকাতার হাসপাতালে। ভগীরথের সঙ্গে তার গেটের মুখে দেখা হল। কিছুটা অপ্রস্তুত স্বরে সে বলল, খড়গপুর হয়ে আসার সময় হল না, তাই সরাসরি চলে এলাম। ও ক'তলায়, কত নাম্বার বেডে আছে কিছু জানি না— তাই আপনার পথ দেখছিলাম। নাহলে আমাদের ফিরে যেতে হোত।

ভগীরথ বলল, ভয়ের কিছু নেই, ও ভাল আছে। কাল ওর অপারেশন। তুমি যদি থাকতে পার— তাহলে আমার পক্ষে সুবিধা হয়।

জবা ঠোঁট কামড়ে ভাবল, আমাকে আজ ফিরতেই হবে। আজ ফিরে কাল আসা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। আমি তো একা ফিরতে পারব না। গোবিন্দদা চলে গেলে আমার ভীষণ অসুবিধা হবে। আমি এখানকার পথঘাট কিছু চিনি না।

গোবিন্দ চলে যাক। তুমি আমার সাথে খড়গপুর চলো। কাল আবার আমরা একসাথে কলকাতায় আসব। ভগীরথের প্রস্তাবটা মনে ধরল না জবার, সে পাশ কাটিয়ে বলল, আমি না থাকলে কি খুব অসুবিধা হবে?

সুদাম তোমার স্বামী। তার অপারেশনের সময় তোমার থাকা উচিত। ভগীরথ কিছুটা কড়া সুরে বলল কথাগুলো।

জবা চোখের পাতা উল্টিয়ে বলল, আমি থাকা না থাকা সমান। আর আমি থেকেই বা কি করব? এ সবের আমি কি বুঝি?

তুমি থাকলে সুদাম মনে জোর পাবে। হাজার হোক তুমি তার স্ত্রী।

জবার মুখে কোন ভাষা নেই। নিমেষে রক্তহীন হয়ে গিয়েছে তার মুখমণ্ডল। তাকে উদ্ধার করার জন্য এগিয়ে এল গোবিন্দ, বৌদি না আসল তো কি আছে, আমি আসব— কথা দিচ্ছি।

তুমি আসা আর আমি আসা এক কথা। ভগীরথ অসহিষ্ণু হয়ে উঠল, আসলে অসুখ-বিসুখের সময় কাছের মানুষ থাকলে মনের জোর বাড়ে রোগীর। সেই জন্য জবার থাকার কথা বলছিলাম। ও যখন থাকতে পারবে না তখন আর জোর করব না। আমি যতটুকু পারি করব। খুব অসুবিধা হলে তোমার বৌদিকে সঙ্গে আনব।

সুদামের সঙ্গে দেখা করে পাঁচ মিনিটের মধ্যে হাসপাতাল থেকে চলে গেল জবা। রামকে রেখে এসেছে দাদু-দিদিমার কাছে। তার চটজলদি ঘরে ফিরে যাওয়া দরকার। তবু সে ফিরতে পারল না গোবিন্দর অনুরোধে। সারা দিন চিড়িয়াখানায় কাটিয়ে সে ফিরে এল সন্ধ্যায় হাওড়ার হোটেলে। সুদামের জন্য তার এখন আর মন খারাপ করে না। সুদামকে সে পচা আলু ভেবে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। সারা জীবন একটা অসুস্থ মানুষকে সে বইবে কেন? তার কি সখ-আহ্লাদ বলতে কিছু থাকতে নেই? তার শরীর এখনও মরুভূমির মত শুকিয়ে যায়নি। এই শরীর এখনও পুরুষ আকর্ষণের ক্ষমতা রাখে। গোবিন্দ আগুন পোকার মত ঘুরছে তার পেছন পেছন। তার পেতে রাখা ফাঁদে পা দিয়েছে জবা। গোবিন্দ হোটেলের দরজা লাগিয়ে জবার হাত ধরে টানল। জবা হুমড়ি খেয়ে পড়ল গোবিন্দর বুকে। তার শরীরের জোয়ার আসা আবেগ সহসা থিতিয়ে গেল, কিছুটা দূরে সরে গিয়ে জবা বলল, আজ আমাকে রেহাই দাও। মনটা ভাল লাগছে না।

ছেড়ে যদি দেব তাহলে এত টাকা খরচ করে হোটেলে থাকতে গেলাম কেন?

গোবিন্দর লোলুপ চোখের দিকে তাকিয়ে ঘৃণায় বেঁকে চুরে গেল জবার ঈষৎ লাল মুখমণ্ডল, সে নিস্তেজ ভঙ্গিতে বলল, আমার সিঁথিতে এখনও সিঁদুর রয়েছে।

তুলে ফেল।

তোলা যায় না গোবিন্দদা। কাল ওর অপারেশন। অন্তত কাল দিনটা যেতে দাও।

কাল কাল করে আর কতকাল আমি উপোসে থাকব?

তোমার যদি না পোষায়, তুমি আমার আশা ছেড়ে দাও। কোন সম্পর্কই জোর করে হয় না। জোর করলে তুমি আমার শরীর পাবে কিন্তু মন পাবে না।

গোবিন্দ কি ভাবল অনেক সময় নিয়ে, তারপর নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল হতাশ হয়ে। কিছুক্ষণ পরে সে বিড়বিড়িয়ে বলল, মেয়েদের মন বোঝা দায়। ওরা যে কখন কি চায় বলা মুশকিল।

ভোরবেলায় স্নান সেরে নিল জবা। গোবিন্দ চা খেয়ে বলল, সকাল ছ'টায় বাস আছে, আমরা গ্রামে ফিরে যাই।

নিস্তেজ পায়ে বাসে উঠে জানলার ধারে সিট নিল। বাস ছাড়ার আগে তার যে কি হল সে হঠাৎ-ই নেমে এল বাস থেকে। গোবিন্দ রাগে উত্তেজনায় ফেটে পড়ল, তোমার কি মাথা খারাপ হল? চল বাস ছেড়ে দেবে।

আমি যাব না গোবিন্দদা, তুমি ফিরে যাও।

তুমি কোথায় যাবে তাহলে?

আমি ওর কাছে যাব। না গেলে পাপ হবে।

জবা ব্রিজের নীচ থেকে উঠে এল রাস্তায়। প্রথম সূর্যের আলো এসে পড়েছে তার চোখে-মুখে। সামনে কলুষনাশিনী গঙ্গা। জবা হা' করে তাকিয়ে থাকল বহমান গঙ্গার দিকে। দু'চোখ ভরে এল তার জলে।

।। ত্রিশ ।।

কলকাতার কিছুই চেনে না জবা, তবু কোন সাহসে সে একা নেমে এল বাস থেকে নিজেই ভেবে পেল না। গোবিন্দও বেশ খানিকটা হকচকিয়ে গিয়েছিল, সে ভেবেছিল এ শুধু জবার কথার কথা। কথার কথা যে নয় তা করে দেখিয়ে দিল জবা। জেদের বশে বাস থেকে নেমে আসা সহজ, কিন্তু রাস্তাঘাট চিনে আসল লক্ষ্যে পৌঁছানো অত সহজ নয়। কাজটা কঠিন জেনেও ভয় পেল না সে। এত মানুষের মাঝখানে হারিয়ে যাবার কোন প্রশ্নই আসে না। দীঘায় সাগরমেলায় ছোটবেলায় সে হারিয়ে গিয়েছিল একবার। অত মানুষের ভিড়ে পথ চিনলেও ঘরে পৌঁছানো তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিছু পরে সে শুনেছিল, মাইকে তার নাম। তখন আর ভয় বাসা বাঁধেনি মনের কোণে। মাইক-স্ট্যান্ডে পৌঁছে সে দেখেছিল, বাবার চিন্তাগ্রস্ত চেহারা। জবাকে বুকে জড়িয়ে সে ডুকরে উঠেছিল অব্যক্ত কান্নায়। সেদিনের সেই দৃশ্য আজও মনে পড়ে জবার।

কলকাতার পথঘাট সম্বন্ধে তার কোনও অভিজ্ঞতাই নেই তবু সে সাহস করে পেরিয়ে এল হাওড়ার ব্রিজ। দু'বার পেছন ফিরে তাকাল গোবিন্দ তাকে খুঁজছে কী না! কাউকে দেখতে না পেয়ে আশ্বস্ত হল সে। জবা মনে প্রাণে চাইল এখন একা থাকতে। গোবিন্দর ছায়া মাড়াতে ঘৃণা হচ্ছে তার। যে ভুল সে করেছে সেই ভুলের যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় তার জন্য মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হল সে। মা গঙ্গাকে সে বলল, মা, আমাকে তুমি শক্তি দাও। এ পাপের জীবন থেকে আমাকে তুমি উদ্ধার করো। রামের বাবা যেন তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে ঘরে ফেরে।

গঙ্গার হাওয়ায় এলোমেলো হয়ে গেল জবার চুল, সরে যেতে চাইছিল শাড়ির আঁচল। ঠাণ্ডা হাওয়ায় শীতের আঁচ। সকাল বলেই ধুলো-বালির ঝাপ্‌টা কম। বড় বড় হোর্ডিংগুলোর দিকে তাকিয়ে জবার চোখে মুগ্ধতার রেশ ছড়িয়ে পড়ল, এত বর্ণময় জীবন সে কি এর আগে দেখেছে? অভাবের সঙ্গে লড়াই করে তার এতগুলো

বছর অতিক্রান্ত হল, সেই অভাবের সুযোগ নিয়ে ছিনে জোঁকের মতো এগিয়ে এল গোবিন্দ, নীরবে-নিঃশব্দে সে চুষে নিতে চেয়েছে তার দেহজ লাবণ্য রসদ। যা হয়েছে এতকাল, আর নয়। সে রামের মা, সুদামের স্ত্রী। তার এই উৎশৃঙ্খল জীবন মানায় না। সব বুঝেও জবা যে কেন মাঝে মাঝে এত লাগামহীন হয়ে পড়ে টের পায় না। সুদাম তার ক্ষুদ্র সামর্থ দিয়ে চেষ্টা করেছে সুখে রাখার। ভালবাসাও দিয়েছে প্রচণ্ড। তবু কেন সে বিপথগামী হল? গ্রামে তাকে নিয়ে আলোচনা, গুজুরফুসুর। এমন কী দীঘা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে এই জোয়ার। গোবিন্দ তাকে নিয়ে দীঘার হোটেলে রাত কাটাতে চেয়েছিল, যদি ধরা পড়ে যায়, যদি কারোর চোখে পড়ে যায় সে— এই ভয়ে সম্মতি জানাতে পারেনি। গোবিন্দর কথায় লোভের ফাঁদ বিছানো। এই যে শাড়ি-ব্লাউজ যা কিছু সবই গোবিন্দর দেওয়া। হাত খরচের টাকাটাও গোবিন্দ তাকে দিয়ে যেত লুকিয়ে। এমন কী বিয়ের প্রস্তাব, পালিয়ে গিয়ে ঘরবাঁধা সবই বলেছিল গোবিন্দ, জবা রাজি হয়নি। রাজি না হওয়ার জন্য এখন তার মনে কোন অনুশোচনা নেই বরং ভালই করেছে সে। পাপের ছিঁটে লাগলেও পাপে ডুবে যায়নি সে। এসব নিয়ে গোবিন্দর মনে রাগও কম নেই। রাগের বশে মানুষ কি না করতে পারে, জবা ব্রিজের শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে আঁতকে উঠল, ভাবল—গোবিন্দ যদি জোর করে তার গায়ে হাত তোলে? তারও তো দাবী জন্মেছে জবার উপর। সে কি চিরদিনের জন্য ফেরাতে পারবে গোবিন্দকে। শীতভাব থাকলেও ঘেমে উঠল জবা, গলা শুকিয়ে এল ভয়ে, নিরাপত্তাহীনতায় কেঁপে উঠল তার পা দুটো। দীঘা হোটেলের সামনের ঝুপড়িতে থাকত নীলমণি কাকা, তার বউ হেমলতার স্বভাব চরিত্র ভাল ছিল না, পরপুরুষ ঘেঁষা। অষ্টমী পুজোর রাতে নীলমণি কাকা হেমলতা কাকিমাকে মেরে পুঁতে দিয়ে দিয়েছিল বালিচড়ায়। সাতদিন পরে মরা লাশের গন্ধে কুকুর যখন নখের আঁচড়ে ছিটিয়ে দিল বালি, শকুন উড়ল আকাশে— সেদিনই ধরা পড়ে গেল নীলমণি কাকা। থানার মার খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে সে বলেছিল, আমি কি করব বাবু! রোজ রাতে হেম যেত সবজিওলার ঘরে শুতে। আমি ওকে কত মানা করেছি। সতর্ক করেছি। ও আমার কথা শোনে নি। গু খাওয়া গোরু কি স্বভাব বদলায়? আমি আর মাথা ঠিক রাখতে পারিনি। খুন করে দিয়েছি। এবার আমার ফাঁসি হলেও কোন আফশোষ নেই। যা করেছি আমি সজ্ঞানেই করেছি।

জবা ভাবল—প্রেমহীনতায় মানুষ কত ভয়ঙ্কর হতে পারে তার প্রমাণ নীলমণি কাকা। সুদাম তার ব্যবহারে যে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেনি—এটাই তার ভাগ্য। অথচ সব কিছুই আঁচ পেয়েছে সুদাম, সে তো কচি খোকা নয়, আর ঘাসে মুখ দিয়েও চলে না! সুদামের ধৈর্যক্ষমতা নীল সাগরেরও নেই। সুদাম নিজেকে মাটির মতো তৈরি করেছে দিনে দিনে—যে মাটি সাত চড়েও রা কাড়ে না।

নীলরতন সরকার হাসপাতাল খুঁজে পেতে দেরি হলেও জবার কোন অসুবিধাই হল না। গোবিন্দ তাকে বলেছিল, যদি কিছু জিজ্ঞাসা করতে হয় তাহলে দোকানদার নয় পুলিশকে জিজ্ঞাসা করবে, ওরা তোমাকে ভুল রাস্তা দেখাবে না।

ঘর থেকে আসার সময় গোবিন্দর এই কথাগুলোই তার মনে ভরসা জুগিয়েছে এবং সে সফলও হয়েছে। হাসপাতালের গেটের সামনে পৌঁছে জবা খুঁজছিল ভগীরথকে, কিন্তু বহু চেষ্টা করেও সে তার দেখা পেল না। জবা শুনেছে—ভগীরথ রোজ খড়গপুর থেকে যাওয়া আসা করে। সকালের দিকে সে খড়গপুর থেকে ট্রেন ধরে, এখানে পৌঁছাতে প্রায় দশটা এগারটা হয়ে যায়। যদিও এখনো তার আসার সময় হয়নি তবু জবার মন বলে— ভাগীরথ হয়ত এসে গিয়েছে। বেড়ায় কাপড় শুকাচ্ছে মেয়েরা, হাসপাতালের সামনের পুকুরটার সবুজ জলের দিকে তাকিয়ে গা ঘিনঘিনিয়ে উঠল তার, তবু ঐ নোংরা জলে কাপড় ধুচ্ছে, স্নান করছে অনেকে। হাসপাতালের সামনে মেলার মতো ভিড়, নানা প্রান্ত থেকে মানুষ এসেছে চিকিৎসার জন্য। এমন পরিবেশ জবার চোখে বড় অসহনীয়। এখানে এসে দু'দণ্ড দাঁড়ালে বোঝা যায় মানুষের কত দুঃখ-কষ্ট। জবা দেখল—খাটিয়ায় শুয়ানো আছে একটা মৃতদেহ, তার আত্মীয় স্বজনরা চারদিক ঘিরে ভেঙে পড়ছে কান্নায়। জবার চোখে জল চলে এল, যে মারা গিয়েছে সে তো সুদামের বয়সী হবে। অনেকটা সুদামের মতই দেখতে। ছ্যাঁৎ করে উঠল জবার বুক। এক পাশে দাঁড়িয়ে একজন মাঝবয়েসী মহিলাকে কাঁপা গলায় শুধোল, কী হয়েছিল এর?

মাঝবয়েসী মহিলাটি জবার দিকে তাকাল, দু'দিন আগে পেটের অপারেশন হয়েছিল। জ্ঞান ফেরার পরে আর বাঁচল না!

কে হয় আপনার? জবার গলা বুজে এল কান্নায়।

আমার ঠাকুর পো। বছর তিনেক আগে বিয়ে হয়েছিল। এক-দেড় বছরের মেয়ে আছে। মাঝ বয়েসী মহিলাটি চোখের জল মুছে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনার কে ভর্তি আছে, কী হয়েছে তার?

জবার কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠল, কিছু বলার আগে সে টের পেল ধস নামছে বুকের ভেতর, ঠেলে উঠছে কষ্ট, তবু কোনমতে সে বলল, আমার স্বামীর অবস্থাও ভাল নয়, তারও পেটের অসুখ, ডাক্তার বলেছে অপারেশন করতে হবে। আমার খুব চিন্তা হচ্ছে।

ভ্যানে তোলা হল মৃতদেহ। ঐ মাঝবয়েসী মহিলাটি ভ্যানে ওঠার আগে বলল, আসি বোন। আমাদের এখন অনেক দূর যেতে হবে। ম্যাটাডোরে দশ-বার জন জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়াতেই 'বল হরি হরি বোল' ধ্বনি তুলে গাড়ি ছেড়ে দিল। হা-করে শূন্য চোখে তাকিয়ে থাকল জবা। কারোর সাথে তার আর কথা বলতে ইচ্ছে করছে না, মুখটা তেতো হয়ে আছে দুঃশ্চিন্তায়। ভগীরথের সাথে দেখা না হলে এখানে আসা তার বৃথা হবে। দুঃশ্চিন্তাটা যত সময় যাচ্ছিল দীর্ঘায়িত হচ্ছিল জবার মনে। এত দূর এসে সুদামের সাথে দেখা না করে ফিরে যাওয়াটা অর্থহীন হবে। যোগমায়া বারবার করে বলে দিয়েছে, ছেলের খোঁজখবর নিয়ে এসো, বউমা। সে গোবিন্দরও হাত ধরে কাকুতি-মিনতি করে বলেছে, সুদাম তোর বন্ধু। ওর যা দরকার কেনাকাটা করে দিয়ে আসিস। গোবিন্দ ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েছে। অথচ হাসপাতালে এসে গোবিন্দ

সুদামের সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজনটাই অনুভব করল না। মানুষ পারেও বটে, স্বার্থহীন এমন একটা ভালবাসা বা সম্পর্ক নজরে পড়ে না জবার। মনে মনে সে খুব বিষণ্ণবোধ করে।

এগারটা বেজে গেল তবু দেখা নেই ভগীরথের। তবে কি আজ সে আসবে না। জবা ভেবেছিল, ভগীরথ আসলে সে সুদামকে দেখতে যাবে সার্জিক্যাল ওয়ার্ড-এ। কিন্তু কখন সে আসবে, তার যে আর তর সইছে না। বেশি দেরী হলে সে একা গ্রামে ফিরবে কী করে? পথঘাট চেনে না, তাছাড়া কলকাতায় থাকারও তার জায়গা নেই।

জবা হাসপাতালের করিডোরে উঠে এল সাহসে ভর করে। গেট-ম্যানের সাথে কথা বলল যাতে সে সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে যেতে পারে। দয়াবশতঃ তাকে পথ দেখিয়ে দিল গেট-ম্যান।

সুদাম মুখ ফিরিয়ে শুয়েছিল বিছানায়। শূন্য চোখ-শুকনো মুখ, দড়ির মতো হয়ে গেছে পুরো শরীর। জবা বেডের পাশে রাখা টুলে বসে গায়ে হাত রাখল সুদামের। সুদাম চমকে উঠে তাকাল, কিন্তু কোন কথা বলল না, তার চোখ থেকে নীরবে গড়িয়ে পড়ল জলের ধারা। জবা ঠোঁট কামড়ে আশেপাশের দিকে তাকাল, তারপর নীচু স্বরে বলল, আজ তোমার অপারেশন হওয়ার কথা ছিল? আমি আর ঘর যাই নি, এখানেই আছি।

সুদাম ঢোক গিলল, জবার দিকে তাকাল তারপর অসুস্থ গলায় বলল, রক্তের যোগাড় না হওয়া পর্যন্ত ডাক্তারবাবু বলেছেন অপারেশন হবে না। ভগীদা গিয়েছে রক্তের খোঁজে। জানি না সে পাবে কিনা। যদি না পায় তাহলে চোরপালিয়ায় যাবে। সেখান থেকে লোক আনবে।

তুমি এখন কেমন আছো? জবা চোখ মুছে নিল।

সুদাম ক্ষীণ গলায় বলল, আমার কথা বাদ দাও। আমার যা হবার তা তো হবেই। তবে তোমাদের জন্য আমার সব সময় খুব চিন্তা হয়। বিশেষ করে রামের কথা মনে পড়লে আমি আর স্থির থাকতে পারি না। ভগবান কেন যে আমাকে এত কষ্ট দিচ্ছে আমি বুঝতে পারি না। আমি তো জ্ঞানতঃ কারোর কোনদিন ক্ষতি করিনি। কথা বলতে গিয়ে জলের ধারা তার চোখের দু'কোণ ভরিয়ে দেয়, জবার এ দৃশ্য বড়ই মর্মান্তিক মনে হয়, সে সুদামের চোখের জল আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিয়ে বলল, মন খারাপ করো না, সব তাঁর আশীর্বাদে ঠিক হয়ে যাবে। ভগীরথদা তোমার জন্য অনেক করছে। তার চেষ্টা বৃথা যাবে না।

সুদাম আশ্বস্ত হতে গিয়েও পারল না, তুমি ফিরবে কার সাথে? দেরী না করে ঘরে ফিরে যাও। রাম একা আছে। ও যা দামাল, মা ওকে সামলে রাখতে পারবে না।

আমি ঠিক চলে যাব। তুমি আমার জন্য ভেব না।

আমার সব ভাবনা তো তোমাকে নিয়ে। সুদাম বড় বড় চোখ মেলে দেখল জবাকে,

আমার কিছু হয়ে গেলে তোমার যে কী হবে—এই ভেবে আমার ঘুম আসে না। আমার জন্য তোমার জীবনটা যে নষ্ট হয়ে গেল সেটা আমি বুঝতে পারি।

কেউ কারোর জীবন নষ্ট করতে পারে না। 'ভাগ্য' বলে একটা কথা আছে। আমি ভাগ্যে বিশ্বাস করি। জবা সহজ হবার চেষ্টা করল, তোমার কাছে আমার তো কোন অসুবিধা নেই। একটা মেয়ের জীবনে যা-যা পাওয়ার দরকার সব আমি পেয়ে গেছি। তুমি তো আমাকে সব কিছু দিয়েছ।

আমাকে একটু জল দেবে? সুদাম তাকাল, এখানে থাকতে আমার একদম ইচ্ছে করে না। অপারেশন হয়ে গেলে তুমি আমাকে তাড়াতাড়ি ঘরে নিয়ে যেও।

জবা চুপ করে থাকল। সুদামকে জল খাইয়ে সে নেমে এল নীচে। বাইরে এসে সে দেখল রোদ শুষে নিয়েছে হঠাৎ আসা মেঘ। চারধারে কেমন কালচে ছায়া। প্রায় সব মানুষের মধ্যে অতিরিক্ত একটা ব্যস্ততা নজরে পড়ল তার। মেঘ দেখে ঘাবড়ে গেল জবা। জল-ঝড় হলে সে বিপদে পড়ে যাবে। একা ফেরা তখন সমস্যা হবে। এসময় ভগীরথের সঙ্গে দেখা হলে তার চিন্তা কিছুটা নিরসন হোত। সে চোরপালিয়ায় না ফিরে ভগীরথের সাথে খড়গপুর ফিরে যেতে পারত। এবং খড়গপুর থেকে চোরপালিয়া যাওয়া তার পক্ষে আরও সহজ হোত। ওদিকের রাস্তাঘাট তার চেনা। কোন অসুবিধাই হোত না। চিন্তায় জবার কপালে অবাঞ্ছিত ভাঁজ পড়েছে, সে ভেতরে ভেতরে ঘেমে উঠছিল। বেলা যত গড়াল ততই শুরু হল হাওয়ার তোড়জোর। কা-কা শব্দে উড়ে বেড়ালো কাক। চিল-চড়ুই সবই উড়ছে এলোমেলো, তার মধ্যে ছুটছে দ্রুতগতির যানবাহন।

ট্রাম ধরার জন্য জবা যখন মেন-রাস্তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল তখনই পেছন থেকে তার হাওয়ায় দোল খাওয়া আঁচলটা টেনে ধরল গোবিন্দ, জবা ঘাড় ঘোরাতেই রাগে রক্ত উঠে এল তার চোখে, এত লোকের মাঝে আঁচল ধরতে তোমার লাজ লাগল না। ছেড়ে দাও। তোমার লাজ-লজ্জা না থাকতে পারে কিন্তু আমি এখনও ওগুলো একটু বাঁচিয়ে রেখেছি।

গোবিন্দ বাঁকা হাসিতে গোঁফ নাচিয়ে বলল, এ যে দেখছি ভূতের মুখে রাম নাম। কালে কালে কত কি যে আর দেখতে হবে। তা ছাড়ো এসব রাগ-ঝাল, ঘরে যাবে না?

সময় হলে যাব। জবার রাগ তখনও পড়েনি।

একা যেতে পারবে তো?

না পারার কিছু নেই। হাত-পা-চোখ-মুখ সবই তো আমার আছে। জবা ঘনঘন নিঃশ্বাস ছাড়ল, তুমি তো চলে যাচ্ছিলে, আবার এলে কেন?

না এসে কি উপায় আছে? গোবিন্দ এবার রীতিমতন গম্ভীর হয়ে উঠল, তোমাকে আমি ঘর থেকে এনেছি যখন সুস্থ শরীরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া আমার কর্তব্য। একা আমি গ্রামে ফিরলে লোকে আমাকে কী বলত? কী বলত তোমার শ্বশুর-শাশুড়ি? তাদের কাছে আমি কি জবাব দিতাম। এই শহরে তোমার যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে

সব দোষ আমার ঘাড়েই পড়ত। সারাজীবন বদনাম বয়ে বেড়াতে হোত আমাকে। এই সব সাত-পাঁচ ভেবে আমিও বাস থেকে নেমে পড়েছি। তা দেখা হয়ে ভালই হল। আমি চিন্তার হাত থেকে রেহাই পেলাম। তোমাকে ঘরে পৌঁছে তবেই আমার নিস্তার।

জবা সব কথা শুনল কিন্তু কোন উত্তর দিল না। কিছু বলার মতো মানসিকতা তার ছিল না। এত বেলা হল খাওয়া জোটেনি তার। খাওয়ার কোন ইচ্ছাই হল না। সে ভেবে ছিল গেটের বাইরে বেরিয়ে চা-পাউরুটি খেয়ে নেবে। গোবিন্দর হঠাৎ উপস্থিতি তার সেই ইচ্ছায় জল ঢেলে দিল। গোবিন্দকে সে চলে যেতে বলতে পারছে না। অস্বস্তি হলেও গোবিন্দর সঙ্গে সে ফিরতে পারবে—এটা তার কাছে শাপের বর হওয়ার মতো। কিন্তু মনের কথা সে মনেই রাখল, মুখ ফুটিয়ে কিছু বলল না। গেটের বাইরে এল ওরা।

গোবিন্দ বলল, আকাশের অবস্থা ভাল নয়। ঘর যদি ফিরতে হয় তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। ঝড়-জলে আটকে গেলে তখন আর ফেরা যাবে না।

আমি ভগীরথদাকে খুঁজছিলাম। তার সাথে দেখা হলে আমি নিশ্চিন্ত মনে যেতে পারতাম।

সে এখনও আসেনি? খুব অবাক হল গোবিন্দ, এখনও যখন আসেনি তখন আর আসবে বলে মনে হয় না। যদি আসার থাকত তাহলে সকাল-সকাল চলে আসত।

আমি যে কী করব বুঝতে পারছি না? জবা আকাশের দিকে তাকাল, ঘরে রাম একা আছে। জানি না সে কি করছে, ছেলেটার জন্য আমার সব সময় চিন্তা হচ্ছে।

চিন্তা হবারই কথা। কথাটা গোবিন্দ মন থেকে বলল কিনা বোঝা গেল না। জবা কিছু না বলে তির্যক দৃষ্টিতে তাকাল। তখনই একটা ধুলোর ঝড় আছড়ে পড়ল তার উপর, পাশে সরে গিয়ে নিজেকে কোন মতে রক্ষা করল জবা, আমি ঘরে যেতে চাই।

ভাল কথা। চল তাহলে—

আবার হাওড়ায় ফিরে এল ওরা। ডবল সিটে বসল পাশাপাশি।

বাস ছুটছে দ্রুত গতিতে। জবা চেয়ে আছে বাইরের দিকে। বড় বড় বাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে জবা ভাবছিল ওখানে যারা থাকে তারা নিশ্চয়ই খুব সুখী। সবাই সুখী। শুধু তার ভাগ্যটাই ফোঁপরা!

দীঘা-কলকাতা বাসটা চোরপালিয়ায় সন্ধে সাতটার মধ্যে পৌঁছে গেল।

বাস থেকে নেমে জবা ভাবছিল—রামের জন্য দোকান থেকে সে কিছু কিনে নিয়ে যাবে। গোবিন্দর কথায় সচকিত হল সে। জবা বলল, তুমি যাও, আমি বাজার থেকে আসছি।

হঠাৎ আবার কী দরকার পড়ল? শুধাল গোবিন্দ।

জবা জড়োসড়ো হয়ে বলল, রামের জন্য কিছু আনা হয়নি। খালি হাতে গেলে ছেলেটা কাঁদবে।

ওঃ, এই কথা! তুমি এখানে দাঁড়াও। আমি যাব আর আসব।

গোবিন্দ দ্রুত পায়ে চলে গেল বাজারে।

রাস্তার ধারের গাছতলায় দাঁড়িয়ে জবা বড় করে একটা শ্বাস নিল। দু'দিনে তার উপর দিয়ে যেন ঝড় বয়ে গেছে, সে কাহিল এবং বিধ্বস্ত। ঘরে ফিরে যোগমায়াকে কি বলবে সে। সুদামের কথা শুনে যোগমায়া গলা ছেড়ে কাঁদবে। গালে হাত দিয়ে বসে থাকবে ভরত। নকুল এসে শুধাবে সুদামের কথা। আর হা-হুতোশ করবে। এসব দৃশ্য কয়েকমাস থেকে দেখে-দেখে হাঁপিয়ে উঠেছে জবা। সে ভাবল-মানুষের এত অসুখ-বিসুখ হয় কেন? অসুখ-বিসুখ যখন হয় তখন চিকিৎসা করানোর পয়সা থাকে না কেন? জবা ভাবল—দু'একদিনের মধ্যে সে দীঘায় যাবে। বাবার কাছ থেকে কিছু টাকা পয়সা না আনলে আর চলছে না। তাছাড়া ওদেরকে সংবাদটা দেওয়া দরকার। হাজার হোক-জামাই বলে কথা—সবারই তো মন করে একটু দেখতে যাবার জন্য। যাক না যাক সংবাদটা সে দেবেই।

গোবিন্দ ফিরে এল একটা বিস্কুটের প্যাকেট আর চকলেট কিনে নিয়ে। জবা পয়সা দিতে চাইলে সে খোঁচা মেরে বলল, এটুকু ঋণ আর শোধ না করলেও চলবে।

পাকা রাস্তা থেকে কাঁচা পথ চলে গিয়েছে পাড়ার দিকে। এখানেও ভার হয়ে আছে রাতের আকাশ। বাতাস আছে অল্প-স্বল্প। তবে আকাশে তারার সংখ্যা নেহাতই কম। একটা সিগ্রেট ধরিয়ে গোবিন্দ জবার দিকে তাকাল, রাগ না করলে একটা কথা বলি।

জবা চুপ করে থাকতেই গোবিন্দ বলল, আজ রাতে দরজাটা খোলা রেখো। আমি আসব আজই। লাস্ট, আজই ফার্স্ট।

না। চেঁচিয়ে উঠল জবা, তুমি যদি আসো, আমি পাড়া জাগিয়ে তুলব।

সে তোমার যা ইচ্ছে করো। গোবিন্দ দাঁতে দাঁত ঘষল, আমি আসব যখন বলেছি তখন আসবোই। তোমার সাথে আজ আমার শেষ বোঝাপড়া।

জবা কেঁপে উঠল থরথরিয়ে, গোবিন্দর জেদকে সে জানে। ক্ষুধার্ত বাঘের চেয়েও সে হিংস্র হয়ে উঠতে পারে স্বার্থে ঘা লাগলে। মীরা তার প্রমাণ। মীরাকে সে ছেড়ে কথা বলেনি। তার সর্বনাশ করে ছেড়েছে। বড়লোকের ছেলে দোষ করলে সে দোষ অনেকের চোখ এড়িয়ে যায়, তার মুখের উপর কথা বলার সাহস রাখে না কেউ। যত দোষ নন্দ ঘোষের। জবা নন্দ ঘোষ হতে চায় না। সে জবা হয়েই বাঁচতে চায় এ সমাজে। যতদিন সুদাম ঘরে না ফেরে ততদিন সে দীঘায় থাকবে ভেবে নিল। নাহলে গোবিন্দ তাকে জ্বালিয়ে মারবে রাত-বেরাতে। সে অভাবী মেয়েমানুষ, যদি খড়কুটোর মত স্রোতের মুখে ভেসে যায়, যদি থৈ না পায় পাপ সাগরের—তখন কে তাকে বাঁচাবে, কে দেবে পায়ের তলার মাটি।

মাটি হারিয়ে গেলে সহজে তা খুঁজে পাওয়া যায় না। জবা বিপন্নবোধ করল নিজেকে। মাটির পথে হিমসাপ আঁধার শুয়ে আছে, ছ্যাঁতছ্যাঁত করে গা শীত হাওয়ায়। যত ঘরের দিকে এগোচ্ছিল জবা ততই মনের দিক থেকে ভেঙে পড়ছিল সে। গোবিন্দ

তখনও তার পিছু ছাড়েনি, ঘর অব্দি পৌঁছে দিয়ে সে ফিরে যাবে তার নিজের ঘরে। যোগমায়ার সাথে কথা না বলে সে ঘরে ফিরবে না—এমন একটা জেদ বয়ে বেড়াচ্ছে সে কলকাতা থেকে। দীর্ঘ বাসযাত্রায় গোবিন্দর সাথে কোন কথা বলেনি জবা। কথা বলার অনেক বিষয় ছিল তবু সে চুপ করেছিল বাইরের দিকে দৃষ্টি মেলে। গোবিন্দই গায়ে পড়ে বলেছিল, যা শুনলাম সুদামের অবস্থা ভাল নয়। তোমার ভাগ্যে যে কি লেখা আছে তা একমাত্র ভগবানই জানে। তবে মনে মনে তোমার প্রস্তুত থাকা দরকার। অপারেশনের পরে সুদাম আর উঠতে পারবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছে। তুমি কি ভাবছ আমি জানি না তবে তোমার এখন ভাববার সময় হয়েছে। মনে রেখো দু'নৌকোয় পা দিয়ে জীবনটা বেশি দূর যাবে না। তোমাকে যে কোন একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমি আর বেশিদিন অপেক্ষা করতে পারবে না। ঘরে বিয়ের জন্য চাপ দিচ্ছে।

বিয়ে করে নাও। কে তোমাকে বিয়ে করতে মানা করেছে। বিরক্তি আর উষ্মায় ঝাঁঝিয়ে উঠেছিল জবা, আমি তোমার পথের কাঁটা নই। বিয়ে করে তুমি সুখী হও এটা আমি মনে প্রাণে চাই।

আমি বিয়ে করলে তোমার কি হবে? কে তোমাকে দেখবে?

আমার জন্য তোমার না ভাবলেও চলবে। শাঁখা-সিঁদুর যতদিন আছে আমি তত দিন সুদামের ছাড়া আর কারোর হতে পারব না। জবা মুখ ফাঁক করে শ্বাস নিয়ে আবার চলমান বাইরের দিকে তাকাল। কী দ্রুত বদলে যায় দৃশ্যপট যা তার জীবনের সাথে মিল খায় বহু। যে সুযোগ গোবিন্দকে সে দিয়েছে তা সুদে-আসলে না মেটা পর্যন্ত রেহাই পাবে না সে। গোবিন্দই তাকে নিষ্কৃতি দেবে না। যতদূর সম্ভব নীচে নামিয়ে ছিঁবড়ে করে দূরে ছুঁড়ে দেবে সে। হাতের ঢিল বেরিয়ে গেলে তাকে আর ফেরান যায় না। জবা আঙুল কামড়ায় নিজের ভুলের জন্য। অন্ধকারে পথ চলতে গিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে হোঁচট খায় সে। 'আঃ' যন্ত্রণার ধ্বনি শুনে সামনের দিকে হেলে যাওয়া জবাকে দু'হাত দিয়ে ধরে ফেলে গোবিন্দ। ধরেই থাকে। জবাও বাধা দিতে পারে না। একসময় সম্বিত ফিরতেই গোবিন্দর হাতের উত্তাপ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় সে। কোন কথা না বলেই অন্ধকারে সে তার বিরক্তি প্রকাশ করে দেয়, পাড়ার মধ্যে ঢুকে গিয়েছি, এখন একটু ভদ্রভাবে চল।

তুমি কি ভাবছ এ পাড়ার কেউ কিছু জানে না? গোবিন্দর ঠোঁটে হাসি চলকে গেল, তুমি আমি চোখ বন্ধ করে থাকলেও সবাই কিন্তু চোখ খুলে আছে। এমন কি তোমার শ্বশুর-শাশুড়িও আমাদের গোপন সম্পর্কের কথা জেনে গেছে। তারাই আরও বেশি করে দশ কান করেছে। এত দূর এগিয়ে যাওয়ার পরে ফিরে যাওয়া বোকামী। তাতে আরও লোক হাসবে।

গোবিন্দর কথাকে সমর্থন করতে পারল না জবা, প্রতিবাদে ফেটে পড়ল সে, যে সম্পর্কের কথা তুমি বলছ-সেটা একটা ভুল ছিল। জ্বরে ভুল বকে মানুষে, আমাদের সম্পর্কটা ঐ রকম কিছু একটা ছিল। জ্বর ছেড়ে যাওয়ার পর মানুষ আর ভুল বকে না।

ভুল বকে না কিন্তু তার রেশ থেকে যায়। গোবিন্দ জোর করে বোঝাতে চাইল, তুমি যদি ভাবো—তুমি ভাল হয়ে গেছো—তাহলে একথা কেউ বিশ্বাস করবে না। খোঁটা উপড়ান গোরু গোয়ালে যে সহজে ঢুকতে চায় না—এটা সবার জানা। তাছাড়া তোমার ব্যবহার এবং কথা-বার্তা প্রমাণ করে দিয়েছে—তুমি আমাকে ছাড়া আর কাউকে চাও না। যদি চাও তাহলে সেটা তোমার মারাত্মক ভুল হবে। সে ভুলের মাশুল তোমাকে দিতেই হবে।

কী করতে চাও তুমি? জবা রুষ্টো গলায় শুধোল, আমার ক্ষতি করে দেবে—এই তো? আমার ক্ষতি হোক—তার জন্য আমি ভয় পাই না। আগুন খেয়েছি, মুখ তো পুড়বেই। তবে আমার স্বামী এবং সন্তানের কেউ যদি কোন ক্ষতি করতে চায়—আমিও তার চোখ উপড়ে নেব। আমি দীঘার সমুদ্রে বড় বড় ঢেউ দেখেছি। কত ঝড় বয়ে গেছে সমুদ্রের উপর দিয়ে। সমুদ্র যেমন ছিল, আজও তেমন আছে। কেউ তার কোন ক্ষতি করতে পারেনি। মনে রেখো-সমুদ্রপাড়ের মেয়েরা সমুদ্রের চেয়ে কম কিছু নয়।

গোবিন্দ চিবিয়ে-চিবিয়ে হাসল, ঘরের আলো এসে পড়েছে দাওয়ায়, সেই স্বল্প আলোয় যোগমায়া দু'জনকে দেখতে পেয়ে নেমে এল উঠোনে, দূর থেকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল, কে, বউমা না?

হ্যাঁ, মা। আমি—। সাড়া দিল জবা। তার গলার আওয়াজ পেয়ে দৌড়ে এল রাম। ঝাঁপিয়ে পড়ে গলা জড়িয়ে ধরল মায়ের, কচি গলায় শুধোল, মা, বাবা কোথায়? বাবা কেন এল না মা?

সে না এলে তোর মন খারাপ করে বুঝি? জবার গলা কেঁপে উঠল। আমি যে রোজ বাবার সাথে ঘুমোই। কত দিন বাবার সাথে ঘুমোইনি। আমার খুব কান্না পায়। রামের ছোট্ট ঠোঁট ফুলে উঠল, সে আরও জোরে জড়িয়ে ধরল জবার গলা।

যোগমায়া ধমক দিয়ে বলল, মাকে ছেড়ে দে, রাম। বদমায়েসী করিস নে। তোর বাবার কথা শুনতে দে। তার কথা শোনার জন্য মনটা উতলা হয়ে আছে।

ভরত তক্তাপোষে বসেছিল চুপচাপ। তাকে কেন্দ্র করে ভন্‌ভনিয়ে উড়ছিল জলো মশা। হ্যারিকেনের বাতিটা উসকে দিয়ে সে ঘনিষ্ঠ চোখে গোবিন্দর দিকে তাকাল, বসো বাবা, টুকে বসে যাও। তোমার বাবা এসেছিল আমার ঘরে খোঁজ নিতে। আমি তাদের সব বুঝিয়ে বলে দিয়েছি। তুমি কি ঘরে কোন খবর না দিয়ে চলে গেছ?

তা তো নয়। ঢোক গিলল গোবিন্দ। তক্তাপোষে পাশাপাশি বসে সে ভরতের সামনেই একটা সিগারেট ধরাল। তামাকে পোড়ার গন্ধে মন ভরে গেল ভরতের, আবার দুঃখও পেল। গাঁয়ে এখন লঘু-গুরু মান্য করার বোধ হারিয়ে ফেলেছে অনেকে। অনেকেই ছেলের বয়েসী লোকের কাছ থেকে বিড়ি-সিগারেট-তপকা চেয়ে খায়। এটা এখন আর কোন দোষের মধ্যে পড়ে না। তামাকের গন্ধ বড় ছোঁয়াচে। ভরতও ডিবা খুলে একটা বিড়ি ধরাল, আয়েশ করে টান দিয়ে বলল, আমার ঘরের ছেলেটা এখন কেমন আছে? ডাক্তার কি বলল?

গোবিন্দ সোজা সাপটা বলল, অবস্থা ততো বিশেষ ভাল নয়। ডাক্তার বলেছে—অপারেশন হবে। অপারেশন না হওয়া পর্যন্ত কিছু বলা যাবে না।

বড়ই বিমর্ষ দেখাল ভরতকে। ঘনঘন বিড়িতে টান দিয়ে সে কিছুটা স্বস্তি পেতে চাইল। যোগমায়া সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে আছে ওদের, সুদাম ঘরছাড়ার পর থেকেই সে অনেকটাই বুড়িয়ে গেছে। চোখ-মুখের সেই মসৃণতা হারিয়ে গেছে কবে, একটা ম্যাড়মেড়ে ভাব পরিষ্কার ফুটে উঠেছে তার খসখসে চেহারায়। পুরনো সিঁথির সিঁদুরটাও কেমন মলিন, তা দেখে জবা বলল, মা, তুমি সিঁদুর পরোনি আজ?

আর সিঁদুর! দীর্ঘশ্বাস ছাড়াল যোগমায়া, সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ চলে গেল অসুস্থ ভরতের দিকে, আমার কথা ছাড়ো, ছেলের কথা বলো। তার কথা শুনব বলে বাস রাস্তার দিকে চেয়ে-চেয়ে আমার চোখ শুকিয়ে গেল। তোমার বাবাও ভাল করে ঘুমাতে পারে না রাতে। ঘুম ভেঙে গেলে সুদামের কথা শুধায়। আজ একটু সে সুস্থির আছে। দুপুরে ভগীরথ এসেছিল ঘরে। তারও বাবার শরীর ভাল নেই। বুড়োটা অনেক ভুগছে। সে এসে বলল, সুদামের জন্য রক্ত দরকার। গরীবের জন্য কে আর রক্ত দেবে বল? তাই নকুলকে নিয়ে সে গ্রামের মধ্যে গিয়েছে খোঁজখবর করতে। তারও আসার সময় হয়ে এল।

ভগীরথ চোরপালিয়ায় এসেছে এই সংবাদে খুশি হল না গোবিন্দ, নড়ে চড়ে বসল সে, পোড়া সিগারেটটা দূরে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, আমি এখন আসি। কাল আবার আসব। কেউ রক্ত না দিলে আমি সুদামের জন্য রক্ত দিতে কলকাতা যাব। ভগীদাকে কথাটা জানিয়ে দিও।

গোবিন্দ চলে যাচ্ছিল, যাওয়ার আগে সে জবাকে ডাকল চোখের ইশারায়। যোগমায়া সব বুঝতে পেরে বলল, যাও বৌমা, গোবিন্দকে একটু আলো দেখিয়ে আসো। যা অন্ধকার, ছেলেটাই বা একা-একা যাবে কি করে?

রাম বড় হয়েছে তবু মায়ের দুধ তার এখন চোষা দরকার। দুধ ছাড়িয়ে দিতেই রাম চেঁচিয়ে উঠে আবার সামলে নিল নিজেকে। হ্যারিকেনটা তুলে নিয়ে জবা হাঁটছিল গোবিন্দর পেছন-পেছন। কিছু দূর আসার পরে কলাগাছের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে পড়ল গোবিন্দ, তোমার জন্য রক্ত কেন আমি জীবনও দিয়ে দেব হাসতে-হাসতে। বিনিময়ে আমার শুধু তোমাকে চাই।

জবা কেঁপে উঠল জেদের কথা শুনে, এই ভালবাসাটা তুমি অন্য কোন আইবুড়ো মেয়েকে দিলে সে ভীষণ খুশি হোত। আমি পরের বউ, আমার উপর থেকে তোমার নজর উঠিয়ে নাও। যদি বলো তোমার পা ধরতে হবে, আমি তাতেও রাজি আছি।

ছিঃ-ছিঃ, তুমি আমার পা ধরবে কেন, তুমি আমার হাত ধরবে। বিনয়ে গলে যেতে চাইল গোবিন্দ।

জবার কাঁপুনি তবু থামেনি, আমাকে মুক্তি দাও তুমি।

তুমি নিজের মুখেই বলেছ সাগরপাড়ের মেয়ে তুমি, সাগরের উপর নজর দিলে, সে কি বলে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নয়?

যাত্রা করো না। আমার অসুবিধাটা বোঝার চেষ্টা করো। জবা বিরক্তি চেপে রাখতে পারে না, আমার ঘর-সংসার, স্বামী-পুত্র সব আছে। তুমি আমার কাছে যা চাও তা আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। আমি মরব তবু তোমার কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিতে পারব না।

কেমন না পারো সেটা আমি দেখব। গোবিন্দ ক'পা হেঁটে গিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়াল, চাপা গলায় বলল, দরজা যেন খোলা থাকে। আমি আসব, ঠিক আসব।

॥ একত্রিশ ॥

'আসব' শব্দটা বিষভোমরা হয়ে ঢুকে গেছে জবার কানের ভেতর, শুধু ফরফর আওয়াজ, আর সেই আওয়াজ জবাকে যেন ধারাল অস্ত্র দিয়ে ক্ষত-বিক্ষত করতে থাকে বারংবার। যত ঘৃণা বুকের ভেতরে ছিল সব যেন দলা পাকিয়ে উঠে এল গলার কাছে। জবা জোর করে থুতু ফেলল অন্ধকারে, তারপর ফিরে এল ঘরে। ভরত তখনও ঝিম ধরে বসেছিল তক্তাপোষে, অন্ধকারে তারা জুবুথুবু বসে থাকা ভঙ্গিটা বড়ই কষ্ট দিয়েছে জবাকে, আর সে কাউকে কষ্ট দিতে চায় না—এমন বোধে সতর্ক হল মনে মনে। জবা হ্যারিকেন নামিয়ে আলতো গলায় ডাকল, বাবা?

ভরত কাছিমের মতো মুখ বের করে তাকাল, কিছু বলছো, বউমা?

আজ তুমি গাঁ-ঘুরতে যাওনি?

এখন আর পেরে উঠি না, মা! শরীর-মন ধকল সইতে পারছে না। ওরা এখন বিশ্রাম চায়।

ভাল তো! এতদিন খাটলে, এবার একটু আরাম করো।

যোগমায়া এল ওদের কথার মাঝখানে, ঝড় বয়ে যাওয়া শরীরে তারও ধকলের চিহ্ন। জবার মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলল, কাপড়-চোপড় বদলে নাও। আমি জল এনে রেখেছি, হাত-মুখ ধুয়ে দুটো খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম করো—সারাদিন তো তোমার কম পরিশ্রম হয়নি।

যোগমায়ার কথায় কি ছিল জবার চোখের কোণে জল এসে গেল। ওদের চোখ এড়িয়ে জল মুছে নিল জবা। মীরা পাশে দাঁড়িয়ে দেখছিল সব, ওর ভরা শরীরে চাপা আগুনের হল্‌কা। ক'দিন হল সে ভাল আছে, এদিক-সেদিক আর ঘুরতে বেরয় না। জবা যে গোবিন্দর সঙ্গে কলকাতায় গিয়েছে—এখবর তার জানা। খবরটা জানার পর থেকে মাথাটা তার তেতে আছে, সে এখনও গোবিন্দকে সহ্য করতে পারে না। ভগীরথ যখন তাদের ঘরে এল সুদামের সংবাদ দিতে তখন মীরা তাকে পীড়াপীড়ি করেছিল খাওয়ানোর জন্য-যা দেখে শুনে ভগীরথ আর না করতে পারেনি। ঐ ভরা দুপুরে ভগীরথের জন্য মীরা এনেছিল দুধ-মুড়ি জামবাটিতে ভরে। দুধমুড়ি খাওয়ার ইচ্ছে ছিল না ভগীরথের। শুধু মুড়ি হলেই তার চলে যেত। কিন্তু মুড়ির সাথে দুধ—

একটু বিলাসিতা ওদের পক্ষে। ভগীরথ এদের বাড়ির অবস্থা সব জানে। যেটুকু দুধ মীরা তাকে দিয়েছে, সেটুকু দুধ যোগমায়া বা ভরত খেলে তাদের শরীর সারবে। মীরাকে বোঝালেও সে বুঝবে না।

যোগমায়ার এনে দেওয়া জলে হাত-মুখ ধুতে ইতস্ততবোধ হল জবার, লম্ফো নিয়ে সে চলে গেল পুকুরটঘাটে। তাকে সঙ্গ দিল মীরা। এঘরে তার উপস্থিতি সবাই ভুলে থাকতে চায়—এটা বেশ ভালভাবেই জানে মীরা। সবার চোখে সে তো পাগলী ছাড়া আর কিছু নয়। তবু জবা তাকে আলাদা গুরুত্ব দেয়—এটাই তার ভাগ্য। মাঝে মধ্যে মন ভাল থাকলে মীরা তার সঙ্গে গল্প করে খোশ মেজাজে। জবা মন দিয়ে শোনে মীরার কথা।

পুকুরঘাটে নেমে হাত-মুখ ধুলো জবা, পা ধুয়ে সে যখন উঠে এল তখনও লম্ফো হাতে মীরা দাঁড়িয়ে আছে তার জন্য। সন্ধের পরে পুকুরঘাটের এদিকটায় আসতে চায় না কেউ, গা ছমেছমে ভয় শুয়ে থাকে আঁধার জলে। পাগলী বলে মীরার অত ভয়-ডর নেই, সে যেখানে খুশি যখন তখন চলে যেতে পারে। পাড়ে উঠে এসে জবা মীরাকে বলল, চলো।

মীরা গেল না, জবার হাত ধরে বলল, বৌদি, একটু দাঁড়াও।

খুব অবাক হল জবা। শুধোল, কিছু বলবে?

তুমি কিছু মনে না করলে বলতাম।

বলো।

মীরা বলতে শুরু করল, গোবিন্দদার ব্যবহার তো তুমি জানো। আর এ-ও জানো সে আমার সঙ্গে কি ব্যবহারটা করেছিল। সব জেনে-শুনে গোবিন্দদার সঙ্গে তোমার কলকাতা যাওয়া উচিত হয়নি।

জবা চুপ করে থাকল। মীরা বলল, লোকটা ভাল নয়, ওর সাথে তোমার বেশি মেলামেশা করা উচিত নয়। এতে দশ লোকে দশ কথা বলে। তুমি তো আমার মত নও, তোমার মান-সম্মান আছে। আমার কিছু হলে 'পাগলি' বলে রেহাই পেয়ে যাব, তুমি তো তা পাবে না, বৌদি।

জবা অসহিষ্ণু হয়ে উঠল ভেতরে-ভেতরে, প্রসঙ্গ এড়িয়ে সে বলল, ঠিক আছে এবার চলো। আমি সব বুঝতে পেরেছি।

তুমি রাগ করলে বৌদি। রাগ করলে আর বলব না। তবে—

তবে কি?

মীরা ভয়ে ভয়ে বলল, গোবিন্দদাকে রাতের বেলায় আমাদের ঘরের আশপাশে ঘুরঘুর করতে দেখেছি। সে কেন আসে জান? সে তোমার জন্য আসে। আমি কিন্তু একথা কাউকে বলিনি। বললে—আমাদের নিন্দে হবে সেইজন্য।

এবার মাটির দিকে মুখ ঝুঁকে গেল জবার, সে হয়ত আরো অনেক কিছু বলত কিন্তু নকুল আর ভগীরথকে তাদের ঘরের দিকে আসতে দেখে সে ছুটে গেল জবাকে ফেলে রেখে, আমি যাই। ভগীদা এসেছে, নকুলদা এসেছে। ওদের খেতে দিতে হবে।

সরবত দিতে হবে। ভগীদা কি ভাল! সে না থাকলে আমার দাদা কবে মরে ভূত হয়ে যেত।

মীরা দৌড় লাগাতেই নিভে গেল লম্ফো। অন্ধকারে ঠায় একা দাঁড়িয়ে থাকল জবা। সে ভাবছিল-মীরার কথা। মীরা সব জানে। রাত-বেরাতে ঘুরে বেড়ান তার স্বভাব। সে সব দেখেছে। লজ্জায় গুটিয়ে যেতে থাকে জবা। মীরার চোখেও সে ছোট হয়ে গেছে। আজ রাতে গোবিন্দ যদি আসে তাহলে সে নিজেকে ঠেকাবে কিভাবে? পাড়ার কুকুরগুলো তারস্বরে ডেকে উঠলে প্রায় রাতেই ভয়ে ঘুম ভেঙে যায় জবাব। তারপর থেকে সে ঘামতে শুরু করে কলকলিয়ে। কুকুরের ডাক অসহ্য লাগলে বাইরে যাওয়ার নাম করে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে সে। গোবিন্দ দেশলাই জ্বালিয়ে ইশারা করলে জবা ঘোর লাগা মনে চলে যেত তার কাছে। সারাদিনের সব কথা উজাড় করে বলত নির্জন বাঁশবনে। গোবিন্দর দাবী আকাশ ছোঁয়া, জবা বাধা দিয়ে বলত, তা হয় না। তুমি যদি অমন করো আমি আর আসব না। আমি তোমাকে ভালবাসি ঠিকই কিন্তু তা বলে—যা ইচ্ছে করবে সেটা আমি মেনে নেব না।

গোবিন্দ ভেজা বেড়ালের মত বলত, ঠিক আছে। আমি জোর করব না। তোমার যেদিন মন চাইবে সেদিন বলো।

কথা আর ফুরোত না বাঁশবনে। সারা দিনে লোকচক্ষু এড়িয়ে কথা বলা যায় না। গোবিন্দর শুধু ছুঁকছুঁকানী। বুক হাল্‌কা করে কথা বলে ফিরে যেত সে ঘরে।

আজও গোবিন্দ আসবে, ভয়ে মরছে জবা। আসবে যখন বলেছে তখন সে আসবেই, তাকে ঠেকান যাবে না। জবা কি করবে ভাবছিল। কি ভাবে উদ্ধার পাবে আজ রাতটা। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠল জবার। তখনই যোগমায়া ডাকল, বউমা, বউমা—। দেখ কে এসেছে?

জবা দেখল ভগীরথ আর নকুল বসে আছে মাদুরে। মীরা ওদের নিঃশ্বাসের মধ্যে বসে আছে বাধ্য মেয়ের মত, ওদের কথা শুনছে খুব মন দিয়ে। জবা গিয়ে তাদের সম্মুখে দাঁড়াল। ভগীরথ খুব অবাক হওয়া গলায় শুধোল, তুমি আজ ফিরলে বুঝি? কাল কোথায় ছিলে?

জবার কান লাল হয়ে উঠল লজ্জায়, সে এড়িয়ে গেল এই প্রশ্ন। শুধু নীচু গলায় সে বলল, আজ আমি হাসপাতালে গিয়েছিলাম। ওর সাথে দেখা করে এসেছি। ডাক্তার বলেছে, রক্ত না পেলে অপারেশন হবে না? তা ভগীদা, রক্তের কিছু ব্যবস্থা হল?

চার-পাঁচজন রাজি আছে কলকাতায় যাওয়ার জন্য কিন্তু সমস্যা একটা—ওদের তো ভাড়া দিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আমার কাছে অত টাকা নেই, কী করব বুঝতে পারছি না।

টাকার জন্য তুমি ভেব না। আমার কাছে জমানো টাকা আছে। ওগুলো আমি তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি। কাল সকালে তুমি ওদের নিয়ে চলে যাও। যদি বল তো আমিও তোমার সঙ্গে যেতে পারি। জবা থামল, তারপর ছেলের দিকে তাকিয়ে বলল, ও রামকে

দেখতে চেয়েছে। এবার আমি রামকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাই। পথঘাট আমার মোটামুটি জানা হয়ে গেছে। একা ফিরতে আমার অসুবিধা হবে না।

তবু তুমি গোবিন্দকে সঙ্গে নিয়ে যেও। ভগীরথের কথায় চোখ ছোট হয়ে এল জবার, সব সময় কি গোবিন্দ আমাকে নিয়ে যাবে? ওর অত সময় কোথায়? আরও গেলেও আমি ওর সঙ্গে যাব না।

নকুলের মুখ ফসকে বেরিয়ে এল, কেন? গোবিন্দ কি দোষ করল? এতদিন যাওয়া-আসা করে ও তো এঘরের ছেলের মতো হয়ে গিয়েছে!

'ছেলের মতো' কিন্তু 'ছেলে' তো নয়, সেইজন্য। জবার কথার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারল না নকুল, শুধু বিড়বিড় করে বলল, ঠিক আছে, তুমি যদি ওর সাথে না যেতে চাও, আমার সাথে যেতে পারো। অবশ্য যদি তোমার কোন অসুবিধা না থাকে—

কথার ফাঁকে যোগমায়া এল, আজ তোমরা এখানে দুটো খেয়ে যেও। দুপুরে এসে মুড়ি খেয়ে চলে গিয়েছ—খুব খারাপ লেগেছে।

জবা বলল, মার কথাটা রেখো। ভগীদা, তোমরা এত করছ—আমাদেরও তো কিছু মন চায়।

সে পরে হবে। খাওয়ার দিন তো পালিয়ে যাচ্ছে না। ওঠার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল ভগীরথ। মীরা তাকে হাত ধরে বসাল, যেতে দেব না। আজ খেয়ে যেতেই হবে। না খেলে আমি কাঁদব।

তার আন্তরিক কথায় ভগীরথ কেমন কাদার মতো নরম হয়ে এল, ঠিক আছে, খেতেই যখন হবে তখন ঘরে গিয়ে একবার মাকে খবর দিয়ে আসি।

মীরা বলল, তুমি গেলে আর আসবে না। তোমরা বসো। আমি বরং খবর দিয়ে আসছি।

এই রাতের বেলায় তুই আবার কষ্ট করে কেন যাবি?

মীরা হাসল, আমি বেড়াল! রাতে আমার চোখ জ্বলে—জানো না বুঝি?

খাওয়া-দাওয়ার পাঠ চুকতে রাত্রি হল। পুরো পাড়া গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। জবা আগড় পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এল ওদের। বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে জবা বলল, ভগীদা, আমি যে টাকা দেব বলেছিলাম, সেগুলো তুমি নিয়ে যাও। এখন অনেক টাকার দরকার। সে তুলনায় আমার টাকাগুলো হয়ত ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো। আমি ভাবছি—দীঘায় একবার যাব। বাবার কাছে সাহায্য চাইব। এই বিপদের দিনে বাবা নিশ্চয়ই আমাকে শূন্য হাতে ফেরাবে না।

নকুল কিছুতেই জবাকে সহ্য করতে পারে না, না পারার কারণ জবা নিজেই। ক্ষোভ সামলে নিয়ে নকুল বলল, তোমার বাবার কাছে যাওয়ার মনে হয় আর দরকার হবে না। আমি শুনেছি তোমার শ্বশুর কিছু জমিজমা বিক্রি করে দেবে গোবিন্দকে। চেয়ে চিন্তে এত বড় রোগের চিকিৎসা হয় না—এটা সে ভালভাবে বুঝে গিয়েছে।

জবা দুঃখ পেল, ওরা আমাকে এসব কিছু জানায় নি। জানাত যদি তুমি ওদের

বশে থাকতে। নকুলের কথায় আহত হল জবা তবু সে কোন প্রতিবাদ করল না। দোষ তারই। চোরের মায়ের বড় গলা তো সাজে না।

ভোর রাতে ঝড় বৃষ্টিতে নুইয়ে গেল পৃথিবী। কাকের বাসা ভেঙে লুটিয়ে পড়ল কাদায়। কথা মত নকুল আর চারজন এসেছে কলকাতায় যাবে বলে।

ভগীরথ ওদের বলল, যা আকাশের অবস্থা শেষ পর্যন্ত কলকাতায় যাওয়া হবে কিনা কে জানে? ঝড়-জলে ট্রেন যদি বন্ধ হয়ে যায় তখন মুশকিলে পড়ব।

নকুল বলল, ভগবানের নাম করে বেরিয়ে পড়ি, তারপর দেখা যাক কী হয়? ঘর থেকে একবার যখন বেরিয়েচি তখন আর ফিরে যাব না।

ভোররাতের বাসটা এল বেশ দেরি করে। ছ'জন দেখে বাস দাঁড়াল চোরপালিয়ায়। কিন্তু খোঁজ খবর নিয়ে ভগীরথ জানল— এই বাসটা এগরা অব্দি যাবে, এর লাস্ট-স্টপেজ মেচেদায়। এগরা গিয়ে আবার বাস ধরতে হবে খড়গপুর যাওয়ার। মেচেদা অব্দি তারা যেতে পারত কিন্তু খড়গপুরে নেমে রমাকে খবর দেওয়া দরকার নাহলে সে চিন্তা করবে। এমনিতে ভীতু স্বভাবের মেয়ে রমা, ঝড়-জল দেখে সে আরও ঘাবড়ে যাবে।

স্টেশনে নেমে ভগীরথ গেল রিকশায় খবর দিতে কোয়ার্টারে। চিন্তায় রমার মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গিয়েছিল, ভগীরথকে দেখে সে আশ্বস্ত হল। ভগীরথ তাড়াহুড়ো করে বলল, আমাকে এক্ষুনি কলকাতায় যেতে হবে নকুলের সঙ্গে গ্রামের আরও চারজন স্টেশনে আছে। রিকশা ভাড়া লাগবে বলে ওরা আর কোয়ার্টার অব্দি এল না। ওরা টিকিট কেটে রাখবে। আমরা সাতটা দশের হাওড়া লোকাল ধরব।

চা খাবে না? রমা শুধোল।

ভগীরথ ঘাড় নেড়ে নিষেধ করল, চা খেতে গেলে দেরি হয়ে যাবে। তাছাড়া ওরা স্টেশনে বসে থাকবে। তুমি আমাকে একটা ব্যাগ দাও, কাপড়-চোপড়গুলো গুছিয়ে নিই।

আজ ফিরবে না বুঝি?

আজ হয়ত ফেরা হবে না। মনে হচ্ছে এবার ফিরতে দু'দিন দেরি হবে। ব্লাড পেলেই সুদামের অপারেশনটা হয়ে যাবে। ডাক্তার তো এরকমই বলেছেন।

রমাকে চিন্তিত দেখাল, তোমার কাছে টাকা-পয়সা আছে তো?

যা আছে চলে যাবে। ভগীরথ জবাব দিল।

ব্যাগ গুছিয়ে তৈরি হয়ে নিল ভগীরথ, আমি এবার আসি।

ছাতা নিয়েছ তো?

হ্যাঁ সূচক ঘাড় নাড়ল ভগীরথ। তারপর ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করে সে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। রমা তার পেছন পেছন এল, সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে সে বলল, সাবধানে যেও। তুমি বাইরে থাকলে আমার ভীষণ চিন্তা হয়।

পেছন ফিরে হাসল ভগীরথ, আজ আমি একা যাচ্ছি না, আমার সঙ্গে আরও

পাঁচজন আছে। তুমি আমার জন্য চিন্তা করো না। আমি কাজ সেরে ভালয় ভালয় ফিরে আসব।

খড়গপুর স্টেশনে আজ অন্যদিনের তুলনায় ভিড় কম, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যারা আছে তাদের মধ্যে ব্যস্ততা এবং হুড়োহুড়ি কম। অন্য দিন এসময় গিজগিজ করে মানুষ, শুকনো খটখটে থাকে প্ল্যাটফর্ম। আগে থেকেই হাওড়া যাওয়ার লোকাল টিকিট কেটে রেখেছিল নকুল। ভগীরথ সে সব খোঁজ খবর নিয়ে ছ'নাম্বার প্লাটফর্মে এসে দাঁড়াল। বোগদা রিকশা স্ট্যান্ড থেকে সাব-ওয়ে পর্যন্ত আসতে তার প্যান্টের অনেকটাই ভিজে গিয়েছে জলে। প্যান্ট গুটিয়েও লাভ হয়নি কিছু। ভেজা প্যান্ট পরে এতটা পথ যেতে হবে তাকে। শুধু প্যান্ট নয়, জামার কিছুটা অংশ ভিজে গিয়েছে জলের ছাঁটে। কোন উপায় নেই, গায়ে-ই শুকোবে জামা। মাঝে মাঝেই আসছিল দমকা হাওয়া, হাওয়ায় শীতের গন্ধ। দ্রুত আসতে গিয়ে একজন যাত্রী আছাড় খেল প্ল্যাটফর্মের উপর। ভগীরথ ছুটে গিয়ে লোকটাকে কোন মতে ওঠাল, প্ল্যাটফর্মের নোংরায় তার জামা-প্যান্ট একেবারে নষ্ট হয়ে গেল জল-কাদায়। লোকটা বেশ বিব্রত, ঘাবড়ে গিয়ে বলল, এখন ঋতুর কোন ঠিক নেই। বর্ষাকালে চরম রোদ আবার হেমন্তে অঝোর ধারায় বৃষ্টি। নিম্নচাপের কোন ধরণ নেই, যখন খুশি আসছে। এমন লক্ষণ ভাল নয়। পরিবেশ দূষিত হচ্ছে চারদিকে, তার ফল ভোগ করতে হচ্ছে সবাইকে।

লোকটা আর হাওড়া গেল না, ফিরে গেল। নির্দিষ্ট সময়ে মেদিনীপুর লোকাল এসে ঢুকল ছ'নাম্বার প্ল্যাটফর্মে। গাড়ি ফাঁকা ছিল, ফলে বসার জায়গা পেয়ে গেল ওরা। নকুল একটা বিড়ি ধড়িয়ে বলল, এই আমি জীবনে ট্রেনে চাপলাম। ট্রেন ছেড়ে দিল হুইসেল বাজিয়ে। ক্রমশ সরে যেতে লাগল দু'ধারের দৃশ্যপট। হাওড়া পৌছাতে দশটা বাজল। সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে এসে ঘাবড়ে গেল নকুল। ভগীরথ সাবধান করে বলল, যা ভিড়; হারিয়ে যাবার চান্স আছে। হাত ধরে যাওয়াই ভাল।

টিকিট চেকিং-এর গেটের কাছে ওদের আটকে দিল কালো পোষাকেব একজন, হাত বাড়িয়ে বলল, টিকিট?

ভগীরথ টিকিট বের করে দেখাতেই টি.টি.-ই বলল, এতো লোকাল ট্রেনের টিকিট! এক্সপ্রেস এসে লোকাল-এর টিকিট দেখালে চলবে? দিন, ফাইন দিন। ভগীরথ উত্তেজিত হল না, খুবই বিনীতভাবে বলল, আমরা লোকালেই এসেছি।

তা বললে হবে। আপনাদের এক্সপ্রেস ট্রেন থেকে নামতে দেখলাম। ভগীরথ যুক্তি দেখাল, লোক্যাল-এক্সপ্রেস একই সাথে ঢুকেছে। এর জন্য কি আমরা দায়ী?

তা আমি জানি না; টাকা বের করুন।

টাকা কি সস্তা নাকি! ভগীরথের কথায় এবার উত্তেজিত হয়ে উঠল কালো পোষাকের ব্যক্তি, টাকা যদি না দেবেন তাহলে অফিসে চলুন।

ভগীরথ বলল, যেখানে খুশি নিয়ে যেতে পারেন, তবে আমাদের তাড়া আছে। নীলরতনে আমাদের পেশেন্ট ভর্তি আছে। পেশেন্টের আজ মেজর অপারেশন। ব্লাড না দিলে তার অপারেশন আটকে যাবে। শুধু আজ নয়, অনেকদিন থেকে আমি

খড়গপুর-কলকাতা যাতায়াত করছি। এই দেখুন পুরনো টিকিটগুলো।

ভগীরথ মানি-ব্যাগ থেকে পুরনো টিকিটগুলো বের করে দেখাল। টি.টি.ই'র বিশ্বাস অর্জনে সমর্থ হল সে। টি.টি-ই কপট রাগ দেখিয়ে বলল, যান। ভবিষ্যৎ-এ এরকম আর করবেন না।

কথায় কথা বাড়ে; ভগীরথ সে পথে আর হাঁটল না, গেট পেরিয়ে চলে এল বাইরে। নকুল দম ছেড়ে বলল, সাহস না থাকলে আজ আমরা ফেঁসে যেতাম। সত্যি, কী শুকনো বিপদ বল তো।

ডাঃ মিত্রের সঙ্গে দেখা করতেই পেরিয়ে গেল দুপুর। রক্ত দেওয়া-নেওয়ায় যে এত ঝামেলা আগে জানা ছিল না ভগীরথের। ডাঃ মিত্র রাউণ্ড সেরে বলে গেলেন কালই ও.টি.-তে যাবে সুদাম। মেজর অপারেশন তবু চিন্তার কোন কারণ নেই। সব শুনে গলা শুকিয়ে আসছিল ভগীরথের, সুদামের জন্য তার চিন্তা হচ্ছিল ভীষণ। তবু ডাঃ মিত্র সাহস দিয়েছেন, এইটুকুই যা ভরসা।

খিদেয় পেট জ্বলছিল সবার। নকুল ব্যস্ত হয়ে বলল, এবার কিছু খেয়ে নিলে মনে হয় ভাল হোত।

ভগীরথ পাউরুটি আর চা-খাওয়ার কথা বলতেই রাজি হল না কেউ। নকুল বলল, সারাদিন ভাত জোটেনি, ভাত পেলে সব চাইতে ভাল হোত।

এতদিন যাওয়া-আসায় একটা ফুটপাথের হোটেলের সঙ্গে জানাশোনা হয়েছিল ভগীরথের। ওরা সবাই ভাতের কথা বলতেই ভগীরথ নিমরাজি হয়ে বলল, তা হলে ভাতই খাওয়া যাক। এখানে একটা সস্তায় হোটেল আছে, সেখানেই যাওয়া যাক।

হাসপাতালের পাচিল লাগোয়া কয়েকটা হোটেল, পথ চলতি মানুষের মধ্যেই জমে উঠেছে ব্যবসা। গাড়ির হর্ন, বৃষ্টির ছাঁট, নোংরা-আবর্জনা, মশা-মাছি সব কিছুকে অগ্রাহ্য করে যারা ওখানে খেতে পারে— তাদের কিছু পয়সা অবশ্যই সাশ্রয় হয়। হোটেলের মাথার উপর পলিথিনের ছায়া, কাঠের বেঞ্চি লাইন দিয়ে পাতা। জলের ড্রাম রাস্তার একপাশে রাখা, হাত-মুখ ধোওয়ার এমন উপযুক্ত জায়গা আর কোথায় আছে। ভগীরথ সবার আগে গিয়ে হাত ধুয়ে এল ড্রামের জলে, তার দেখাদেখি নকুল এবং অন্যান্যরা। তখনও টিপটিপ করে বৃষ্টি ঝরছে, নীল পলিথিনে চড়বড় শব্দ, আর সেই শব্দকে ছাপিয়ে গরম তেলে রুইমাছ ভাজার শব্দ— সে এক মায়াবী পরিবেশ। ভগীরথ গ্যাট হয়ে বসে দরদাম করল মাছভাতের, তার অস্থির চোখ খুঁজে বেড়াচ্ছিল চেনা সেই মানুষটাকে যে কিনা তার কাছ থেকে দু'একটাকা কম নিত, ভাত দিত বেশি, মাছের ঝোলও দিত, একস্ট্রা ডাল-ও দিত অথচ ওগুলোর কোন দাম ধরত না। সেই দেবদূত তুল্য দয়াময় মানুষটিকে আজ দেখতে পেল না ভগীরথ, শুধু সে কেন—আগে যারা খাবার দিত তাদের কাউকেই নজরে পড়ল না ভগীরথের। বেশ অবাক হয়ে সে জিজ্ঞেস করল, সেই লম্বা রোগা করে মানুষটা কোথায় গেল, তাকে তো আজ কই দেখছি না? বেঁটে মতন একটা লোক এগিয়ে এল ভগীরথের সামনে, কালো দাঁত বের করে হাসল সে, এটা হল গিয়ে পালার হোটেল। ওর সাত দিন, আমার সাত দিন। এভাবেই পালা করে

চলে আসছে বছরের পর বছর। ওর স্টাফ সাতদিন পরে আসবে। এখন যারা কাজ করছে তারা সব আমার কর্মচারী। লোকটা হি-হি করে হাসল, রজনী নেই বলে চিন্তার কোন নেই। আমি তো আছি। আমি যত্ন করে খাওয়াব। দাম সেই একই। মাছ-ভাত-ডাল-তরকারি মাত্র বারো টাকা। লেবু-পেঁয়াজ তো আছেই।

ছ'প্লেট মাছ-ভাত সাজিয়ে দিল লোকটা, অমায়িক হেসে বলল, বৃষ্টির জন্য আজ একটু শান্তি করে খেতে পারবেন। অন্যদিন হলে এ-সময় কাস্টমার দাঁড়িয়ে থাকে খাওয়ার জন্য। আমার ফুটপাথের হোটেল হলে কী হবে, এখানে বাসি-পচার কোন সিন নেই। সব একেবারে হাতে গরম, টাটকা-টাটকা। তা আপনাদের পেশেন্ট বুঝি ভর্তি আছে হাসপাতালে? আসবেন, রেট নিয়ে কোন ঝামেলা হবে না। কম-সম করে দেব। আমরা তো বুঝি-মানুষ কত বিপদে পড়ে এখানে আসে।

খাওয়া শেষ হলে হিসাব করে দাম মিটিয়ে দেয় ভগীরথ। খাওয়ার পরে পান না হলে মুখটা কেমন বিস্বাদ লাগে নকুলের, সে উশখুশিয়ে শুধোল, এখানে পানের দোকান নেই?

ভগীরথ বলল, পান খেতে গেলে গেটের সামনে যেতে হবে। এক খিলি পান এক টাকার কমে হবে না।

সে কি এত দাম!

ভগীরথ হাসল, এটা কলকাতা শহর। এখানে মানুষ জলও কিনে খায়। ভিজিটিং আওয়ার্সের এখনও আধঘন্টা বাকি, ওরা গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে হাসপাতালের বারান্দায়। মেঘের যা দশা আজ মনে হয় তার কান্না থামবে না। সামনের তারজালি ঘেরা পুকুরটায় জলের ফুল ফোটাচ্ছে বৃষ্টির ফোঁটা। ভেজা কাকগুলো তখন ও গাছে বসে কা-কা করে ডাকছে। বেড়াল-কুকুর-শুয়োরের ছড়াছড়ি হাসপাতাল চত্বরে, এখন যে যার মাথা বাঁচাতে ব্যস্ত। নকুল পানের পিক ফেলে এল বারান্দার ধারে গিয়ে। তাকে খেঁকিয়ে উঠল গেট-কিপার। নকুল মাথা হেঁট করে ফিরে এল ভগীরথের কাছে। একটা খবরের কাগজ পেতে তার উপর বাবু হয়ে বসেছে ভগীরথ, সারা দিন হেঁটে, চলে তার মাজা আর পারছে না, মাঝেমাঝেই কনকনিয়ে উঠছে ব্যথায়।

সুদামের সাথে দেখা করে ফিরতেই সন্ধ্যে ছ'টা বেজে গেল। তখনও বৃষ্টির তোড়জোর কমেনি, কোমর কষে নামবে এমন প্রস্তুতি চারদিকে। হাসপাতালের সামনে চেটো ডোবা জল, সেই স্বল্প জলে নোংরা ভাসছে থকথকিয়ে। ভগীরথ পা টিপে টিপে হেঁটে এল গেটের কাছে। গা ঘিনঘিনিয়ে উঠেছে তার ঘেন্নায়। নকুল তার পাশে দাঁড়িয়ে জলের ছাঁট খাচ্ছে অনবরত। ভগীরথ সুদামের কথা মনে করে বলল, আজ আর খড়গপুর ফিরব না, কলকাতায় থেকে যাব। কাল সুদামের অপারেশন। তোমরা চলে গেলেও আমাকে থাকতে হবে। তবে সবার থাকার দরকার নেই, আমার সঙ্গে যে কেউ একজন থাকলেই হবে।

নকুল বলল, আমি থাকব। বাড়িতে আমি বলে এসেছি। তবে কালকের থাকা নিয়ে আমি এখন ভাবছি না। আমি ভাবছি—আজ রাতে আমরা এতগুলো মানুষ থাকব কোথায়?

ভগীরথ না ভেবেই বলল, হাসপাতালের বারান্দা আছে, আজ রাতটা আমরা ওখানেই থেকে যাব। হাসপাতালের বারান্দায় অনেক পেসেন্ট-পার্টি শুয়ে থাকে। তবে সাবধানে শুতে হবে। ঘুমিয়ে গেলে টাকা-পয়সা চুরি-চামারি হওয়ার ভয় থাকে।

সে কি, এখানেও চুরি হয়? আকাশ থেকে পড়ল নকুল, তাহলে এখানে আর থেকে লাভ নেই। চলো আমরা তাপস মাস্টারের বাড়িতে চলে যাই।

ঐ জোচ্চোরের বাড়িতে কে যাবে? ভগীরথ বেঁকে বসল। অনেক ভেবে সে বলল, গোবিন্দর মাসীর বাড়ি এখানে। চলো আমরা ওখানেই যাই।

রাজি হয়ে গেল সবাই।

গোবিন্দ'র মাসীর বাড়িটা পুরনো আমলের। গেটের সামনে দুটো সিমেন্টের সিংহ আভিজাত্যের শেষ রক্ষাকবচ। ঠিকানাটা খুঁজে পেতে বিশেষ দেরী হল না ভগীরথের। কলিং বেল টিপতেই স্বয়ং ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন তারা মাসী, দলবল দেখে চোখ কুঁচকে গেল তার, ধড়াস করে উঠল বুক তবু জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, তোরা এই অসময়ে? কোথা থেকে আসছিস?

সুদাম নীলরতনে ভর্তি আছে। রক্ত দিতে হল। আজ রাতটা তোমার এখানে থাকব। ভগীরথ দ্বিধাহীন গলায় বলল।

তারা মাসী বলল, তা থাক, অসুবিধা কিছু নেই। ঘর তো পড়েই আছে। তবে এখানে থাকতে গেলে কিছু নিয়ম মানতে হবে। বড় বাথরুম পেলে গামছা পরে যেতে হবে। গামছা কাচতে হবে। কুয়ো ছোঁয়া চলবে না।

ভগীরথ নকুলের মুখের দিকে তাকালো, ঘড়িতে তখন সাড়ে সাতটা।

ভগীরথ বলল, মাসী, আমরা হোটেল থেকে খেয়ে আসব। আমরা অনেকজন আছি। তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না।

তা বললে কি হয়, কতদিন পরে এলি? তারা মাসী ভয় পাওয়া চোখে তাকাল, তারপর শুকনো ঢোক গিলে বলল, আমার অবশ্য রাতের রান্না হয়ে গিয়েছে। গত সাতদিন থেকে বাতের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছি। তবু তোরা বস। আমি চা করে আনি— । তারপর গ্রামের গল্প শোনা যাবে। কত দিন আমি গ্রামে যাইনি। খুব মন খারাপ করে।

যেতেই পার, তবু যাওনা কেন?

তারা মাসী কষ্ট করে হাসল, এখন আর যাওয়া বললে কি যাওয়া হয় রে! সংসারের কত ঝামেলা! তোদের মেসো তো হিল্লি-দিল্লি করে বেড়াচ্ছে। আমি বুড়ি শাশুড়িকে নিয়ে একা পড়ে আছি। বাচ্চা-কাচ্চা তো আর হল না!

মেঘে ছেয়ে আছে কলকাতার আকাশ। ঘরে ভেতরেও গাড়ির আওয়াজ। নকুলের মনে হল এ-ও সমুদ্র। ঢেউয়ের তর্জন-গর্জন, পাখির ডাক হুবহু এক। মানুষ একাকী ঢেউ ডিঙা নিয়ে চলেছে অনন্তযাত্রায়। কানের ভেতর বাজে— সমুদ্রের ঢেউ ভাঙার শব্দ। এই শব্দের বুঝি শেষ নেই। যেখানে মানুষ সেখানে সৃষ্টি হয়েছে সমুদ্র। সামনে সাগর, পেছনেও সাগর। নোনা জলের বুঝি শেষ নেই।

॥ বত্রিশ ॥

সুদামের অপারেশন ভালভাবে হয়ে গিয়েছে, ডাঃ মিত্র স্বস্তির শ্বাস নিয়ে বললেন, চিন্তার কোন কারণ নেই, আর দিন দশেকের মধ্যে ওকে আমরা ছেড়ে দেব।

ভগীরথ তার কাজের জায়গায় ফিরে এসেছে, কেন না রমার শরীরটাও ভাল নেই ক'দিন থেকে। এর মধ্যে জবা এসেছিল একদিন খড়গপুরে দেখা করতে। রমা তাকে বুঝিয়েছে, মেয়েদের বিয়ের পরে স্বামী ছাড়া আর কিছুই থাকে না। ভুল যা হয়েছে সেই ভুলের সংশোধন আছে, ক্ষমা আছে।

জবাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার কথা বলল রমা। জবা খুব মন দিয়ে শুনল কথাগুলো, নিজের প্রতি তার ধিক্কার জন্মেছে প্রচণ্ড। সমুদ্র তার জীবনটাকে ঘিরে রেখেছে ভাঙা-গড়ার মধ্যে দিয়ে। জবা ভেবে পেল না তার জীবনে কেন এত অঘটনের স্রোত। টগর-বিষ্ণু ওরা তো বেশ সুখে আছে, ওরা কেউ প্রয়োজন মনে করে না জবার খোঁজখবর নেওয়ার। তবু মাঝেমধ্যে ওদের কথা মনে করে কষ্ট পায় জবা। বাকি জীবনটা সে কিভাবে কাটাবে—এই নিয়ে তার যত চিন্তা। সুদাম ঘরে এলেও তার আর কর্মক্ষমতা থাকবে না। এত বড় অপারেশনের পরে তার পূর্ণ বিশ্রাম প্রয়োজন। এদিকে গোবিন্দর লোভ তাকে গ্রাস করতে চায় মাঝে মাঝে। অভাব-ই তার জন্য দায়ী। তবু যোগমায়া বলে, তুমি ঠিক থাকলে আমাদের কোন চিন্তা নেই। তোমার শ্বশুর এখন আর আগের মত খাটতে পারে না। সংসার কী ভাবে চলবে জানি না। আমিও খুব চিন্তায় আছি বউমা। এ সংসারে এখন শুধু বিপদের উপর বিপদ। মীরাকে তো সামলান দায়। সে মনে হয় আবার গোবিন্দর খপ্পরে পড়েছে।

আকাশপাতাল ভাবনা এসে ভিড় জমায় জবার মনে। সে ঠিক করে রেখেছে সুদাম ঘরে ফিরে এলে তারা দীঘায় চলে যাবে। ওখানে গিয়ে কিছু একটা করবে। কিছু সুরাহা না হলে দশরথের হোটেলটা সে চালাবে। দীঘায় হাত-পা নাড়ালে ভাত-কাপড়ের তার অভাব হবে না। কিন্তু তার এই প্রস্তাব কি মেনে নেবে সুদাম, যা অভিমানী ছেলে, তাকে তো বোঝান দায়।

রমা বলল, তুমি চিন্তা করো না, বিপদ যিনি দিয়েছেন—তিনিই সব ঠিক করে দেবেন। ভগবানের বিচার একচক্ষু বিচার নয়।

সেই আশায় এখনও বুক বেঁধে আছে জবা। তার বিশ্বাস পথ নিশ্চয়ই একটা বেরিয়ে আসবে। আবার আলো দেখতে পাবে তারা। ঝড়ের এই কালো রাত নিশ্চয়ই দীর্ঘস্থায়ী হবে না।

ভগীরথ ডিউটি থেকে ফিরে জবাকে দেখে অবাক হল। কুশল শুধিয়ে সে বলেছিল, যাও বিপদ কেটে গেছে, সুদামের জন্য আর চিন্তা করো না।

জবা ভগীরথের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেই বাধা দিয়েছিল সে, আমি কিছু নই, যা করার ডাঃ মিত্রই করেছেন। উনি তো মানুষ নয়, ভগবান। আজ সুদাম সুস্থ হয়ে ফিরে আসার পেছনে ওনার হাতই প্রচণ্ড।

খাওয়া-দাওয়ার পরে জবাকে কৌশল্যা অব্দি পৌঁছে দিতে এসেছিল ভগীরথ। বাস আসার দেরী ছিল, জবা বলল, দাদা, আমি ভাবছি দীঘায় চলে যাব। সেখানে বাবার হোটেলটা চালাব। গাঁয়ে তো বেঁচে থাকার মত কিছু নেই, তাছাড়া রামও বড় হচ্ছে, ওকে ইস্কুলে ভর্তি করতে হবে।

ভগীরথ অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, পেটের দায়ে মানুষকে কোথায় না যেতে হয়। তুমি যা ভাল বুঝবে করবে, এনিয়ে আমার কোন দ্বিমত নেই।

খড়গপুর থেকে ফিরে আসার তিন দিন পরে দীঘা চলে গেল জবা, গোবিন্দ তার পিছু ছাড়েনি তখনও। জবা তাকে বাধা দিয়ে বলল, আমি বাবার বাড়ি যাচ্ছি। দু'চারদিনে ফিরে আসব। ফিরে এসে তোমরা সাথে কথা হবে। তবে তুমি যা চাও তা আমার দ্বারা আর সম্ভব নয়। তুমি বিয়ে করে সুখী হও, এটাই আমি চাইব। তোমরা একার চাওয়াতে এখন আর কিছু নির্ভর করবে না। তোমরা চাওয়ার সাথে আমার চাওয়াটা যে মিশে গেছে। গোবিন্দ বোঝাতে চাইল, আমি এতদিন তোমার পেছনে ঘুরেছি, এর বদলে আমি কি পেলাম? খালি হাতে কেউ ফেরালে আমিও তাকে ছাড়ি না।

বাস এসে যাওয়াতে কথা আর বেশি দূর গড়াল না। জবা চলে এল দীঘায়। এখানে এসেও সে ভুলতে পারছে না গোবিন্দর শাসানীর কথা। গোবিন্দ শেষ পর্যন্ত কী করবে বুঝতে পারছে না জবা। তবে সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে যতই ভয় দেখাক গোবিন্দ সে আর পাপের রাস্তায় হাঁটবে না, তাতে যা হয় হোক!

দীঘা যেন প্রতিদিন-ই বদলে যেতে থাকে। ক'দিনের আগের ঘূর্ণিঝড়ে ডুবে গেছে দশখানা ট্রলার। প্রায় পঞ্চাশজন মৎস্যজীবীর সন্ধান পাওয়া যায়নি এ কয়দিনে। হোভার ক্রাফট নিয়ে নদী-মোহনায় তল্লাশি চালিয়েও হদিশ পাওয়া যায়নি ট্রলার কিংবা মানুষের। ওরা সব গেল কোথায়—এ নিয়ে সমদ্রকূলে নানাজনের নানা মত। তবে দশরথ বলল, ওরা হারিয়ে গেছে মহাসমুদ্রে। কেউ বেঁচে থাকলেও থাকতে পারে, যারা ফিরে আসবে তারা তো ভাগ্যবান।

জবা দশরথের মুখে গল্প শুনেছে, বছর খানিক পরেও ফিরে এসেছে সমুদ্রে হারিয়ে যাওয়া জেলে। তার চেহারার বর্ণনা দিয়েছে দশরথ। বড় বড় নখ, সাধুসন্ন্যাসীদের মত জটা ধরা চুল, গায়ে ঝিম-ময়লা, অনেকটা সে যেন প্রস্তরযুগের মানুষের মত দেখতে। কীভাবে এতদিন বেঁচেছিল সমুদ্রবক্ষে সে সব লোমহর্ষক কাহিনীগাঁথা। এমন অজস্র সব কাহিনীর সাক্ষী হয়ে এখন ও সংসার করছে সেইসব জেলেদের বউ। সমুদ্র না হলে যাদের এক পা-ও চলে না, সমুদ্র যাদের মুখে অন্ন দেয় তারা কীভাবে ঐ নোনা জলরাশিকে শত্রু ভাবে? তবু এই সমুদ্র তাদের শাঁখা ভেঙেছে, সিঁদুর তুলেছে—তবু তারা অপেক্ষায় আছে, ফিরে আসবে প্রস্তরযুগের মানুষের চেহারায় তাদের স্বামী। অপেক্ষার তাই শেষ নেই। বস্তিতে ক্রমশ বাড়ছে বিধবাদের সংখ্যা, যাদের স্বামী মাছ ধরতে গিয়ে আর ফিরে আসেনি, আর কোনদিনও হয়ত ফিরে আসবে না। জবা তখন বুঝত না, এখন সব হারানো মেয়েমানুষগুলোর দুঃখ বোঝে।

আকাশ কালো হলেই তার বুকে ভয়ের সাপ দংশায়। কার আবার ঘর ভাঙল কে জানে, কার আবার শুরু হল প্রতীক্ষার পালা কে জানে। যে মানুষটা সমুদ্রে যায় সে আর ফিরবে কিনা, ডাঙা পাবে কিনা তা সে নিজেও জানে না। ভাগ্যের উপর জীবন বাজি ধরে শুধু এগিয়ে চলা। এ এক অভিশপ্ত খেলা, যতদিন সমুদ্রে জল থাকবে— এ খেলার বুঝি শেষ হবে না। এতদিন হয়ে গেল তবু শোক মুছে ফেলতে পারেনি দীঘার সমুদ্র। উপকূলে তার প্রভাব। ফিশ-ট্রেডারস অফিসের সামনে এখনও ঘুরঘুর করে কত মানুষ। ওয়্যারলেশের খবর শোনার জন্য হা-পিত্যেশ করে বসে আছে বেশ কিছু মানুষও। ট্রলার-মালিক। মৎস্যজীবী সংগঠনের নেতারা দোষ দেয় আবহাওয়া দপ্তরকে। নিম্নচাপের কথা ঘোষণা করেও তারা কেন সতর্ক করল না মৎস্যজীবী মানুষদের। চাপান-উতোর যতই চলুক, যার গিয়েছে সে বোঝে। তেলের ড্রাম ধরে জলে ভেসে এসেছে এক জেলে। তাকে ছেঁকে ধরেছে জিজ্ঞাসু মানুষ। পাড় ছুঁতেই সে জ্ঞান হারাল। দশরথও গিয়ে দেখে এসেছে সেই ভাগ্যবান মানুষটাকে।

ক'দিন ধরে ভাল ভিড় হচ্ছে দশরথের হোটেলে। একটা বউ ছেলে কাঁখে নিয়ে খেতে এসে এক মুঠো ভাত-ও খেতে পারল না কান্নায়। দশরথ তাকে বুঝিয়েছে সাগরমাতার উপর বিশ্বাস রাখো—সব ঠিক হয়ে যাবে। কথাগুলো বললেও তার মনে ব্যাপক ভয়। সমুদ্র যাকে নেয় তাকে তো ফিরিয়ে দেয়। হয়ত একদিন পচে ঢোল হয়ে ফিরে আসবে কারোর লাশ, নয়ত সারণি জালে আটকে পড়ে ভেসে আসবে কিনারায়। এমন দৃশ্য তো একবার নয় বহুবার দেখেছে দশরথ। এই সমুদ্রধার তার জীবনে নোনা-হাওয়ার মতো মিশে গেছে। একবার ভাবে দশরথ-এখান থেকে চলে যাবে। সমুদ্রের এই মাতালরূপ তার ভাল লাগে না। কিন্তু মরা পেটের জন্য পড়ে থাকতে হয় এখানে। কোথায় যাবে সে? যাওয়ার পথ কোথায়? নোনাজল আটকে দিয়েছে তার সব রাস্তা।

জবাকে দেখে দশরথের বিশ্বাসই হয় না এসময় তার মেয়ে আসতে পারে। দুপুরের চনমনে রোদে বালি ওড়ে হাওয়ায়, সমুদ্রের গর্জনে ভেসে আসে মানুষের স্নানের শব্দ। কেরিপাখি ওড়ে ডানা ঝাপটিয়ে। বালির উপর ছুটে যায় দুরন্ত ঘোড়া। কেউ ছবি তোলে, হাসে। কেউ আবার প্রেমিকাকে বাহুবন্ধনে নিয়ে যায় গোপনে-নির্জন ঝাউবনে। সবাই ব্যস্ত, শুধু ব্যস্ত থাকে না দশরথ। সে যেন পাড় বাঁধানো কঠিন বোল্ডার, শুধু ক্ষয়ে যাওয়া, নট নড়ন-চড়ন। জবা কাছে এসে ডাকল, বাবা?

সম্বিত ফিরে এল দশরথের, বস। আমি হাতের কাজ সেরে আসছি। একা মানুষ। কতদিক আর সামলাব।

জবা তাকিয়ে আছে তার বাবার দিকে। কত রোগা হয়ে গেছে দশরথ। গেঞ্জির উপর ঠেলে উঠেছে হাড়। গলার কণ্ঠা নড়ে ঘনঘন। কাঁচা-পাকা চুলে যত্নের অভাব। চেহারার সর্বত্র পরিশ্রমের ধকল। শরীরেও বুঝি জোয়ার-ভাঁটা চলে। শরীর বুঝি চোরাবালির মতো। কখন ডুবিয়ে দেবে কেউ জানে না।

হাতের কাজ সেরে দশরথ এসে বসল জবার মুখোমুখি। ভাল করে মেয়েকে দেখে

নিয়ে বলল, তোর চোখ-মুখে তো কালি বসে গিয়েছে! কি রে অসুখ করেছিল বুঝি?

জবার মুখে কথা সরল না। শুধু কেঁপে উঠল চোখের তারা। কান্না ঠেলে উঠল গলায়, শুধু অসুখে কি চোখে-মুখে কালি পড়ে বাবা? তোমার জামাইয়ের শরীর ভাল নেই, কলকাতায় ভর্তি আছে।

সে কি রে, আমাকে কেন বলিস নি? এখন কেমন আছে?

অপারেশন হয়েছে। সেলাই কাটা হলে ছেড়ে দেবে। জবা সহজ হবার চেষ্টা করল, খুব অসুবিধায় পড়ে তোমার কাছে এসেছি। আমাকে কিছু টাকা দিতে হবে।

নগদ টাকা কোথায় পাব মা।

যেখান থেকে পার এনে দাও। পরে তোমার জামাই এলে শোধ করে দেব।

সে তো বুঝলাম— কিন্তু। সমুদ্রের দিকে হা করে তাকিয়ে থাকল দশরথ। তার মুখ থেকে কে যেন রক্ত শুষে নিয়ে পালিয়ে গেল, এমন ফ্যাকাসে মুখে চেয়ে আছে দশরথ। হঠাৎ তার নজর গেল রামের দিকে। হাত বাড়িয়ে রামকে বুকে টেনে নিল সে। আদর করল বহুক্ষণ। শেষে বলল, দাদু, কি খাবি বল?

রাম হা-করে দেখছিল দশরথকে। দশরথও দেখছিল রামকে। ক' মুহূর্ত তিন জনে যেন বোবা। দশরথ সেই নীরবতা ভাঙল, হাত-মুখ ধুয়ে নে। আজ ভেটকিমাছ রেঁধেছি। দুটো খেয়ে নে।

জবার খাওয়ার ইচ্ছা ছিল না তবু সে বেঞ্চিতে গিয়ে বসল, বাবা, আজই আমি চলে যাব।

সে কি রে, এখুনি তো এলি!

ভাল লাগছে না। জবা মুখ ফিরিয়ে নিল।

মন খারাপ করিস না। আমি দেখছি কি করা যায়।

আমাকে কলকাতায় যেতে হবে। অনেকদিন কেউ তার কাছে যায়নি। সে একা আছে সেখানে। জানি না কেমন আছে এখন? চিন্তায় ভেঙে পড়ল জবা। অর্ধেক খেয়ে উঠে পড়ল সে।

দশরথ আপন মনে বলল, আমি যে কলকাতায় গিয়ে জামাইকে দেখে আসব তেমন উপায় আমার নেই। হোটেল বন্ধ রাখলে খদ্দের ঘুরে যাবে। তাছাড়া মাসকাবারী কিছু খদ্দের আছে। বাসের কিছু লোক আমার এখানে খায়। আমি চলে গেলে তারা সব যাবে কোথায়?

তুমি কি সবার ঠিকে নিয়ে বসে আছো? যদি তোমার কোন রোগজ্বালা হয়— তখন কি হবে?

জবার প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারল না দশরথ, চুপচাপ মাথা হেঁট করে বসে থাকল সে। জবা রামের হাত ধরে বাইরে এল। বাস-লরির শব্দে ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠল কান, বাইরের আলোয় ধাঁধিয়ে গেল চোখ। হেঁটে হেঁটে জবা ঝাউবনের কাছে এসে দাঁড়াল। হাওয়ার তীব্রতায় উড়ে যাচ্ছিল জবার আঁচল। রাম হাঁ করে তাকিয়ে আছে সমুদ্রের দিকে, তার ছোট্ট চোখে অপার বিস্ময়। সে দৌড়ে বেড়ালো বালিচরে। দু'বার

পড়ল আবার উঠে দাঁড়াল। জবার মনে হল রাম নয় যেন দৌড়ে বেড়াচ্ছে সুদাম। বালিতে ডুবে যাচ্ছে তার পা। জবা ভয় পেয়ে বুকে টেনে নিল রামকে। আদর করে চুমু খেয়ে বলল, তুই সমুদ্রের মতো হোস। তোকে নিয়ে যে আমার অনেক স্বপ্ন।

সমুদ্র শান্ত হয়ে আছে এখন। ছোট ছোট ঢেউ এসে লুটিয়ে পড়ছে বালিতে, ফেনায় ভরে যাচ্ছে বালি। কুঁচো মাছ আর ঝিনুকের দল বালিতে শেষ নিঃশ্বাস ছাড়ার জন্য অধীর অপেক্ষায়। ছোটবেলায় ঝিনুক কুড়োতে আসত জবা আর টগর। জানতে পারলে বকাঝকা করত দশরথ। বলত, ঝিনুক কুড়ালে কি দিন চলবে? সামনে অশান্ত সাগর তবু ভয় পেত না ওরা, দশরথের অশান্ত মূর্ত্তি থিতিয়ে যেত ধীরে ধীরে। দুই বোন ঝিনুক কুড়িয়ে ফিরে আসত ডাঙায়। টগর আহ্লাদ করে বলত, এই বালুচরা আমার ভাল্ লাগে না, দেখবি আমি একদিন ডাঙায় পালিয়ে যাব। আর এখানে আসব না।

সমুদ্রের প্রতি টগরের ছিল তীব্র অনীহা। নোনাজল, ঘূর্ণি বাতাস, ঘুরতে আসা লাগাম ছাড়া মানুষ, বাহারী সাজসজ্জা ভাল লাগত না তার। সমুদ্রের রূপ-বৈভব দেখে-দেখে হাঁপিয়ে উঠত সে।

জবার ছিল উল্টো বয়ান, সে কিছুটা নিঃশ্চুপ ধীর স্থির সাগরের মতো। টেনে টেনে বলত, ঐ ছোট ডিঙাটার মতো আমারও হারিয়ে যেতে মন চায়। কোনদিন পারব কিনা জানি না তবে খুব ইচ্ছে করে। ঢেউডিঙা তো কারোর শাসন মানে না, সে তো নিজের খেয়ালে ভাসে, নিজের ইচ্ছায় ডোবে। তাকে যে আমার কেন এত ভাল লাগে আমি নিজেও জানি না।

হোটেলওয়ালা দশরথের দুই মেয়ে যেন দুই মেরুর বাসিন্দা। দু-জনের জীবন ঘিরে শুয়ে রয়েছে আস্ত এক সাগর। কেউ ডিঙোতে পারে, পেরতে পারে না, বারবার ঘুরে ফিরে আসা, কেবলই দূর থেকে দেখা।

জবা হাঁপিয়ে উঠছিল সমুদ্রের ঢেউ গুনতে গুনতে। হঠাৎ-ই তার সাথে দেখা হয়ে গেল চা-দোকানী অবনের সাথে। মানুষটা সমুদ্রের দিকে হা-করে তাকিয়ে আছে, চোখে শূন্যতা। কেউ হারিয়ে গেছে, সে খুঁজছে এমনই আর্তিভরা চাহনি। অবনের আগের পেটা চেহারা এখন যেন মরচে ধরা লোহা, কিছুটা নুইয়ে গেছে ঘাড় এবং কোমর, ঝরে গেছে জৌলুষ, চাকচিক্য, এখন তাকে ভাল করে না দেখলে চেনাই যাবে না।

জবা ছুটতে ছুটতে এগিয়ে গিয়ে পেছন থেকে ডেকে উঠল, কাকা।

যেন ডাকটা শুনতে পায়নি এমনভাব, অবন তাকিয়ে আছে দূর সমুদ্রের দিকে। জবা এভাবে কাউকে সমুদ্র দেখতে দেখেনি। চা-দোকানের মালিক অবন, সে কেন অমনভাবে সমুদ্র দেখে? ছ্যাঁৎ করে উঠল জবার হৃদয়। একেবারে পাশে গিয়ে দাঁড়াল সে, কাকা!

এবার আচমকা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল অবন, জবাকে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠল, শুকনো চোখ রগড়ে নিয়ে কোন কথা না বলে তাকিয়ে থাকল জবার মুখের

দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে।

জবা শুধোল, কাকা, তোমার কি আজ দোকান বন্ধ? কি হয়েছে তোমার? কথা বলছ না কেন?

এবার আর কথা নয়, হাউহাউ করে বুক ফাটিয়ে কেঁদে উঠল অবন, কথা আমার হারিয়ে গেছে। আমার মুখে আর কোন ভাষা নেই। আমার সব কথা এই সমুদ্র কেড়ে নিয়েছে। এই সমুদ্র আমরা জীবনটাও নেবে। আমি আর পারছি না, আমি পাগল হয়ে যাব।

জবা সমস্ত হৃদয় দিয়ে বুঝতে চাইল অবনের কথা, কিন্তু পারল না সে, হেরে গিয়ে নিজেই ব্যথিত চোখে তাকাল।

অবন সহসা জবার হাত দুটো নিজের মুঠোয় এনে বলল, আমার সব হারিয়ে, গিয়েছে ঝড়ে। আমার স্বপন ট্রলারে গিয়েছিল মাছ ধরতে, সে আর ফেরেনি। আজ কতদিন হল তার পথ চেয়ে আমি এখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকি। কত লোক ফিরে এল, আমার স্বপন আর ফিরে এল না! ওর মা কাঁদতে কাঁদতে পাগল হয়ে গিয়েছে। ঘরে বউমা, সেও গর্ভবতী। এবার তুই বলতে পারিস— কার ভরসায় আমরা এখন বাঁচব?

জবা নিঃশ্চুপ হয়ে গেল কথা শুনে। অবনের হাত ধরে সে নিয়ে এল ভেজা বালি থেকে শুকনো ডাঙায়। সান্ত্বনা দিয়ে বলল, স্বপনদা ফিরে আসবে— আমার মন বলছে। তোমার এত বড় ক্ষতি সমুদ্র কোন দিন করবে না।

সেটা তো আমিও জানতাম কিন্তু এ কী হল বলতো? বউমার কাছে আমি যে মুখ দেখাতে পারছি না। ঝাঁকুনি দেওয়া কান্নায় ভেঙে পড়ল অবন, সমুদ্র সব খায় জানতাম, সে যে আমার ছেলেকে খেয়ে নেবে— এটা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

রোদ সরে গিয়ে আকাশের পড়ে আকাশের নীল জলে। ঠাণ্ডা হাওয়ার স্রোত বইতে থাকে এদিক-সেদিক। গায়ে ফুটে ওঠে নোনা ভাব। এত মানুষের শোকের মাঝে ঝাউবনের নৃত্য থামে না। মানুষের উল্লাসে বোঝা যায় না এখানকার মাটি কতদিন থেকে শোকে কাতর।

জবার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে প্রায়-পাগল অবন চলে গেল সেই একই জায়গায়। হা-করে তার দিকে তাকিয়ে থাকল জবা। সে নিজের দুঃখ নিয়ে এসেছিল সমুদ্রের জলে বিসর্জন দেবে বলে। কিন্তু কোথায় সেই সান্ত্বনার জল? জল কালো হয়ে গেছে শোকের কাজলে। জবা ঘাড় নীচু করে ফিরে যায় দশরথের কাছে। তার বুকের ভার লাঘব হয় না। সে কঁকিয়ে ওঠে অন্তরে, কষ্ট পায় ভীষণ।

সেদিন আর চোরপালিয়া যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না জবার, দশরথ কিছুতেই তাকে বাসে উঠতে দিল না, যদি যাস তো তোর মরা মায়ের দিব্যি রইল। এত কিছুর পরে রাতটা থাকতেই হল জবাকে। সারা রাত দশরথের কত কথা, মন উজাড় করে বলে যাচ্ছে মনের গুছিয়ে রাখা কথা। এ যেন গাভীন মাছের ডিম ছেড়ে দেওয়ার মত সুখ। জবা শোনে। দশরথ বলে, আমার জামাই ভাগ্য ভাল। কে বলে আমরা

ছেলে নেই, আমার তো দু-দুটো ছেলে।

জবা তৎক্ষণাৎ বলে, আমি ভেবেছি— তোমার জামাইকে নিয়ে দীঘায় এসে থাকব। তোমারও বয়স হচ্ছে। তাছাড়া রামকে ভাল ইস্কুলে পড়াব। তোমার জামাই যদি আসে, হোটেলটা সাজিয়ে-গুছিয়ে চালাব। ওর তো বেশি খাটাখাটনির উপায় নেই। বসা কাজে ওর শরীরটাও সারবে।

সে তো ভাল কথা। দশরথ মন থেকে বলল, তোকে আমি কিছু দিতে পারিনি, তোরা যদি এখানে অসিস তাহলে হোটেলটা তোদের নামে লিখে দেব।

লেখাপড়ার দরকার নেই, আমরা তোমার হোটেলে কর্মচারীর মতো খাটব। তোমার পাশে-পাশে থাকব। জবা দশরথের মনোভাব পড়তে চাইল। দশরথ যেন পুকুরের স্থির-অনড় জলরাশি; তবু আন্দোলিত হয়ে বলল, একা থাকি। তোরা এলে বড় সুখ পাব। অন্তত মরার সময় নাতির মুখ দেখে তো মরতে পারব।

পরের দিন সকালের বাসে চোরপালিয়া ফিরে এল জবা। রামের আসার ইচ্ছে ছিল না, হাবভাবে সে তা প্রকাশও করেছিল কিন্তু উপায় নেই যে জবা থেকে যাবে।

ঘরে গিয়ে যা আশা করেনি তাই দেখল জবা। কাল রাতে ঘরে এসেছে সুদাম। ভগীরথ তাকে সঙ্গে করে এনেছে, এখনও সে খড়গপুর ফিরে যায়নি, নিজের ঘরে আছে। সুদাম কলকাতা থেকে সুস্থ হয়ে ফিরেছে বলেই তাকে দেখার জন্য পাড়ার কয়েকজন এসে বসেছে দাওয়ায়। তাদের টুকরো কথা কানে আসছিল জবার। সুদামের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে জবার যে কী হল তা সে নিজেও জানে না, অদ্ভুত শিহরণ ঢেউ দিয়ে গেল শরীরে। আগের তুলনায় আরও রোগা হয়ে গেছে সুদাম, চোখের দৃষ্টিতে অসুস্থতার ছাপ, সে খুব নীচু গলায় কথা বলছিল ওদের সঙ্গে। রাম চোখের পলকে ছুটে গেল সুদামের দিকে, একরকম ঝাঁপিয়ে পড়ল তার গায়ের উপর, 'বাবা-বাবা' চিৎকারে সে যেন সবার মনোযোগ কেড়ে নিল। পেটে সেলাইয়ের দাগ, ব্যথাটা তখনও আছে— তবু যতটা সম্ভব বাঁচানো যায় নিজেকে সুদাম ততটুকুই সতর্ক হয়ে হাত বাড়িয়ে দিল রামের দিকে। যেন কত যুগ সে রামকে দেখেনি এমনই তৃষ্ণা ভরা হৃদয় নিয়ে ব্যথা অগ্রাহ্য করে জাপটে ধরল রামকে। এলোমেলো আদরে ভেসে গেল রাম, জবা তাকে সতর্ক করে বলল, তোর বাবার পেটে ব্যথা আছে, ওকে ছেড়ে দে।

কোথায় ব্যথা তা নিজের চোখে দেখতে চাইছে রাম। ফলে তার জেদকে প্রশমন করার জন্য সুদাম জামা সরিয়ে অস্ত্রোপচারের কাটা দাগটা দেখাল। শুধু রাম নয়, আশেপাশের উপবিষ্ট মানুষ নয়—জবাও ঘাবড়ে গেল রীতিমতন। প্রায় বিঘোত খানিক কাটা দাগ পেতলের ঘষামাজা পয়সার মতো চকচক করছে পেটের চামড়ায়। এখনও পুরোপুরি শুকায়নি ঘা, হয়ত কাঁচা আছে এই আশঙ্কায় জবা ছুটে গিয়ে টেনে আনল রামকে।

রোদ এসে পড়েছে দাওয়ায়; স্বতস্ফূর্ত রোদের প্রভাবেই হোক বা সুদাম সুস্থ হয়ে ফিরে আসার চাপা উত্তেজনায় আনন্দ উথলে পড়ছে জবার মনে। মানুষটা ফিরে

না আসতে পারে এমন আশঙ্কায় প্রায় আন্দোলিত হোত জবার হৃদয়। মা শীতলা বুড়ির দয়ায় সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরে এসেছে সুদাম। জবার চক্ষুজোড়া মুহূর্তে নিজের বশে থাকে না, কান্নার বেগকে সে সংযত করলেও চোখের জলকে বাঁধ দিতে পারে না। জবা লক্ষ্য করল আজ যোগমায়রা মধ্যে অসাধারণ পরিবর্তন, এমন কি ভরতও আজ গাঁ-ঘুরতে বেরয়নি সুদাম এসেছে বলে। মাটির ঘরে আনন্দের চাপা লহর বয়ে চলেছে সেই কতক্ষণ ধরে। যোগমায়া হাতের ইশারায় জবাকে ডাকল কাছে, বউমা, আজ ভগীরথকে খেতে বলেছি এখানে। মীরা গিয়েছে পুকুরপাড়ে কলমী শাক তুলতে। বড় মোরগটা চাপা দেওয়া আছে ঝুড়িতে। নকুল এসে কেটে দিয়ে যাবে কথা দিয়েছে। তোমার বাবার ইচ্ছে মাংসটা তুমি রাঁধো।

জবা খুশি হল একথায়।

ব্যস্ত যোগমায়া চলে গেল হেঁসেলঘর সামলাতে। অভাবের সংসারে অনেক দিন পরে সুখ এল। সাগর পেরনোর আনন্দ পেল জবা। তার বুকের ভেতর দুলে উঠল যেন ছোট্ট ঢেউ ডিঙা যা সে দেখত প্রতিনিয়ত, যাকে ঘিরে তার ব্যক্তিগত স্বপ্ন ছিল অসীম।

দুপুরের রান্নাটা বেশ ভালই করেছে জবা, খেয়ে-দেয়ে ভগীরথ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল, যা শুনে লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠল জবার মুখমণ্ডল। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর ওরা চলে গেল সবাই। তক্তাপোষে অভ্যাস মত গড়িয়ে নিচ্ছিল ভরত। যোগমায়াও তালাই বিছিয়ে বিশ্রাম নিতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে কখন। জবা গিয়ে চুপিসারে বসেছে সুদামের বিছানায়, মাথায়-কপালে হাত বুলিয়ে সে শুধোল, তুমি কেমন আছো?

সুদাম অনেকদিন পরে মন খুলে হাসল, 'দু'ঠোঁটে লেপটে গেল সেই হাসি, আমি তো বেঁচে ফিরে এলাম তোমার ভালবাসার জোরে। ভগীদা, তোমরা না থাকলে আর হয়ত দেখা হোত না কারোর সাথে।

ওসব কথা বাদ দাও। সময় কারোর চিরদিন সমান যায় না। রাতের পর দিন আসে। কথাগুলো বলে নিজেই অবাক হয়ে গেল জবা। এমন কথা, সান্ত্বনা, ভালবাসা এতদিন কোথায় লুকিয়ে ছিল, আজ কেন বহমান খালের মত বেগবান সে!

বিকেল নামল চরাচরে। গোরু, ছাগলের পাল ঘরমুখো হাঁটছে এখন। কি শান্ত কোমল নমনীয় চারপাশ। পাখির ঘরের ফেরা ব্যাকুল চিৎকারে উৎসবের আমেজ পাড়ার মধ্যে। একটা ডাহুক পাখি 'ক্বক-ক্বক' ডাকতে-ডাকতে উড়ে গেল কাঁটা বাঁশ ঝাড়ের দিকে। তার গলায় লম্বা সাদা পুঁতির মালা পরানো, পুরো শরীর যেন কালো বোরখায় ঢাকা। বিকেল হলেই ভরত চলে যায় চা-দোকানে, ওখানে এক কাপ চা-খেয়ে জীবন মাস্টারের সাথে গল্পগুজব সেরে সে ফিরে আসে সাঁঝ লাগিয়ে। আজ সে ফিরে এল চটজলদি, গলায় বিস্ময় মেশান আবেগ, যোগমায়ার কাছে গিয়ে সে বলল, জানো, মহিম ফিরে এসেছে গাঁয়ে। অনেকে তাকে দেখেছে, আমি এখনও তাকে দেখিনি। লোকে বলাবলি করছে— সে নাকি জটাধারী সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছে।।

যোগমায়ার বিশ্বাসই হচ্ছিল না ভরতের কথাগুলো, এত বছর পরে মহিম যে জন্মভূমিতে ফিরে আসবে— একথা স্বপ্নেও বুঝি আসেনি তার। মুহূর্তে যোগামায়ার চোখে ভেসে উঠল যমুনার সুন্দর মুখশ্রী আর হাসিভরা মুখখানা। বউটা গর্ভবতী অবস্থায় মারা গেল—সেই দুঃখ এখনও ভুলতে পারেনি যোগামায়া। যমুনা তার ছোট বোনের মতো ছিল, দায়ে-আদায়ে সে ঠিক পাশে এসে দাঁড়াত।

ভরত বলল, আমি ওর ভিটে বাড়িতে যাচ্ছি, তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে? সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল যোগমায়া, জবাকে ডাকল—বউমা, তুমিও আমার সঙ্গে চলো। দেখবে চলো— কে এসেছে! তুমি তো তাকে দেখো নি, শুধু তার গল্প শুনেছ।

মহিমের ভিটেবাড়িতে পোকাসিমা গাছ, হাড়মটমটি আর কলা গাছের জঙ্গল। চাঁওড় বাঁধা ঘাসে উঠোনের অস্তিত্ব এখন আর বোঝা যায় না। ঝড়-জলে ভেঙে গেছে খড়ের চাল দেওয়া মাটির বাড়ি। চাল নেই, শুধু পড়ে আছে স্তুপাকার মাটি। ভেঙে গেছে বাড়ির সীমানা দেওয়া বেড়া। ঐ স্তুপাকার গলে যাওয়া মাটি ছাড়া বোঝা যায় না যে এখানে একদিন প্রাণের স্পন্দনে হিল্লেলিত হোত বাতাস। এক ভৌতিক পরিমণ্ডলে জেগে আছে এই ভিটে। গল্প গাঁথা হয়ে ফিরছে মহিম আর যমুনার কাহিনী। ভয়ে লোকে রাতের বেলায় এদিকের ছায়া মাড়ায় না, দীর্ঘ পরিত্যক্ত ভিটেতে সাপ-খোপ, পোকামাকড়ের অত্যাচার থাকলেও থাকতে পারে, এটা কোন অবিশ্বাস্য ঘটনা নয়।

ভরত যা শুনে এসেছিল বাজারে, নিজের চোখে তা মিলিয়ে নিল। হতবাক যোগমায়াও দেখছিল গেরুয়া বস্ত্রধারী মহিমকে। দাড়ি-গোঁফের আড়ালে ওর তামাটে মুখখানা ঢাকা পড়ে গেছে কবে। হাতে কমুণ্ডুল, লোহার বালা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। কপালে দীর্ঘ তিলক আঁকা। খড়মপায়ে ঋজুদেহী মহিম বিস্ফারিত চোখে দেখছিল তার হারিয়ে যাওয়া শৈশব, দুরন্ত কৈশোর, যৌবনের সোনালী সময়। যা হারিয়ে যায়, তা কি পুনরায় ফিরে পাওয়া যায়? এত পরিবর্তনের মাঝে মহিম তবু নিশ্চল। উবু হয়ে সে মুঠো করে তুলে নিল ভিটের মাটি, কপালে ছুঁইয়ে, কেমন ধ্যানমগ্ন মূর্তিতে দাঁড়িয়ে থাকল একাকী। একজন সন্ন্যাসী এসেছে পাড়ায়, তাকে দেখার জন্য উপছে পড়েছে কচি-কাঁচার ভিড়, এমন কি উৎসাহী বড়রা সঙ্গ নিয়েছে ওদের। মহিমের এমন সাজপোষাক কেউ তাকে চিনতে পারে না। ভরতের চোখকে ফাঁকি দিতে পারে না মহিম, মুখ দাড়ি-গোঁফের আড়ালে চলে গেলেও চোখের সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এখন অম্লান আছে তার। ভরত ধীর পায়ে জঙ্গল সরিয়ে এগিয়ে গেল মহিমের কাছে, কবে আসা হল এখানে?

মহিম চমকে উঠে তাকাল; ভনিতা না করে বলল, ভরতদা, জন্ম-ভিটের টানে আমাকে ফিরে আসতে হল এখানে। এখানকার ধুলি না নিয়ে গেলে আমার উপাসনা যে সার্থক হবে না। লক্ষ্য থেকে অনেক দূরে সরে যেতে হবে আমাকে। তাই ফিরে আসা, ফিরে-ফিরে দেখা। এ দেখার বুঝি শেষ নেই!

তোমার বৌদিও এসেছে, তাকে কি কিছু বলবে? ভরত আঙুল উঁচিয়ে যোগমায়াকে দেখিয়ে দিল। মহিম ত্রিশূলটা হাতে নিয়ে এগিয়ে গেল যোগমায়ার দিকে, শ্রদ্ধাবনতঃ

গলায় বলল, বৌদি, তুমি আমার মায়ের মত ছিলে; এখনও একই আসনে তোমাকে আমি বসিয়ে রেখেছি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তোমাদের কথা আমার স্মরণে থাকবে। যমুনা গত হওয়ার পর এই সংসারের প্রতি আমার বিতৃষ্ণা জন্মাল। সংসার চিরদিন আমার সঙ্গে ছলনা করেছে। সেই ছলনাময়ীর শ্রীচরণে আমি আর দাসানুদাস না হয়ে চলে গেলাম প্রয়াগে। সেখান থেকে সাধুসঙ্গের দয়ায় বর্তমানে হিমালয়ের পাদদেশে আছি। ঈশ্বর আরাধনায় আমার সময় ব্যয় হয়। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের এতরূপ এত বৈচিত্র আমি কি এর আগে জানতাম। সবই সম্ভব হল তোমাদের আশীর্বাদে।

যোগামায়া মন দিয়ে শুনল মহিমের কথাগুলো, তার চেহারার শুধু পরিবর্তন হয়নি, বদলে গেছে বাচনভঙ্গি। বোঝাই যায় না, এ পাড়ায় মহিম একদিন ঘোরাফেরা করত, অভাব-অনটন তার সর্বাঙ্গ খুবলে খেত। যে একদিন রাতের অন্ধকারে সিঁদ কাটত, গোরুকে বিষ খাইয়ে মারত দুটো পয়সার জন্য—তার এই পরিবর্তন সত্যি চোখে লাগার মতো। যোগামায়ার কোমল মন আন্দোলিত হল ঈশ্বর ভাবনায়, জবাকে দেখিয়ে সে বলল, এ আমাদের বউমা। তুমি ওকে আশীর্বাদ করো— যেন ওর শাঁখা-সিঁদুর অক্ষয় হয়। মহিম মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখল জবাকে, তারপর মাথায় হাত ছুঁইয়ে আশীর্বাদ করল তাকে, চিরসুখী হও মা।

মহিম জঙ্গল, ঝোপঝাড় চিরে পথে এসে দাঁড়াল, তাকে অনুসরণ করল ভরত ও যোগমায়া। পথে দাঁড়িয়ে যোগমায়া অনুরোধ করে বলল, একবার আমার ঘরে চলো। সুদাম বড় অসুখ থেকে ফিরে এল। একবার তাকে দেখে যাও।

তা হয়না। আমি সাধু-সন্ন্যাসী। কারোর দোরে যেতে পারব না। তোমরা আমার আত্মীয়। তোমাদের ওখানে যাওয়া আমার নিষেধ আছে। মহিম হনহন করে হেঁটে যাচ্ছিল পথের দিকে। ভরত তার পথ আগলে দাঁড়াল, দুটো জল-অন্ন সেবা করার কি সময় হবে না? এতদিন পরে যখন দেখা হল—

স্মিত হাসল মহিম, ভরতদা, জীবন এক জায়গায় থেমে থাকে না। জীবন অনেকটাই সাগরের মতো, যার তল খুঁজতে যাওয়া বৃথা। মায়ার ভুবনে এ সাগর পেরনো এখন আমার ধ্যানজ্ঞান। আমাকে আর বাধা দিও না। পথ অনেকটা। আমাকে যেতে হবে।

মহিম চলে যাওয়ার পর ঘরে ফিরে এল জবা। সন্ধ্যার আকাশে জ্বলজ্বল করছে তারা-নক্ষত্র। অদ্ভুত মায়া-মমতায় ভরে আছে এই পাড়া, যেন নক্ষত্রালোক থেকে ঝরে পড়ছে মঙ্গলময় আশীর্বাদ। জবার এই ছোট্ট জীবনে আবার শুরু হল সেই আলোড়ন, তার জীবনের ঢেউডিঙা সুদাম চাদর মুড়ি দিয়ে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে দাওয়ায়। টিমটিম করে জ্বলছে লম্ফোর আলো, যেন ঢেউয়ের মাথায় ভাসছে জোনাকি একাকী। জবা শক্ত করে চেপে ধরল সুদামের হাত, মৃদু চাপ দিয়ে সে বুঝিয়ে দিতে চাইল, ঢেউ ডিঙা ছোট কিন্তু জীবন ছোট নয়। ঘুরে দাঁড়ানোর প্রতিজ্ঞায় মুহূর্তে চোখের সাগরে ঢেউ ডিঙা হয়ে গেল তার স্বপ্নমাখা চোখ দুটি।